স্বামী সারদেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
শিলং

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥

*　　　　*　　　　*

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

প্রার্থনা

হে চৈতন্যচন্দ্র!

তোমার অহেতুক করুণা-কিরণ-কণা যাঁহার স্নেহ-পীযূষধারায় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লেখককে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট করিয়াছে, তাঁহারই পরিতুষ্টির আশায়, অক্ষমের এই মহৎ প্রয়াস—পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ন্যায়, সফল করো প্রভো!

প্রকাশকের নিবেদন

বহু বৎসর পূর্বে স্বামী সারদেশানন্দজী প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি পাঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক সাধু ও ভক্ত মুগ্ধ হন এবং এরূপ একখানা প্রামাণিক উৎকৃষ্ট জীবনী সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছিত বলিয়া মনে করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধাবণ সম্পাদক পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী সাগ্রহে উহা প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থের সমগ্র পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী অধ্যাপক শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী গ্রন্থে প্রকাশের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের দুইখানি ত্রিবর্ণ চিত্র এবং পুস্তকের প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির—বিশেষতঃ কলম্বো-প্রবাসী শ্রীশ্রীবাস দাস এবং কলিকাতাস্থ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কসের অন্যতম পরিচালক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের অশেষ আনুকূল্যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল। ইঁহাদেব সকলেরই নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। বরাহনগর পাঠবাড়ীর কর্তৃপক্ষের সৌজন্য ও সহযোগিতা এ-প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। পুস্তক প্রকাশনকালে তাঁহাদের গ্রন্থাগাব হইতে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থাদি আলোচনার সুযোগ তাঁহারা দিয়াছেন।

পরিশেষে একটি কথা প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না। পুস্তক-প্রণয়নে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর অবদানের পরিমাপ করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ-সৃষ্টির মূল প্রেরণা তিনিই।

জিজ্ঞাসু ও ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থখানি পাঠে বিন্দুমাত্র উপকৃত হইলে আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সার্থক জ্ঞান করিব। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভ্রম-প্রমাদের জন্য পূর্বেই মার্জনা চাহিয়া রাখিলাম।

বিনয়াবনত
সৌম্যানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
শিলং
বিবেকানন্দ-আবির্ভাব তিথি
৭ই মাঘ, ১৩৬৬

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেম-ভক্তি প্রসঙ্গে
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ

চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান--জ্ঞান-সূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুইই ছিল।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ,
৯ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে কোন সন্দেহ নেই। . . .

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ,
৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'আমি ছেলে, তুমি মা', এই অভিমান রাখতে চায়। ..... .

আর 'চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' আমার এমন কখন ইচ্ছা হয় না যে বলি, 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি, 'তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস'। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ্ খেলানো চলে। ষষ্ঠ ভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নাম গুণগান করব, এই আমার সাধ। সেব্যসেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখো, গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। 'আমিই সেই', এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায়, আবার নিজে নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না।

কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি—প্রেম অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপরে ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

আর এক রকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধীভক্তি। এতো জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী-ভক্তি। এ সব অনেক করতে করতে, ক্রমে রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ঈশ্বর-

লাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি; যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ তপ উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম আপনি এলে, জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধীকর্ম কে করবে? . . .

যার কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি (Silver nitrate) মাখানো থাকে, তাহলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।...... .

ভক্তিদ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীব উপর ভালবাসা।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ
৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ। মাকে বলিতেছেন—ও মা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস নে! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করবো! বিলাস করবো!

আবার বলিতেছেন,—বেদান্ত জানি না মা—জানতে চাই না মা! মা তোকে পেলে বেদ বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে!

কৃষ্ণরে! তোরে বলবো,—খারে—নেরে বাপ! কৃষ্ণরে বল্‌বো, তুই আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছিস্ বাপ।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ
৯ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন—ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বল্‌ছি! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করো না—মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে! ভয়তরাসে! আমার মা চাই। ব্রহ্মজ্ঞানকে

আমার কোটী নমস্কার! ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ
১০ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হত। (১) বাহ্যদশা—তখন স্থূল আব সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকত। (২) অর্ধবাহ্যদশা—তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। (৩) অন্তর্দশা—তখন মহাকারণে মন লয় হত।

বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্থূল শরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্ম শরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণ শরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ, পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হত তখন সমাধিস্থ।--এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়-সমাধি।.... ...

চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন।

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ
১১শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব ও গোপীপ্রেম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি

॥ ১ ॥

একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম-জীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন সুতরাং ভারতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বর-পুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম-প্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধহয় পুরীসম্প্রদায় বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাস-সূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, না হয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।* তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধ্ব সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপ-সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরভ্যুত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি উহা শীঘ্রই আপন লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে, সেইখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

[মাদ্রাজবাসিগণের অভিনন্দনের উত্তরে
আমেরিকা হইতে প্রেরিত বার্তা ১৮৯৪ খৃঃ অঃ]

---

* সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের না হইলেও বিশেষ বিশেষ সূত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া শোনা যায়।

॥ ২ ॥

আমি এক্ষণে এই আর্যাবর্ত নিবাসী ভগবান শ্রীচৈতন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। (চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখনকার এক খুব পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়)। তিনি ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া বাগ্‌যুদ্ধে লোককে পরাস্ত করিতেন। ইহাই তিনি অতি বাল্যাবস্থা হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন মহাজনের কৃপায় এই ব্যক্তির সারাজীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তখন তিনি বাদ-বিবাদ, তর্ক, ন্যায়ের অধ্যাপকতা সবই পরিত্যাগ করিলেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহাব প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু-পাপী, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত, সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল। সকলকেই তিনি দয়া করিতেন; এবং যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় ঘোরতর অবনতি প্রাপ্ত হইযাছে (যেমন কাল প্রভাবে সবই অবনতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে) তথাপি আজ পর্যন্ত উহা দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন সমাজে যাহার স্থান নাই এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল।

—ভারতে বিবেকানন্দ

॥ ৩ ॥

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা বুঝিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। সেই প্রেমের অত্যদ্ভুত বিকাশ যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলার রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—প্রেমমদিরা পানে যে একবার উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সে গোপীদের প্রেমজনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ যে প্রেম চরম আদর্শস্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোকের পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না। আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে। আমরা জানি মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা ইহাও জানি দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশ মাত্র, সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণে একটা সাকার বস্তু চায়, এমন

বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরই মানবস্বভাবের চূড়ান্ত ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা—যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেন—যদি একজন সগুণ সম্পূর্ণ দয়াময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন পক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই। কেবল গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। (গোপীগণ) কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না। তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান তাহা তাঁহারা জানিতে চাহিত না। তাঁহারা কেবল বুঝিত তিনি প্রেমময়, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু অনীকিনীর নেতা, রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই ছিলেন।

> "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"
>
> - শ্রীচৈতন্য

"হে জগদীশ! আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী—কিছুই প্রার্থনা করি না; হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম। আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, কামনার ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; আর মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক নরকভীতি, স্বর্গসুখভোগেচ্ছা সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম শ্রেষ্ঠতম আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এ প্রেমের মহিমা আর কি বলিব। এইমাত্র বলিয়াছি যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অসম্ভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের সহিতই শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ অশুদ্ধাত্মা নির্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া দশ হাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম

বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্মশুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে, ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারী; আমি তোমায় কিছু দিতেছি, তুমি আমায় কিছু দাও। আর ভগবান বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর তাহা হইলে তুমি মরিলে তোমায় দেখিয়া লইব। চিরকাল আমি তোমায় দগ্ধ করিয়া মারিব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বর-ধারণা এইরূপ। যতদিন মাথায় এইসব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদের প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

"সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্মরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত

"একবার, একবার মাত্র যদি সেই অধরের চুম্বন লাভ করা যায়! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়। কেবল তুমিই একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।"

প্রথমে এই কাম, কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই—কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম কাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে, উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি দর্শনশাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদনের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরুশিষ্য শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে --আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছুই মনে থাকে না ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ—একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা!

*　　*　　*

মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার (বেদব্যাসের) গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও উচ্চতর আদর্শ দেখিতে পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবিষ্ট হইবে, যখন তোমরা মহাভাগা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিবে। যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোন কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, এমন কি, তোমাদেব সত্যানুসন্ধান স্পৃহা পর্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহেতুক প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইলে—তখন সব পাইলে।

—ভারতে বিবেকানন্দ

প্রস্তাবনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে, প্রাচীন ও আধুনিক বহু গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও আমাদের ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির এই মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপের কারণ কি, এই সম্বন্ধে পাঠকগণকে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীন পুস্তকগুলি চৈতন্যদেবের জীবনালোচনার প্রধান অবলম্বন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সকল পুস্তক প্রাচীন ভাষায়, প্রাচীন ধরনে লিখিত বলিয়া সাধারণের নিকট দুর্লভ এবং দুরূহ। সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থ, বিশেষতঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত সর্বজনমান্য 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অবলম্বন করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। যদি কোনও পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হন তবেই আমাদের শ্রম সফল হইবে।

কিন্তু পরবর্তী এবং আধুনিক বহু পুস্তক সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ঐগুলিতে বহু ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেবের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার ফলে বঙ্গদেশের সমাজে ও সাহিত্যে তাঁহার জীবন ও ধর্মমত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ভুক্তভোগী, সেইজন্যই নিজেদের অযোগ্যতা জানিয়াও এই দুরূহ কার্যে অগ্রসর হইয়াছি এবং প্রাচীন আচার্য গ্রন্থকারগণের পদানুসরণ করিয়া তাঁহার বাস্তব চরিত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বাংলাদেশে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল ভ্রমাত্মক ধারণা দেখা যায় নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পাঠকগণকে আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক) ভাবুকতা—

প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি অতিশয় ভাবুক ছিলেন, ভাবের ঘোরে সমস্ত জীবন কান্নাকাটি করিয়াই কাটাইয়াছেন। মহাপুরুষদিগের ন্যায় তাঁহার জীবনে কোন প্রকার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মহত্ত্ব কিংবা উচ্চভাব দেখা যায় নাই। তিনি বাল্যে চঞ্চল, কৈশোরে চপল, যৌবনে বিদ্যামদে মত্ত। তার পরেই ভূতে পাওয়ার মত এক অদ্ভুত ধর্মোন্মাদনার আবির্ভাব—আর কান্না! সেই যে কান্নার আরম্ভ তাহা আর থামিল না; বাকী জীবন কেবলই কান্না। নিজে কাঁদিতেছেন, স্নেহময়ী জননী ও পতিব্রতা পত্নীকে কাঁদাইতেছেন, অনুগত ভক্তদেরও কাঁদিয়াই দিন যায়। কাঁদিতে কাঁদিতে লীলাবসান হইল। কিন্তু আজিও সে কান্নার বিরাম হয় নাই। যে তাঁহাকে স্মরণ করিবে তাঁহারই

কাঁদিতে হইবে। তিনি কান্নার ধর্মই প্রচার করিয়াছেন। তাই আধুনিক শিক্ষিত বহুলোকের মুখে শোনা যায়—চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। উহার আলোচনাতে তরুণের মন অবসন্ন হয়, নিশ্চেষ্টতা আসে, সবল যুবক আত্মরক্ষায় অসমর্থ দুর্বল কাপুরুষ হয়, ইত্যাদি।

আমরা কিন্তু, প্রাচীন পুস্তকাদি সহায়ে তাঁহার জীবনালোচনা করিয়া দেখিয়াছি অন্যরূপ। শৈশবেই তাঁহাতে অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাইযা বিস্মিত হইতে হয়। অগ্রজ সন্ন্যাসী হওয়ায় পিতামাতাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া বিচারশীল বালকের সান্ত্বনা; অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া সংসারের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া উহার সুপরিচালনা; বিদ্যার্থিরূপে অলৌকিক মেধা-শক্তির পরিচয় প্রদান ও সহপাঠীর দুঃখে সমবেদনা; যৌবনের প্রারম্ভেই চতুষ্পাঠী খুলিয়া যশস্বী অধ্যাপকরূপে অধ্যাপনা, শাস্ত্র-বিচার, প্রতিদ্বন্দ্বি-পরাজয়, দেশভ্রমণ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি সকল কার্যেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা অপরিসীম বুদ্ধি, অপূর্ব চরিত্র, অতুল কর্মদক্ষতা, মহান হৃদয় ও অলৌকিক অধ্যাত্মসম্পদেব পরিচয় পাওয়া যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখিয়াছেন—

"চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥"

বাস্তবিকই তিনি ছিলেন পুরুষসিংহ। সিংহরাশিতে তাঁহার জন্ম, আকৃতি-প্রকৃতিও বীরেন্দ্র কেশরীর ন্যায়। তাঁহাব গ্রীবা, বক্ষস্থল, কটিদেশ একমাত্র সিংহের সঙ্গেই উপমার যোগ্য ছিল। তিনি যখন জয়ধ্বনি করিতেন তাঁহার সিংহরবে গগন বিদীর্ণ হইত, আবার সিংহবিক্রমে যখন কীর্তনে নৃত্য করিতেন, তখন পদভরে ধরণী যেন টলমল করিত।

"তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর।"

তাঁহার সিংহনাদে পাষণ্ডের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইত, আবার অভয়বাণী শুনিয়া পতিতের প্রাণে আশার আলো দেখা দিত।

"শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্বভূতে সম॥"

পশুরাজের নিঃশঙ্কচিত্তে বনভ্রমণের ন্যায় তিনিও অকুতোভয়ে বিশাল ভারতে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া নাস্তিকতা ও অধর্মের প্রভাব দমনপূর্বক সনাতন বৈদিক ধর্ম ও ভগবদ্‌ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার

জীবন বলবীর্যের উৎস, মৃতসঞ্জীবনী সুধা। আমরা এখন নির্বীর্য বলিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে পারি না।

(খ) গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসের অবৈধতা—

তাঁহার গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধেও লোকের মনে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। অনেকেই মনে করেন তাঁহার গৃহত্যাগ অতিশয় নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। তিনি অত্যন্ত নির্দয়ের মত মাতা ও পত্নীকে পবিত্যাগ করিয়া অবৈধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বক্তব্য এই, সন্ন্যাস তাঁহার মহত্ত্বের ও দয়ার পরাকাষ্ঠা। তাঁহার জীবনালোচনায় ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে নিজের ও আত্মীয়স্বজনের সুখভোগের আশা চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়া, জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্নেহময়ী জননী ও পতিব্রতা পত্নীর অনুমতি গ্রহণ করিয়াই গৃহত্যাগ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জননীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পত্নীকেও তিনি খুব ভালবাসিতেন ও সযত্নে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া তাঁহাকে নিজের উপযুক্ত সহধর্মিণী-রূপেই গঠন করিয়াছিলেন।

(গ) সন্ন্যাসাশ্রমে নিষ্ঠাহীনতা—

অনেকের মুখে শোনা যায় তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ছিলেন না। বাহ্যিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও উক্ত আশ্রমে তাঁহার বিশ্বাস ও নিষ্ঠার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও উক্ত সন্ন্যাসিগণের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। তাঁহাদিগের ন্যায় বেদান্ত বিচার করিতেন না, জীবজগতের কারণ মূল সত্ত্বাকে এক অখণ্ড অদ্বয় নির্বিশেষ পরব্রহ্ম বলিয়া মানিতেন না, এবং উক্ত সম্প্রদায়ের পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জীবনযাপনও তিনি করিতেন না। এমন কি কোন কোন স্থানে তাঁহার পরবর্তীকালের চিত্রপটে ও মূর্তিতে, কণ্ঠদেশে তুলসীমালা, কপালে হরিনামের ছাপ ও তিলক, মুণ্ডিত মস্তকে লম্বমান শিখা এবং স্কন্ধদেশে উপবীতশোভিত বৈরাগীবেশও দেখা যায়। তাঁহার অনুগামী বলিয়া পরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে মাধ্বাচার্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। আবার বর্তমানে কেহ কেহ তাঁহাকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত কেশব নামা জনৈক বৈষ্ণবের শিষ্য বলিয়াও প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাচীন পুস্তকাদি সহায়ে নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায়। তিনি শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসি-

সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকট যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহার পূর্বে এই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে এবং কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারের কথা আলোচনা করিলেই তাঁহার বেদান্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া তিনি নিজেকে সর্বদাই 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিতেন।[১] তিনি যথাবিধি আত্মশ্রাদ্ধ, শিখামুণ্ডন, সূত্র বর্জন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের সহিত সন্ন্যাসি-সংঘে, আদর্শ সন্ন্যাসীর ন্যায় চিরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইজন্য ভক্তগণ তাঁহাকে ন্যাসি-চূড়ামণি নামে অভিহিত করিতেন। সাধন চতুষ্টয়—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক (২) ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ (৩) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও (৪) মুমুক্ষুতা-সম্পন্ন উত্তম অধিকারীর পক্ষেই বেদান্তোক্ত জ্ঞানযোগের অধিকার। সর্বসাধারণের পক্ষে ভগবদুপাসনাই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা বেদান্ত-প্রচারক আচার্য শঙ্করেরও অভিপ্রায় এবং চৈতন্যদেবও সেইরূপই মনে করিতেন। সেই জন্যই তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়াও সর্বসাধারণের বিশেষ উপযোগী উপাসনামার্গ ও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। আচার্য সনাতন গোস্বামীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় যে, তিনি আচার্য শঙ্করের ন্যায়ই জগৎকারণকে 'অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[২] শ্রীমৎ বল্লভাচার্যের প্রসঙ্গে দেখা যায়, তিনি শঙ্করের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী আচার্য শ্রীধর স্বামীর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকেই প্রামাণ্য বলিয়াছেন। তাঁহার অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসের ইহাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তিনি স্পষ্টরূপে ঘোষণা

---

১ "দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
. . . .
আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাঁহার শ্রীমুখের এই উক্তি শুনিলে তাঁহার অন্তরের ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়; অন্য প্রমাণ নিরর্থক।

২ "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তাঁর রূপ॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ

করিয়াছেন,—'বাক্য মনের অতীত যে বস্তুকে ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া, উপনিষদ 'অদ্বৈতব্রহ্ম' বলিয়া তাঁহার আভাস মাত্র প্রদান করিয়াছেন, সমাবিধান যোগীরা যাঁহাকে 'পরমাত্মা' রূপে নির্দেশ করেন, ভক্তগণ যাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিতে মোহিত হইয়া 'ভগবান' রূপে ভজনা করেন, সেই সর্বকারণের কারণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ—এক অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু। বিচারমুখে জ্ঞানীরা তাঁহাকে নির্বিশেষ বলেন এবং উপাসক ভক্তগণ তাঁহাকেই সবিশেষরূপে ভজনা করেন। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার একটি অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এখানে তাহার পরিচয় দিতেছি। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার চৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্মকে ভক্তিকল্পতরু রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সেই কল্পবৃক্ষের মূলস্কন্ধ স্বয়ং চৈতন্যদেব। উপরে তাহা অদ্বৈত-নিত্যানন্দ রূপে, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, পরে সেই দুই স্কন্ধ হইতে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা নির্গত হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করিয়াছে। সেই ফল খাইয়া বিশ্ববাসী প্রেমে মত্ত। এই

"উড়ুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
আদিলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যরূপ মূল স্কন্ধের আশ্রয় কি, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকার নয় জন দশনামী সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক কিরূপ।

"পরমানন্দ পুরী আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ মহাধীর।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
আদিলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ

তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে শ্রদ্ধা না থাকিলে অবশ্যই উহা ত্যাগ করিয়া মাধব অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভেক গ্রহণ করিতেন সন্দেহ নাই।

(ঘ) গোঁড়ামি—

বহু লোকের ধারণা তিনি অতিশয় গোঁড়া সঙ্কীর্ণচিত্ত বৈষ্ণব ছিলেন; শিব-শক্তি উপাসনার বিদ্বেষী ত ছিলেনই, এমনকি রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ ও নাম ভিন্ন ভগবানের অন্য কোন রূপে ও নামে শ্রদ্ধাভক্তি রাখিতেন না। সর্বদা 'রাধে রাধে' বলিয়া চিৎকার করিতেন এবং শ্রীমতী রাধারাণীর সেবিকার ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া, 'হাসে কান্দে নাচে গায়, প্রেমানন্দে ঝুরে'—দিবারাত্র এইরূপ ভাবুকগণের সঙ্গেই কাটাইতেন। আমাদের কিন্তু তাঁহার প্রাচীন প্রামাণ্য জীবনী পাঠ করিয়া ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা হইয়াছে। তিনি অতিশয় উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুগামীদিগকে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার জন্য উপদেশ দিতেন।[১] শাক্তবংশে তাঁহার জন্ম—মিশ্রবংশ শক্তি উপাসক ছিলেন। তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণকালে শিব-শক্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া পাঠক বিস্মিত ও পুলকিত হইবেন। সন্ন্যাসীদের চিরআকাঙ্ক্ষিত, বিশ্বনাথের আনন্দকাননে তিনি দীর্ঘকাল বাস করতঃ নিত্য মনিকর্ণিকাতে স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবানের সর্ববিধ নামেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইহা তাঁহার শিক্ষাষ্টকের নামমাহাত্ম্য পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

সর্বসাধারণের মধ্যে ভগবানের এই 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর' তিনি সর্বদা কীর্তন ও প্রচার করিতেন। সুদীর্ঘকাল হইতে সনাতনধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' নাম সারা ভারতে প্রচলিত। সশক্তিক ভগবানের উপাসনাও সমস্ত দেশ জুড়িয়াই প্রচলিত আছে। উমা-মহেশ্বর, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম ও রূপের উপাসনা কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে কে জানে? চৈতন্যদেব উপাসনামার্গের পুষ্টি ও প্রচার করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, এমনকি তাহার নাম পর্যন্ত লোকে জানে না সেই সকল

---

১ "মহানুভবের হয় এই ত লক্ষণ।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্ট দরশন॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥"

এই তাঁহার শিক্ষা।

স্থানেও রাধা-কৃষ্ণ নাম ও উপাসনা প্রচলিত আছে। কাজেই বলিতে হয় উহা সনাতন ধর্মের অঙ্গরূপে বহু পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। তবে তিনি উহার উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভব নিজ জীবনে প্রকটিত করায় উহাতে লোকের দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রচার করিয়াছেন 'পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম-পরমাত্মা, সৎ-চিৎ-আনন্দ (সচ্চিদানন্দ)। সেই আনন্দময়ের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীমতী রাধা।[১] ভক্তগণ তাঁহার কৃপাতেই পরমানন্দের অধিকারী হন।' সদাসর্বদা ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ থাকিলেও তিনি সর্বক্ষণ একভাবে বাহ্যজ্ঞান বিহীন বিহ্বল হইয়াই থাকিতেন—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। চৈতন্যচরিতামৃতে সুস্পষ্ট লিখিত আছে "বহিরঙ্গ দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ॥" অতিশয় অন্তরঙ্গগণ ভিন্ন কেহ তাঁহার অন্তরের লুক্কায়িত ভাব জানিতে পারিত না। তিনি লোকের নিকট অতিশয় শান্ত, সমাহিতমনা, স্থির ধীর ব্যবহারনিপুণ আচার্যের ভাবে অবস্থান করিতেন এবং চিত্তের সর্ববিধ সংশয়জাল দূরীভূত করিয়া সমীপাগতগণের প্রাণে শান্তিপ্রদানকারী অমৃতবর্ষী বাণী বিতরণ করিতেন। জীবনের শেষভাগে অতি উচ্চাঙ্গের ভক্তির বিকাশ—রাধাপ্রেমের অত্যদ্ভুত মহিমার কথা শোনা যায়, তাহা অতিশয় সঙ্গোপনে প্রকটিত হইয়াছিল। রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদর—তাঁহার অতিশয় অন্তরঙ্গ ও তত্ত্বজ্ঞ এই দুই জন মাত্র মহানুভব সেই অপূর্ব ভাবের পরিচয় পাইতেন। এমনকি তাঁহার অতিপ্রিয় গৌড়ীয় ভক্তগণের রথযাত্রা উপলক্ষে আগমনকালে তিনি অতিশয় সাবধানতার সহিত অন্তরের ভাব গোপন রাখিতেন। ইহা স্পষ্টাক্ষরে চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে।

(ঙ) শ্রুতি-স্মৃতিতে অনাস্থা—

বহু লোকের মুখে শোনা যায়—চৈতন্যদেব সনাতন বৈদিক ধর্মের বিরোধী। শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিতেন না। তাঁহার নামের দোহাই দিয়া বর্তমান সময়ে বহু ব্যক্তিকে সর্বদাই শাস্ত্রাচার লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। এমনকি বাংলা দেশে ইহারই ফলে একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে 'জাত খোয়ালে বৈষ্ণব হয়'।

পাঠক তাঁহার জীবনালোচনায় সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। দেখিবেন, তিনি সমস্ত জীবন শাস্ত্রের অনুশাসন ষোল আনা মানিয়া

---

১ "সুখরূপ কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি গার্হস্থ্যাশ্রমে, কি সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার জীবনে শাস্ত্রাচার লঙ্ঘনের, স্বেচ্ছাচারিতার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি সমস্ত জীবন শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সনাতন বৈদিক ধর্মেরই অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়াছেন। সনাতন ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান রাখিবার জন্য, অধর্ম অনাচার ও অত্যাচারের প্রবল পীড়ন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্যই তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা। তাঁহারই আদেশানুসারে ভক্তিমার্গের পুষ্টি এবং ভক্তগণের অনুশাসনের জন্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী আচার্য গোপাল ভট্টের সহায়তায় শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রাদি অবলম্বনে কালোপযোগী করিয়া এক অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেব প্রামাণিক স্মৃতি-শাস্ত্র 'হরিভক্তি-বিলাস'। তাঁহার প্রভাবে দেশে বেদ-উপনিষদ-দর্শন-পুরাণাদি শাস্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে এখনও দেদীপ্যমান।

(চ) অধর্মের প্রচার ও সমাজের সর্বনাশ—

অনেকে মনে করেন, চৈতন্যদেব বাধাকৃষ্ণলীলার নামে স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলন এবং বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত অবান্তর সম্প্রদায়সমূহের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ভজনপ্রণালীর অনুমোদন করিয়া দেশের ও সমাজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। এইজন্য অনেকে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়া বলেন, "ন্যাড়া-নেড়ীর কাণ্ড"। এ-সম্বন্ধে আমরা বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, এই সকল অবান্তর সম্প্রদায় ও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ভজনপ্রণালীর সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কোনই সম্পর্ক নাই। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাহারা নিজেদের পরিচয় প্রদান করিলেও তাঁহার জীবনসম্বন্ধীয় প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে উহার বিন্দুমাত্র সমর্থন পাওয়া যায় না। চিরকালই স্বীয় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অনেকে মহৎ ব্যক্তির নাম ও গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে চৈতন্যদেবের নামের সহিত এই সব আচার-ব্যবহারের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পবিত্র প্রভাবে সমসাময়িক সমাজদেহ হইতে এই সকল ক্ষত বহুল পরিমাণে আরোগ্য হওয়ায় দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল।

চৈতন্যদেব কঠোর ত্যাগী ছিলেন। স্বয়ং ত কামকাঞ্চনের সম্পর্কে কখনও যাইতেন না, ভক্তগণও যাহাতে সাবধান থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তাহা দেখিয়া পাঠক অবশ্যই বিস্মিত হইবেন। চৈতন্যদেবের সময়ে এবং তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই দেশের অধঃপতিত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ তান্ত্রিক বামাচারের নামে অনাচারে কাল যাপন করিতেছিল।

তাঁহার পবিত্র প্রভাবে ঐ সকল সম্প্রদায়ের অনেকে পূর্বমত আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া, সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহারা পূর্ব অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারিল না, তাহারাই গোপনে নানা কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান চালাইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকারে বহু উপধর্ম ও অবান্তব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রাধা-কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের মতালোচনায় পাঠক জানিতে পারিবেন উহা ইন্দ্রিয়াসক্ত সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষেব পরস্পর আকর্ষণ বা কামান্ধের ইন্দ্রিয় উপভোগ নহে। শ্রুতি "রসো বৈ সঃ" বলিয়া যাঁহার নির্দেশ করিয়াছেন, ভক্তিমার্গের চবম অনুভব উহাই আনন্দ-চিন্ময়-রসাস্বাদন। চৈতন্যদেব তাহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-স্ফুবণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামানন্দ রায়েব সঙ্গে আলোচনাতে এবং রূপ-সনাতনের শিক্ষাপ্রসঙ্গে পাঠক তাহার বিশেষ পরিচয় পাইবেন। তিনি শিখাইয়াছেন,—

"অতএব কৃষ্ণেব নাম-দেহ-বিলাস।
প্রকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

(ছ) জাতীয় অবনতি--

বিষয়ে বিতৃষ্ণা, সংসারে বৈরাগ্য, নিরভিমানিতা, দীনহীনভাবে জীবন-যাপন ও একান্তে অবস্থান করিয়া ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া চৈতন্যদেবকে অনেকে জাতীয় অবনতির কারণ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম সমাজের অভ্যুদয়ের পরিপন্থী। এই বিষয়ের সত্যতার অনুসন্ধান করিতে হইলে পাঠককে তাঁহার জীবন ও কার্যের সবিশেষ আলোচনা ও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে সমাজের অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইবে। চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, পরার্থপব, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান ব্যক্তিগণই মানবসমাজের সংগঠন ও সংরক্ষণ করেন। স্বার্থান্ধ, শিশ্নোদরপরায়ণ, চঞ্চলচিত্ত, পাশবিক বলে বলীযান ব্যক্তিগণ দ্বারা সমাজের অবনতিই ঘটিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের জীবনালোচনায় পাঠক স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, তিনি এবং তাঁহার পার্ষদগণ কি ভাবে বিদেশী বিধর্মী রাজশাসনের প্রবল প্রতাপ, শাস্ত্র-সম্পদ-সহায় এবং সমাজনেতৃগণের সামাজিক শাসনের কঠোরতাকে উপেক্ষা করিয়া আপামর সাধারণে স্বীয ভাবরাশি প্রচারপূর্বক সমাজের অশেষ কল্যান সাধন করিয়াছিলেন।

বর্তমান বাঙালী জাতির ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পসম্পদ যাহা কিছু গৌরবের সমস্তই চৈতন্যদেবের ভাবরাশিতে পুষ্ট। তাঁহার প্রভাবে

প্রচলিত জন্মগত অধিকারকে অতিক্রম করিয়া গুণ-কর্ম সহায়ে বহু মহানুভব 'গোস্বামী' আখ্যা ধারণপূর্বক সমাজশীর্ষে প্রকৃত ব্রাহ্মণের আসনে সমাসীন হইয়াছেন এবং জাতিকে সুপথে পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কীর্তি-কলাপে সারা দেশ পরিব্যাপ্ত। বিদেশী রাজশাসনকে সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলেও বিধর্মের প্রভাবকে খর্ব করিয়া চৈতন্যদেবের অনুগামীরা সনাতন ধর্মকে রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। এমনকি তাঁহারা সমাজকে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ একতাবদ্ধ ও সংগঠিত করিয়া বিদেশী শাসকের প্রভুত্বহ্রাস ও দেশবাসীর শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিলেন। এইরূপে পরবর্তীকালে তাঁহার ভাবপুষ্ট হিন্দুসমাজে যে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাঠক পাইবেন,—বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে মল্লভূমে, জঙ্গলের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত বাংলার শিল্প-সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুরের ইতিহাস আলোচনা করিলে। আবার অন্যদিকে পূর্বপ্রান্তে আসামের পর্বতমালার অভ্যন্তরে অসভ্য নাগাজাতির সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত মণিপুর রাজ্য ও মণিপুরী জাতির শিক্ষা-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলেও চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ধর্মের প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এইরূপে গারো, টিপারা, খাসিয়া প্রভৃতি আরও কত পার্বত্য জাতি তাঁহার কৃপায় উন্নতি লাভ করিয়াছে কে তাহার অনুসন্ধান করে? বর্তমানে বাংলার এই দারিদ্র্য-সঙ্কটেও যাঁহারা পরদেশী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, সেই বাঙালী বৈশ্যকুল সকলেই চৈতন্যদেবের পদাশ্রিত। পতিত, অনার্য, অসভ্য, ধর্মহীন, বিধর্মী অসংখ্য লোক চৈতন্যদেবের কৃপাতেই আজ শূদ্ররূপে বিরাট হিন্দুসমাজের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কত-জন আবার অগ্রসর হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান পর্যন্ত অধিকার করিয়াছেন, কে তাহার সন্ধান রাখে! অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার জীবন ও ধর্মপ্রচারের কাহিনী অবগত হইয়া বাংলার ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি দেশকে কি ভাবে উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত আরও ভ্রান্ত ধারণা আছে; আমাদের প্রস্তাবনা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় আমরা ঐ সকল আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম। তাঁহার জীবনালোচনায় পাঠকের সেই সকল ভ্রান্তি আপনা হইতেই নিরসন হইবে আশা রাখি।

চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বিবেচিত হয়। এমনকি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে

উক্ত গ্রন্থ তাঁহার অভিন্ন কলেবর শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর রূপে পূজিত হইতে দেখিয়াছি। বহুকাল পূর্বে আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু পরিশ্রমে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত প্রতিলিপি দেখিয়া এক নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং উহার খুব আদর হয়। আমরা আদর্শরূপে উক্ত গ্রন্থকেই অবলম্বন করিয়াছি। বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত বাক্যে স্থানে স্থানে আমরা পুস্তকের নাম ও স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছি। যেসব জায়গায় নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাহা সমস্তই 'চৈতন্য-চরিতামৃত' হইতে উদ্ধৃত।

চৈতন্যদেবের বাল্যজীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ 'চরিতামৃত'-কার দেন নাই। তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাসকল অবলম্বনে তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত বুঝাইবার জন্যই তিনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। উহাই তাঁহার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। মহাপুরুষদিগের জীবনের সকল ঘটনাই বিশেষত্বপূর্ণ এবং ভক্তদিগের অতীব প্রীতিদায়ক হইলেও সর্বসাধারণ উহাতে বিশেষ লাভবান হয় না। তাঁহারা মানবসমাজের কল্যাণকল্পে যে সত্য প্রচার করেন এবং ঐ সকল তত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহরূপে তাঁহারা যে আদর্শ জীবন যাপন করেন, তাহার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে পারিলেই পাঠকের পরম লাভ। মহামনস্বী কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সেইভাবেই অতিশয় দক্ষতার সহিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং এইজন্যই উক্ত গ্রন্থের এত সম্মান।[১]

শ্রীল হরিদাস গোস্বামি-প্রণীত 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত' গ্রন্থ হইতে পরমারাধ্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর লীলাকথা বহুলাংশে সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকার এ-জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

---

১ শ্রীশ্রীচৈতন্য–চরিতামৃতে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং জ্ঞানমার্গের উপর কটাক্ষ-সূচক যে দু'একটি বাক্য মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য যে (১) উহা মূলে ছিল বা পরবর্তী সময়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা সন্দেহজনক ; (২) ঐ সকল বাক্য চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় অথবা গ্রন্থকারের মত ইহা বিচার্য ; (৩) যে সময়ে 'চরিতামৃত' লিপিবদ্ধ হয় সেই সময়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গীগণ প্রায় সকলেই অন্তর্ধান করিয়াছেন এবং পরবর্তীগণ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন—নিজেদের পৃথক 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী' বৈষ্ণব সম্প্রদায় রূপে গঠন করিয়াছেন ; (৪) প্রেম–ভক্তিমার্গের পুষ্টি ও প্রচারই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু, তদুদ্দেশ্যে অপরমতে কটাক্ষ স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে পরম পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী জগদানন্দ মহারাজ বিশেষ সহায়তা ও প্রেরণা দিয়াছিলেন। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অধিকাংশ তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত। লেখক তাহার নিকট চিরঋণী।

নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন যুবকগণের মন চৈতন্যদেবের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্যই—বিশেষ ভাবে আমাদের এই উদ্যম। প্রাচীন সুরসিক ভক্তগণ ইহা জানিয়া লেখকের দোষত্রুটি ক্ষমা করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

বিনীত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

॥ ১ ॥

নবদ্বীপ

"অষ্ট ক্রোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর।
স্থানে স্থানে বাপী, পুষ্পবাটী, সরোবর ॥
সুরধুনীতীর, বন, পুলিন দেখিয়া।
কে আছে এমন, যার না জুড়ায় হিয়া ॥"

—ভক্তিরত্নাকর

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, হিন্দু-রাজকুল-গৌরব-রবি মহারাজ বল্লাল সেনের উদয়ে বঙ্গদেশের রাজগৌরব চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান এবং বিহার ও উড়িষ্যার কতক অংশ, তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য তিনি নবদ্বীপেও রাজপ্রাসাদ, মন্ত্রণাগার, সভামণ্ডপ, পারিষদবর্গ ও কর্মচারীবৃন্দের বাসস্থান, সেনাপতি-সৈন্যমণ্ডলীর আবাসস্থল (ছাউনি) প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া ক্রমে উহাকে বৈভবশালী দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী বল্লাল সেনের রাজসভাও সর্ববিদ্যা-বিভূষিত সর্বগুণ-সমালঙ্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশে সুশোভিত থাকিত। শেষজীবনে তিনি অধিকাংশ সময় নবদ্বীপেই বাস করিতেন। তাহার ফলে, দেশ-বিদেশের বহু বিদ্বান বুদ্ধিমান গুণবান ব্যক্তি নবদ্বীপে সমাগত হওয়ায় নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবদ্বীপেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকিলে ঐ নগর অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া রাজার নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত হইল। পিতার কীর্তিকলাপের অনুকরণকারী পুত্রের আনুকূল্যে নবদ্বীপের যশঃসৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতগণের আবাসস্থান নবদ্বীপ ক্রমে বাণীর বরপীঠ রূপে পরিগণিত হইল। দিল্লীর পাঠান বাদশাহগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়া সেনবংশ বঙ্গদেশে বহুকাল স্বাধীনভাবে সগৌরবে রাজত্ব করিবার পর, পাঠান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ দখল করেন এবং পাঠানগণ গৌড়নগরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ শাসন করিতে থাকেন।

বঙ্গদেশ জয় করিয়া পাঠানগণ এই দেশেই বাস করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গভূমিকেই স্বদেশ জ্ঞানে ইহার কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা নামেমাত্র দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখনও বা স্বাধীনভাবেই চলিতেন। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন, করগ্রহণ প্রভৃতি কার্য পূর্ববৎ হিন্দু জমিদারগণই করিতে লাগিলেন। বিচার-শাসনের জন্য স্থানে স্থানে কাজী নিয়োগ করিলেও পাঠান বাদশাহগণ মন্ত্রী, সেনাপতি, নগররক্ষক প্রভৃতি উচ্চ রাজপদে জাতি-ধর্ম উপেক্ষা করিয়া বহু সুযোগ্য হিন্দুকে নিযুক্ত করিতেন। এইজন্য পরাধীন হইলেও তৎকালীন হিন্দুসমাজে বিশেষ সামাজিক বিপর্যয় বা অর্থাভাব ঘটে নাই। সেইজন্যই নবদ্বীপ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও উহার সমৃদ্ধির হানি হইল না, পূর্বের ন্যায় ধনী সজ্জনগণের সহায়তায় গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করিয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচর্চা এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। রাজগৌরব অন্তর্হিত হইলেও বিদ্যার গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষা-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। জ্ঞান লাভের জন্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী নবদ্বীপে আগমন করিতেন। তখনকার দিনে মূল্য দিয়া বিদ্যা ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইত না। অধ্যাপকগণ শিক্ষাদানের বিনিময়ে ছাত্রগণের নিকট হইতে কোনরূপ পারিশ্রমিক আদায় করিতেন না। সমাজ বিদ্যার্থীদিগের ভার গ্রহণ করিত। পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণকে সকলেই পূজা-পার্বণ বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বিদায়'[১] দিতেন। তাহা দ্বারাই অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সরল সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হইত। গঙ্গাতীরে সৎসঙ্গে জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন; তাঁহাদের এবং দেশের রাজা-জমিদার এবং ব্যবসায়িকুলের দানে, নবদ্বীপে বহু রাস্তাঘাট দেবালয় অতিথিশালা অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

"নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়॥"

এইরূপে দেশে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা এবং সুখসমৃদ্ধি থাকিলেও প্রকৃত ধর্মভাবের অভাবে, লোকের ঘোর মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছিল। অলৌকিক উপায়ে ইহলোকে এবং পরলোকে ভোগলাভ, দৈববলে বিঘ্ন অতিক্রম, শত্রুনাশ, কলেকৌশলে সমাজে প্রতিপত্তি মান-যশঃ প্রাপ্তি ইহাই ছিল তখনকার লোকের চিন্তা ও কার্যের বিষয়। পাণ্ডিত্য, ধন, সুন্দরী-স্ত্রী ও সুপুত্র লাভকেই লোকে

১ বিদায়—স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রা, ধাতুপাত্র, বস্ত্রাদি।

মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া মনে করিত। যেটুকু পূজা-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহারও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সংসারভোগ লাভ। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়াতে জীব-জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে লোকের মনে নানাপ্রকার অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হইতেছিল। বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় মুমুক্ষুতা প্রায় লোপ পাইয়াছিল, তাই বাসনার দাবানলে মানুষের চিত্ত দগ্ধ হইতেছিল।

"যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে, এইমত হইল সর্বদেশ।"

—চৈতন্যভাগবত

সমাজের উচ্চস্তরে বিদ্যাচর্চা শাস্ত্রালোচনা এবং বাহ্যিক ধর্ম-উপাসনার ভাব কিয়ৎপরিমাণে দেখা গেলেও নিম্নস্তরে কিছুই ছিল না। ভগবানের উপাসনা ত দূরের কথা, তাঁহার নাম ও স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জানিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। সর্বপ্রকার সামাজিক সুবিধায় বঞ্চিত, ঐ সকল লোকের অবস্থা একদিকে ধর্মহীন, অন্যদিকে বিদ্যা-অর্থ-সহায়-সম্পদ-বিহীন হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। যেভাবে উচ্চবর্ণ অভিজাতেরা ইহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া উহাদের সম্পর্ক হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করিতেন, তাহাতে কোন কালেই উচ্চশ্রেণীর সহায়তায় ইহাদিগের অবস্থার উন্নতির আশা ছিল না।[১] করুণাময় ভগবান সেই ঘোর দুর্দিনে এই সকল পতিত মানুষকে পরিত্রাণের পথ দেখাইবার জন্যই যেন অবতীর্ণ হইলেন।

বাংলাদেশ অধিকার করিয়া রাজসিংহাসনে সমাসীন বিদেশীয় বিজাতীয় নবাব-বাদশাহগণ আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ও সামাজিক বিধানে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতেন না সত্য; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার লোকের উপর ক্রমশঃই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। স্বধর্মীর প্রতি সকলেরই প্রীতি থাকে; তাই রাজানুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষাতে স্বেচ্ছায় এবং দায়ে পড়িয়া পরেচ্ছায়ও বহু ব্যক্তি রাজার ধর্ম ইসলাম 'কবুল' করিলেন। রাজসাহায্যে মৌলবী-ফকিরগণ দেশের সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সর্বজগতের একমাত্র নিয়ন্তা করুণাময় ভগবানের উপাসনায় সকলের সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া সমাজের পতিত নির্যাতিত শ্রেণীর লোককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন। দলে দলে লোক মুসলমান হইতে

---

১ এই অত্যাচার-অবিচারে বরং তাহারা বিধর্মীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সমাজ-শরীর ক্ষীণকায় করিয়া তুলিতেছিল।

লাগিল। তাহাদের প্রচারের ফলে ইসলামের অপূর্ব ভ্রাতৃভাব, সামাজিক সাম্য, ধর্ম-কর্ম-উপাসনাতে সমান অধিকার লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিল। হিন্দু-সমাজের নিদারুণ সংকটসময়ে, সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য এবং অজ্ঞ দীনদুঃখী মানবসাধারণকে মুক্তির পথ দেখাইতে শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্র নবদ্বীপে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। সেই ঘোর দুর্দিনে তাঁহার আবির্ভাব না হইলে, বাংলাদেশে আজ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ।

॥ ২ ॥

আবির্ভাব

"চতুর্দিকে লোক ধায় গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া ॥
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরিনাম।
সেই হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান ॥"

বংলা ৮৯১ সনে, ১৪০৭ শকাব্দে, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে, ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমা দিবসে সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, আর দলে দলে লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে; এমনই সময়ে রাত্রির প্রথম মুহূর্তে অতি শুভক্ষণে, চতুর্দিকে হরিধ্বনির মধ্যে, নবদ্বীপ আলো করিয়া কলি-কুহকান্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল।

চৈতন্যদেবের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ[১] নামক গ্রাম জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। শিক্ষা-অন্তে নবদ্বীপেই স্থায়ী ভাবে বাস করেন। তাঁহার আর একটি নাম ছিল 'পুরন্দর'।

---

১ ঢাকাদক্ষিণ শ্রীহট্ট সহর হইতে ১৫ মাইল পূর্বদিকে। জগন্নাথের পিতার নাম উপেন্দ্র মিশ্র মাতার নাম শোভা দেবী। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র। তন্মধ্যে জগন্নাথ চতুর্থ। মিশ্র-বংশধররা এখনও ঢাকাদক্ষিণে বাস করিতেছেন। ঢাকাদক্ষিণে চৈতন্য-দেবের অতি প্রাচীন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে দেশদেশান্তর হইতে বহু দর্শনার্থী আগমন করেন। ঢাকাদক্ষিণের বর্তমান মন্দির প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদের জনৈক দেওয়ান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে বর্তমান সময়ে ঢাকাদক্ষিণের বিগ্রহই চৈতন্যদেবের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আদিমূর্তি।

ধর্মপ্রাণ জগন্নাথ অতিশয় সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং পূজা-সন্ধ্যা ও ভগবদারাধনাতেই কাল কাটাইতেন। তাঁহার সহধর্মিণী শচীদেবীর স্বভাবচরিত্র চালচলনও সর্বপ্রকারে পতির অনুরূপ ছিল। পর পর কয়েকটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াই মারা যাওয়াতে দম্পতির মনোদুঃখের সীমা ছিল না। পরে ভগবানের কৃপায় বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করিলে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তাঁহারা দুঃখের সংসারে সুখের আস্বাদন পাইলেন। বিশ্বরূপের দেহকান্তি অতিশয় সুন্দর ছিল এবং শিশুকাল হইতেই তিনি শান্তশিষ্ট বুদ্ধিমান বলিয়া সকলের অতিশয় প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন।

বিশ্বরূপের ৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতামাতার আনন্দ বর্ধন করিয়া চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী মহাশয় খুব বড় জ্যোতিষী; নবদ্বীপেই তাঁহার বাস। দৌহিত্রের জন্মলগ্ন রাশি-নক্ষত্রাদি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। প্রকাশ্যে বলিলেন, নবজাত বালক সাধারণ মনুষ্য নহে। বহু সুকৃতির ফলে, এক অসাধারণ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরম সুন্দর সদানন্দ বালক আদর-যত্নে দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শিশুর দেবতুল্য মনোহর কান্তি যে দেখিত সে-ই মুগ্ধ হইত; একবার দেখিলে আর ভুলিবার উপায় থাকিত না। যথাসময়ে নামকরণ হইল। জগন্নাথ নাম রাখিলেন 'বিশ্বম্ভর'। শচী আদর করিয়া ডাকিতেন 'নিমাই'[১]। এই নিমাই নামেই তিনি নবদ্বীপবাসীদের নিকট পরিচিত হইলেন। তাঁহার গৌর অঙ্গকান্তির জন্য আখ্যা হইয়াছিল 'গৌরাঙ্গ'; আবার 'হরিবোল' বলিলেই আনন্দে উল্লসিত হইয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া মনোহর নৃত্য করিতেন, এজন্য আত্মীয়-স্বজনেরা ডাকিতেন 'গৌরহরি'। তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী' হইতে সংক্ষেপ নাম 'চৈতন্যদেব'—এবং এই নামেই তিনি জগতে বিদিত।

সুস্থ সবল প্রতিভাবান চঞ্চল বালককে সামলাইয়া রাখার জন্য শচীদেবীকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। কিন্তু নিমাই যখন যে জিনিসের জন্য আবদার করিতেন, তাহা না পাইলে আর রক্ষা ছিল না। কান্নাকাটি করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেন, কখনও বা ঘরের জিনিসপত্র ছড়াইয়া ফেলিতেন। রাগ থামাইবার জন্য শচীদেবীকে অনেক সাধ্যসাধনা করিতে হইত। মিষ্ট কথায়,

---

১ জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে একটি অতি প্রাচীন নিমগাছ ছিল, তাহার নীচে নিমাইয়ের আঁতুড়ঘর নির্মিত হয়। তাই তাহার নাম রাখা হইল নিমাই। অথবা নিমের নাম শুনিয়া তিক্ততায় ভয়ে যম ইহাকে লইবেন না এইজন্য ঐ নাম রাখা হইয়াছিল। মৃতবৎসাদের সন্তানের ঐরূপ নাম রাখার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

প্রলোভনের জিনিস দিয়া, স্নেহ-আদরে বশীভূত করিয়া বহু কষ্টে শচীদেবী নিমাইকে শান্ত করিতেন। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লীলাচঞ্চল বালকের স্নেহের উপদ্রব বাড়িয়াই চলিল; তাহাতে শচীদেবী অনেক সময় অস্থির হইয়া উঠিতেন। নিমাই কখনও কখনও মা-বাপের অজ্ঞাতে ঠাকুর-মন্দিরে ঢুকিয়া ঠাকুরের ফুলের মালা নিজেই পরিয়া মাকে ডাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া দেখাইতেন। ভয়ে শচীদেবীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। পুত্রকে টানিয়া কোলে লইয়া ঠাকুরের কাছে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন এবং পূজা ভোগ মানত করিতেন।

একদিন বাড়ীতে এক সাধু অতিথি হইয়াছেন। শচীদেবী অতি ভক্তিভাবে তাঁহার সেবার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন। আহারের পূর্বে সুসজ্জিত ভক্ষ্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া সাধুবর তন্ময়ভাবে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে নিমাই চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া খাইতে লাগিলেন এবং সাধুর গা ঠেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো চেয়ে দেখ না— আমি খাচ্ছি।" শচীদেবী নিমাইয়ের গলার আওয়াজ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। চক্ষু মেলিয়া সাধু সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে কোন-প্রকার ক্ষোভ বা দুঃখ জন্মিল না; বরং প্রিয়দর্শন বালকের মনোমুগ্ধকর লীলাখেলায় মোহিত হইয়া অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শচী-দেবী সাধুকে অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া পুনরায় সেবার আয়োজন করিলেন।

স্বাভাবিক সুন্দর সুস্থ সবল বালক চলিতে শিখিয়াই পাড়াপ্রতিবেশীর ঘরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। নিমাইকে কোলে করিয়া সকলেরই হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিত, এজন্য অনেকে স্নেহ করিয়া, সুন্দর খেলনা ও ভাল খাবার দিয়া তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন। লীলাখেলাপরায়ণ বালক, কখনও কখনও স্বেচ্ছায় পাড়াপড়শীর ঘরে উপস্থিত হইতেন এবং নানারূপ আবদার করিতেন; আবার মনোভিলাষ পূর্ণ না হইলে মায়ের ন্যায় উঁহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে ছাড়িতেন না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিমাই পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে একাকী দেখিয়া গায়ের মূল্যবান অলঙ্কারের লোভে এক চোর রাস্তা হইতে কোলে তুলিয়া লইল এবং মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া লইয়া চলিল; অন্তরে অভিপ্রায়, কোন নির্জনস্থানে লইয়া গিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। নিমাই চোরের কোলে চুপ করিয়া রহিলেন, আর সে মনোমত স্থান খুঁজিবার আশায় এ-গলি সে-গলি ঘুরিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়, নিমাইকে ঘরে না দেখিয়া পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইলেন এবং চারিদিকে খুঁজিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নিমাইকে কোলে লইয়া চোর ঘুরিয়া ফিরিয়া

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত। ডাক শুনিয়া নিমাই চিৎকার করিয়া উঠিলে তাঁহার গলা শুনিয়া বাড়ীর লোকও সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। চোর বেচারী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া দৌড়িয়া পলাইল।

পাড়ার সমবয়সী বালকদের সঙ্গে নিমাইয়ের খুব ভালবাসা। সারাদিন তাহাদের সঙ্গে খেলাধুলায় মত্ত থাকেন। তাঁহার একটি খেলা বড়ই প্রিয় ছিল এবং তাহা দেখিয়া বয়স্কবাও চমৎকৃত হইতেন। সঙ্গীদিগকে লইয়া মণ্ডলী রচনা হইত এবং স্বয়ং উহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তালে তালে হাততালি দিয়া নিমাই সুমধুর স্বরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া নৃত্য করিতেন এবং সঙ্গীরাও আনন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া ঐরূপে নৃত্য করিত। নিমাইয়ের এই সুমধুর খেলা যে দর্শন করিত সে-ই মুগ্ধ হইত।

ক্রমে নিমাই পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে জগন্নাথ শুভদিনে হাতে-খড়ি দিয়া তাঁহার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। সে-সময়ে নিম্ন পাঠশালায় গুরু মহাশয়কে ওঝা বলা হইত। তিনি বালকদিগকে বাংলা ভাষা লেখাপড়া, হিসাব ও দলিল পত্রাদি রচনা শিক্ষা দিতেন। নিমাই সুদর্শন ওঝার পাঠশালে ভর্তি হইলেন। মেধাবী বালক অতি অল্প সময়েই অক্ষর পরিচয় করিয়া লিখিতে শিখিল দেখিয়া ওঝার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। জগন্নাথ ও শচীদেবীর অন্তরও আনন্দে পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ তখন টোলে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন; তিনিও পরমাদরে অনুজকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিমাই অতি অল্প সময়েই আপনার পাঠ আয়ত্ত করিতেন এবং বাকী সময় সহপাঠীদিগকে লইয়া খেলাধুলা রঙ্গরসে মত্ত থাকিতেন। ওঝার প্রবল ইচ্ছা বুদ্ধিমান বালক লেখাপড়াতে খুব মনোযোগী হয়; কিন্তু নিমাইয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। খেলাধুলাতেই তাঁহার মনোযোগ বেশী, লেখাপড়াতে খুব কম, আর পাঠশালার ঐ সামান্য পাঠ শিখিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। কাজেই খেলাধুলার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সময় মিলিত।

শচীদেবী অত্যন্ত শুদ্ধাচারিণী ছিলেন। মিশ্রের গৃহদেবতা রঘুনাথের নিত্য সেবাপূজা, ভোগরাগে যাহাতে কোন প্রকার অনিয়ম অনাচার না হয়, সেইজন্য শচীদেবী অত্যন্ত সাবধান থাকিতেন। গরীব হইলেও মিশ্রদম্পতি অতিশয় ভক্তিভাবে প্রাণপণ যত্নে রঘুনাথের সেবা করিতেন। চতুর নিমাই মায়ের 'শুচিবাই' বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে অশুচি-অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করাইবার ভয় দেখাইয়া, নিজের অভীষ্ট সাধনের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। কোন আবদার পূরণ না করিলে কিংবা অন্য কোন কারণে মায়ের উপর রাগ হইলে নিমাই আস্তাকুড়ে গিয়া বসিয়া থাকিতেন, অথবা উচ্ছিষ্ট অশুচি দ্রব্য

স্পর্শ করিয়া শচীদেবীকে ছুঁইবার ভয় দেখাইতেন। বাড়ীতে অতিথি-ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর-দেবতার সেবা, কাজেই শচীদেবী ভয়ে ত্রস্ত হইয়া অনুনয় বিনয় ও স্নেহ-ভালবাসায়, প্রার্থিত বস্তু পূরণের অঙ্গীকার করিয়া পুত্রকে বহু কষ্টে নিরস্ত করিতেন। পিতার শাসনকে কিঞ্চিৎ ভয় করিলেও মাতার তাড়নাকে নিমাই মোটেই গ্রাহ্য করিতেন না। তবে যখন অতিশয় উত্যক্তা শচীদেবী অনন্যোপায় হইয়া চক্ষের জল ফেলিতেন, তখন নিমাই একবারে গলিয়া যাইতেন। মায়ের চক্ষের জল দেখিলে নিমাই আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, শান্তভাবে গলা জড়াইয়া ধরিয়া মাকে খুশী করিতেন।

নিমাইয়ের আবদারে অনেক সময়ে পাড়াপড়শীও অস্থির হইয়া উঠিত। তবে মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন বালকের উপর সকলেরই একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল বলিয়া সকলেই তাহা আনন্দে সহ্য করিত। পাড়ায় এক মোদক পরিবার বাস করিতেন। মিঠাই-সন্দেশ খাওয়ার জন্য তাহাদের ঘরে নিমাইয়ের খুব যাতায়াত ছিল। অপত্যনির্বিশেষে মোদকদম্পতি তাঁহাকে ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়াইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন।

মিশ্রের বাড়ীর নিকটে জগদীশ ও হিরণ গোবর্ধন নামক দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদিন একাদশী ব্রত উপলক্ষে তাঁহারা গৃহদেবতার জন্য ফলমূল মিষ্টান্ন আয়োজন করিয়াছেন। নিমাই তাহা দেখিয়া ঘরে আসিয়া ভীষণ কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কান্নাতে অস্থির হইয়া শচীদেবী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নিমাই জানাইলেন, উক্ত ব্রাহ্মণের 'ঠাকুরের নৈবেদ্য' চাই। শচীদেবী ভীত ও চমকিত হইয়া তাহার মুখে হাত দিলেন এবং উহা অতি অপরাধের কথা বলিয়া বুঝাইয়া শুনাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নিমাই কিছুতেই শান্ত হইলেন না, কাঁদিয়া মাটিতে গড়াইতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া শচীদেবী বাজার হইতে ঐ সকল দ্রব্য আনাইয়া দিবেন বলিলেন; তাহাতেও নিমাই সন্তুষ্ট হইলেন না। "জগদীশ পণ্ডিতের বাড়ীর ঠাকুরের নৈবেদ্য চাই।" নিমাইয়ের কান্নার শব্দে পাড়াপড়শীরা একত্র হইয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহার আবদারের কথা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পৌঁছিলে, তাঁহারা নৈবেদ্য লইয়া আসিলেন; তখন নিমাই সন্তুষ্ট হইলেন।

শিশুকাল হইতেই নিমাই দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও মেধাবী। সাধারণ অপেক্ষা দেহ দীর্ঘ, বাহু আজানুলম্বিত, বক্ষস্থল সুপ্রশস্ত, কটিদেশ ক্ষীণ, বর্ণ উজ্জ্বলগৌর, বদনমণ্ডল প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় প্রফুল্ল, নয়নদ্বয় প্রেমে ঢলঢল। সমবয়সী সহপাঠীদের দলবদ্ধ করিয়া 'সর্দার' নিমাই নবদ্বীপের রাস্তাঘাটে খেলা করিয়া বেড়ান। সময় সময় উপদ্রবে লোককে অস্থির করিয়া তোলেন। কিন্তু তাঁহার ভুবনমোহন রূপ, আর পরিতৃপ্তিকর বাণীতে সকলেই

মুগ্ধ হয়। গঙ্গাঘাটই তাঁহার প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র। সঙ্গিগণসহ সাঁতার কাটেন, ডুব দেন, জলে লাফাইয়া পড়েন। তাঁহার জলখেলার উপদ্রবে স্নানার্থীরা উত্ত্যক্ত হয়। বয়স্ক লোকেরা নিষেধ করিলে আরও বেশী উপদ্রব করেন। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কেহ তাড়া করিলে ছুটিয়া পালান। আবার ধরা পড়িলে অনুনয়-বিনয় করিয়া লোককে মোহিত করেন। অতি আদরের ধন নয়নের মণি বলিয়া শচীদেবী নিমাইকে কঠোর শাসন করিতে না পারিলেও, জগন্নাথ পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিতেন না। আবশ্যকমত কঠোর শাসন, এমনকি সময়ে সময়ে গৃহেও আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; কিন্তু বুদ্ধিমান বালক অতি সহজেই অব্যাহতি লাভ করিত।

অন্য সকলের নিকট নানা প্রকার চাঞ্চল্য ও দুষ্টামি প্রকাশ করিলেও, বিশ্বরূপের কাছে নিমাই অতিশয় শান্তশিষ্ট থাকিতেন। অগ্রজের উপর নিমাইয়ের খুব টান, দাদাও অনুজকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। জন্ম হইতেই স্থির-ধীর বিশ্বরূপ অতিশয় মনোযোগের সহিত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। টোলে অধ্যাপকের সঙ্গেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। সেই জন্য ভ্রাতার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবার সুযোগ পাইতেন না এবং জগন্নাথ মিশ্রও সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম ব্যপদেশে অনেক সময় বাটীর বাহিরে থাকিতেন, কাজেই নিমাই স্বাধীনভাবে খেলাধুলার যথেষ্ট সুবিধা পাইতেন।

নিমাইয়ের ছেলেবেলা হইতেই মধ্যে মধ্যে এক অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পাইত; তখন তাঁহার বাহ্যিক সংজ্ঞা থাকিত না। কখনও কখনও সেই অবস্থায় তাঁহার দেহের দীপ্তি এমনই বাড়িত যে দেখিয়া লোকের বিস্ময় জন্মিত। আবার কখনও ঐরূপ অবস্থায় এমন গভীর তত্ত্বকথা বলিতেন যে লোকে অবাক হইয়া শুনিত। এইরূপ অবস্থার প্রকাশে পিতামাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়া, বিজ্ঞজনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বলিত, "মূর্ছা, বায়ু-রোগ, চিকিৎসা করাও।" কেহ বলিত, "অপদেবতার দৃষ্টি, রোজা ডাক।" আবার কেহ বলিত, "কোন দেবতার আবেশ, ঠাকুর-দেবতার পূজা মানসিক কর।" জগন্নাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন না হইলেও, শচীদেবী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হইয়া ঐ সকল উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিতেন। কিছু-কাল পরে, বারংবার ঐরূপ অবস্থার উদয়েও নিমাইয়ের কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক অবনতি, কিংবা সহজ স্বাভাবিক প্রফুল্লতার হ্রাস না দেখিয়া শচীদেবীর অন্তরের ভাবনা হ্রাস পাইয়াছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপের নিকটবর্তী শান্তিপুরে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য নামক একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শ্রীহট্ট জেলা তাঁহারও জন্মস্থান। শ্রীহট্ট তখন অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বহু ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের বাসভূমি ছিল।

শ্রীহট্টের অন্যতম রাজ্য লাউড় মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইলে সেখানকার বহু বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরবাসী হন। সেই সময়ে লাউড়ের রাজার সভাপণ্ডিত কমলাক্ষ ভট্টাচার্যও[১] শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। মহাপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্‌ভক্ত কমলাক্ষ, আচার্য শঙ্করের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত দশনামী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ভক্তাগ্রণী আচার্য শ্রীমৎ স্বামী মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান-ভজনে কাল কাটাইতেন। ভোগ-সুখ লাভের কামনায় নানা দেবদেবীর পূজা-অর্চনাপরায়ণ তখনকার জনসমাজে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ সর্বনিয়ন্তা এক অদ্বয় ভগবানের তত্ত্ব এবং মোক্ষ-লাভের জন্য তাঁহার উপাসনাই জীবের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া প্রচার করার ফলে তিনি 'অদ্বৈতাচার্য' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী সীতা-দেবীও সর্বপ্রকারে পতির অনুগামিনী হইয়া তাঁহার সহধর্মিণী নাম সার্থক করিয়াছিলেন। ধর্মের দুরবস্থা এবং লোকের দুঃখে ব্যথিতহৃদয় আচার্য দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বদা ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনাকালে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট আচার্যের গম্ভীর 'হুঙ্কার' শুনিয়া মনে হইত যেন জীব-জগতের উদ্ধারের জন্য তিনি ভগবানকে আকর্ষণ করিতেছেন।

অদ্বৈতাচার্য এবং জগন্নাথ মিশ্র উভয়ের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য থাকায়, শচী-দেবী ও সীতাদেবীর মধ্যেও খুব ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সেইজন্য আচার্য-দম্পতি মিশ্রপুত্র বিশ্বরূপকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং জন্মগ্রহণের পর হইতেই নিমাইয়ের উপরও উভয়ের স্নেহ-ভালবাসার সীমা ছিল না। মিশ্র-পরিবার দরিদ্র ছিলেন কিন্তু আচার্যের অবস্থা সচ্ছল ছিল। আচার্যপত্নী 'প্রাণের নিমাই'কে বস্ত্র অলঙ্কার উপহার দিতে ত্রুটি করিতেন না। সুযোগ পাইলেই তাঁহারা তাঁহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইয়া পরাইয়া সাজাইয়া পরমানন্দ লাভ

---

১ লাউড় রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ও অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থান বিগত ১৩০৪ সনে বাংলার ভীষণ ভূমিকম্পের পর মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত ও অরণ্যে আবৃত হইয়া যায়। কিছুকাল পূর্বে কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির চেষ্টায় সেই জঙ্গল পরিষ্কার ও প্রাচীন স্থান বাহির করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল উদ্যমীদিগের মধ্যে স্বনামধন্য কবি ৺মুকুন্দ দাস অন্যতম। বৎসর কয়েক আগে প্রবল বন্যাতে ঐ অঞ্চলের অনেক মাটি ধুইয়া যাওয়ায় বহু প্রাচীন কীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অদ্বৈতাচার্যের জন্মস্থানের নিকটবর্তী নদীতীরে বারুণী উপলক্ষে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। ঐ সময় বহু লোক দর্শন ও স্নান করিতে আসে। প্রবাদ আছে অদ্বৈতাচার্য তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে বারুণীযোগে গঙ্গাস্নান করাইবার জন্য পণ করিয়া তপস্যাপ্রভাবে সেখানে গঙ্গার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। সেইজন্য এখনও 'পণা-তীর্থ' বলিয়া ঐ স্থান পরিচিত রহিয়াছে।

করিতেন। অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপেও একটি বাসস্থান ছিল, মধ্যে মধ্যে আসিয়া সেখানে অবস্থান করিতেন। দেশে তখন প্রকৃত জ্ঞানী ভগবদ্ভক্ত অতি বিরল। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ভগবানের চিন্তা ও উপাসনা করিতেন। নবদ্বীপের মত স্থানেও ঐরূপ সজ্জনের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল এবং সমাজের অধিপতি বিষয়ী লোকের অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা ও নির্যাতনের ভয়ে তাঁহারা অতি সংগোপনে, একান্তে আপনার ভাবে বাস করিতেন। আচার্য অদ্বৈত নবদ্বীপে আসিলে ঐ সকল ভক্তগণের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। তাঁহারা আচার্যের সহিত মিলিত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে দিন কাটাইতেন। ঐ সকল ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস আচার্য এবং তাঁহার সহোদরগণ, মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীধর, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপের স্বভাবচরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়ে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বিশ্বরূপ খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে-ছিলেন এবং তাঁহার অন্তরে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল। তিনি পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য লালায়িত না হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়নে তৎপর হইয়াছিলেন। আচার্য অদ্বৈত নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে যখন কাল কাটাইতেন, তখন বিশ্বরূপও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে উহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ায় অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সেখানে কাটিতে লাগিল। এক এক দিন তথা হইতে ফিরিতে বিশ্বরূপের বেশী দেরি দেখিলে শচীদেবী 'দাদাকে' খাইবার জন্য ডাকিয়া আনিতে নিমাইকে পাঠাইতেন। আবার নিমাইও কখন কখন স্বেচ্ছায় দাদার সঙ্গে অদ্বৈত ভবনে উপস্থিত হইতেন। নিমাইকে পাইলে আচার্য ও ভক্তগণের হৃদয় আপনা হইতে উল্লসিত হইয়া উঠিত, তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহারা অনিমেষ লোচনে বালকের ভাবপূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া এক অনির্বচনীয় সুখে নিমগ্ন হইতেন। জ্ঞানী আচার্য বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, নিমাইকে দেখিলেই তাঁহার মন কেন এমন হয়। তিনি বুঝিতে পারিতেন না, কেন নিমাইকে বার বার কোলে করিতে ইচ্ছা করে॥ নিমাই দাদার হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহাভিমুখে চলিতেন, আর ভক্তগণসঙ্গে আচার্য একদৃষ্টে পথপানে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, যতক্ষণ দেখা যায় দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না। চতুর বালকও তাঁহাদের মন বুঝিয়াই যেন মধ্যে মধ্যে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেন।

নিমাইয়ের বয়স এখন আট বৎসর, বিশ্বরূপ ষোল অতিক্রম করিয়াছেন। জগন্নাথ বিশ্বরূপের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়া পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই

বিশ্বরূপের অন্তরে বৈরাগের উদয় হইয়াছিল। তিনি অনিত্য ত্রিতাপপূর্ণ সংসারের অসারতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মায়া-মোহের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল। এখন বিবাহের কথায় ভীত হইয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার জন্য এক গভীর রাত্রে চিরকালের জন্য পিতামাতা আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

গুণবান যোগ্য পুত্রের অভাবে মিশ্রদম্পতি শোকে মুহ্যমান হইলেও নিজেদের দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করিয়া পুত্রের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। পুত্র আবার ফিরিয়া আসিয়া সংসারী হউক এরূপ তাঁহারা কখনও কামনা করিতেন না। তাঁহাদের মহত্ত্ব দেখিয়া লোকে বলিত, যেমন পিতামাতা তেমনই পুত্র। স্নেহশীল দাদার অভাবে নিমাই অতিশয় কাতর হইলেও, শোকাকুল পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, "দাদা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আমি ঘরে থাকিয়া তোমাদের সেবা করিব। তিনি সন্ন্যাসী হওয়াতে ভালই হইয়াছে, পিতৃকুল মাতৃকুল উদ্ধার হইবে।" অল্পবয়স্ক বালকের মুখে গভীর জ্ঞানের কথা শুনিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। শচী-দেবী পুত্রকে বুকে ধরিয়া হৃদয় শীতল করিতেন। কিন্তু জগন্নাথের মনে হইত, তাঁহার এই পুত্রও সংসারে থাকিবে না।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর নিমাইয়ের স্বভাবের খুব পরিবর্তন হইয়া গেল। পূর্বের চাঞ্চল্য ও খেলাধূলা ত্যাগ করিয়া তিনি পড়াশুনায় বেশী মন দিলেন এবং পিতামাতার খুব অনুগত হইয়া অধিকাংশ সময় গৃহে তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করিতে থাকিলেন। কিছুদিন পরে নবম বর্ষে জগন্নাথ নিমাইকে উপনয়ন দিয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম সন্ধ্যা-উপাসনা পূজা-অর্চনাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রতিভাবলে বালক অতি অল্প সময়ে, সুন্দররূপে সমস্ত আয়ত্ত করিতে লাগিল দেখিয়া পিতামাতার অন্তরও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

মেধাবী বালক মনোযোগের সহিত লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া অতি অল্প দিনেই খুব উন্নতিলাভ করাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু জগন্নাথের মনে প্রবল আশংকার উদয় হইল। স্নেহকাতর বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন পড়িয়া শুনিয়া নিমাইও বিশ্বরূপের ন্যায় গৃহত্যাগ করিবে না ত নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, কাজেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পথ বন্ধ করিবার জন্য সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মিশ্র তাঁহার পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। পাঠশালা ছাড়িতে নিমাই খুব অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, জগন্নাথ তাঁহাকে জোর করিয়া পড়া ছাড়াইলেন। নিমাইয়ের দুঃখ দেখিয়া শচীদেবীর অন্তরেও

খুব কষ্ট হইল। বিশেষতঃ মূর্খ হইয়া থাকিলে জীবন অতিশয় দুঃখে কাটিবে ভাবিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় খুব চিন্তিতা হইলেন।

বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে মায়ের নিকট একখানা পুস্তক রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "নিমাই বড় হইয়া পড়িবে।" পাছে সেই পুস্তক পড়িয়া নিমাইও সন্ন্যাসী হয় এই ভয়ে এখন শচীদেবী সেই পুস্তকখানা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অদ্বৈতাচার্যের সংসর্গে বিশ্বরূপের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইয়াছে ভাবিয়া শচীদেবী আচার্যের উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি আচার্যের সম্বন্ধে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতেন এবং পাছে নিমাই আবার তাঁহার সংসর্গে সন্ন্যাসী হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া নিমাইকে অদ্বৈতের নিকট যাইতে নিষেধ করিতেন।

পাঠশালা ছাড়িয়া লেখাপড়া করিতে না পাইযা নিমাই আবার খেলাধূলায় মত্ত হইলেন। দিনে দিনে তাঁহার চাঞ্চল্য বাড়িয়া চলিল। সমবয়সী বালকদের লইয়া দলবদ্ধ হইয়া নিমাই সারাদিন রাস্তায় ঘাটে হাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ান—খেলা করেন। তাঁহার খেলার দৌরাত্ম্যে পাড়াপ্রতিবেশী অস্থির হইয়া উঠিল। গঙ্গার ঘাটে তাঁহার জলখেলার উৎপাতে লোকের স্নান-আহ্নিক পূজা-অর্চা করা দায় হইল। ঘাটের জল ঘোলা করেন, কেহ কিছু বলিলে গায়ে জল ছিটান, ডুব দিয়া পা ধরিয়া টানেন ইত্যাদি। সঙ্গীদের লইয়া আবার লোকের পূজা-অর্চার সময়ে গণ্ডগোল বাধান, স্নান-আহ্নিকের বিকৃত অনুকরণ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উপহাস করেন। লোকের পূজার নৈবেদ্য চুরি করিয়া খান, আবার স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সুবিধা পাইলে কাড়িয়াও নেন। সুস্থ সুদৃঢ়দেহ বলিষ্ঠ বালককে লোকে সহজে ধরিতে পারে না, ছুটিয়া পালান, না হয় সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হন। আবার কেহ কখনও ধরিয়া ফেলিলে কাকুতি মিনতি করিয়া মুক্ত হন।

লোকে উত্ত্যক্ত হইয়া মিশ্রদম্পতির নিকট অভিযোগ করিলে তাঁহারা অনুনয় করিয়া পুত্রের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এইভাবে দিন যায়, শচী-জগন্নাথ পুত্রকে অনেক প্রকারে প্রবোধ দেন, কখনও বা ভয় দেখান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। নিমাইয়ের চাঞ্চল্য খেলাধূলা বাড়িয়াই চলিল। শেষে শচীদেবী ও আত্মীয়স্বজন মিলিয়া জগন্নাথকে বুঝাইয়া নিমাইকে আবার পাঠশালায় পাঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায় পূর্বের ন্যায় মনোযোগ আসিয়া নিমাইয়ের স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-বিবাহ-ভ্রমণ
দীক্ষা-সাধন-ভজন

জগন্নাথের বয়স হইয়াছে, তদুপরি বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে অন্তরে প্রবল আঘাত পাইয়া তাঁহার আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিল। অন্তিম সময় নিকটবর্তী হইলে মাতা-পুত্র মিলিয়া জগন্নাথের দেহ গঙ্গায় লইয়া গেলেন[১]। অন্তর্জলী করিবার সময় নিমাই শোকে অভিভূত হইয়া পিতার চরণে মস্তক রাখিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্নেহার্দ্র-হৃদয় পুত্রবৎসল পিতা জগন্নাথ, স্নেহের নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিলেন, তৎপরে তাঁহাকে গৃহদেবতা রঘুনাথের চরণে সমর্পণ করিয়া রঘুনাথের নাম লইয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। নিমাই বিধিমতে পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। এখন হইতে তিনি শোকাতুরা মাতার সেবার জন্য বিশেষ অবহিত হইলেন। নিজের অন্তরের শোক গোপন করিয়া বালক নিমাই সেবা শুশ্রূষা সান্ত্বনা প্রবোধবাক্য দ্বারা মাতাকে সর্বদা সুখী রাখিবার চেষ্টা করিতেন। শচীদেবীও সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন, যাহাতে অল্প বয়সে পিতৃ-হীন বালক দুঃখকষ্ট না পায়, অভাবে অভিযোগে তাহার চিত্ত না অবসন্ন হয়।

এখন নিমাইয়ের উপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব। অবশ্য শচীদেবীকে আত্মীয়স্বজনেরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি অল্প বয়সে এইরূপ দায়িত্ব বহন করা কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে। অল্প বয়সে এই গুরুভার স্কন্ধে পড়িলেও নিমাই দুর্বল বা কাতর হইলেন না। তিনি ব্রাহ্মণের কর্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম, গৃহদেবতা রঘুনাথের সেবা-পূজা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, শোকার্তা জননীর সেবাশুশ্রূষা, ঘর-সংসার রক্ষা ও

---

১ দেহত্যাগের পূর্বে জগন্নাথ নিমাইকে বলিয়াছিলেন—

"আমার বচনে বাপু কর অবধান।
তোমার মায়ের যেন নহে অপমান॥
তোমার অবতারে সর্বলোক পরিত্রাণ।
গয়াতে আমার বাপু দিও পিণ্ডদান॥"

—জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল

নিজেদের খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ যথারীতি চালাইয়াও খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাবচরিত্র একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। নিমাই এখন স্থির ধীর গম্ভীর 'কাজের লোক'।

এই সময়ে পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন। এখন অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ। গঙ্গাদাস ব্যাকরণের খুব বড় পণ্ডিত। নিমাইয়ের অপূর্ব মেধা দেখিয়া পণ্ডিতের খুব উৎসাহ হইল, তিনি যত্নের সহিত নিমাইকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প বয়সে বিশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত নিমাই ব্যাকরণশাস্ত্র সমাপ্ত করিলেন। তাহার পর সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য খ্যাতনামা অধ্যাপক মহেশ্বর বিশারদের টোলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া সহপাঠী, অধ্যাপকগণ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী—সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। সেই সময় দেশে ন্যায়শাস্ত্রেরই সম্মান ও আদর সর্বাপেক্ষা বেশী। বিচারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করাই পণ্ডিতগণের একমাত্র কাম্য বস্তু। যিনি এইরূপ তর্কযুদ্ধে জয়ী হইতেন, সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত এবং দেশময় তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা থাকিত না।

প্রাচীনকালে মিথিলাদেশ নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থীরা বহু কষ্ট স্বীকার পূর্বক মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। মিথিলার পণ্ডিতগণ বিদেশী ছাত্রদিগকে আদর করিয়া অধ্যাপনা করাইলেও পড়া শেষ হইলে দেশে ফিরিবার সময় নব্য ন্যায়ের কোন পুস্তক সঙ্গে লইয়া যাইতে দিতেন না। এইরূপে তাঁহারা বহুকাল পর্যন্ত ঐ শাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বিদেশী পণ্ডিতেরা শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে গিয়া পুস্তকের অভাবে ছাত্র-দিগকে ঐ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা দিতে পারিতেন না। ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য নবদ্বীপ হইতেও বিদ্যার্থীরা মিথিলায় গমন করিতেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে নবদ্বীপের জনৈক ব্রাহ্মণকুমার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় গমন করেন। অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরিবার কালে যখন তাঁহার সমস্ত পুস্তক কাড়িয়া লওয়া হইল, তখন সেই প্রতিভাবান যুবক হাসিয়া বলিলেন, "বঙ্গদেশ হইতে আর কেহ আপনাদের নিকট পড়িতে আসিবে না।" গুরুকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণান্তর বাংলার গৌরব অলৌকিক মেধাবী সেই ব্রাহ্মণকুলতিলক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। নব্য ন্যায়ের প্রধান গ্রন্থসকল তিনি মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন নবদ্বীপে ফিরিয়া অসামান্য প্রতিভাবলে ও স্বীয় স্মৃতিশক্তি সহায়ে সেই সকল গ্রন্থ প্রচার

করিলেন। নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের টোল হইল, তিনি ও অপর অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে সেই দুর্বোধ্য শাস্ত্র সহজ সরল ভাবে পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নাম বাসুদেব সার্বভৌম। অতঃপর বাঙালী ছাত্রের আর মিথিলায় যাইবার প্রয়োজন রহিল না। বাসুদেবের পরে রঘুনাথ, জগদীশ প্রভৃতি ধীমান বাঙালী পণ্ডিতগণ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক সকল লিখিয়া ঐ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিলেন। সেই অবধি বাঙালীরাই ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা বাঙালী নৈয়ায়িকগণের নিকট আসিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের ছাত্রাবস্থায় নব্য ন্যায়শাস্ত্র নবদ্বীপে নূতন আসিয়াছে। কাজেই উহার আদরও খুব বেশী। প্রতিভাশালী অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা ইহার আলোচনায় মত্ত। নিত্য নূতন টীকা-টিপ্পনী লিখিত ও সমালোচিত হইতেছে। বাদ-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্কে রাস্তা-ঘাট মুখরিত, সর্বসাধারণ এমনকি স্ত্রী-লোকেরা পর্যন্ত উহাতে মনোযোগী। নিমাইয়ের খুব আকাঙ্ক্ষা একজন বড় নৈয়ায়িক হইবেন। সেইজন্য খুব মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতেছেন। তাঁহার প্রতিভাতে সকলেই চমকিত। ছাত্রাবস্থাতেই নিমাই ন্যায়ের একখানা প্রধান গ্রন্থের উপর একটি টীকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন জনৈক মেধাবী সহপাঠীকে[১] তাহা হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে সেই সহপাঠীর অশ্রু ঝরিতে লাগিল, দেখিয়া নিমাইয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নিমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বারংবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার ভালবাসায় মুগ্ধ সহপাঠী বলিলেন, "ভাই, বহু পরিশ্রম করিয়া আমিও ঐ গ্রন্থের একখানি টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার লেখা শুনিয়া মনে হইল, তোমার গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, আমার গ্রন্থ কেহ পাঠ করিবে না।" সহপাঠীর দুঃখের কারণ শুনিয়া নিমাই হাসিতে হাসিতে সেই মুহূর্তেই নিজের লেখা টীকাটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে গ্রন্থ প্রচারে উৎসাহ দিলেন[২]।

কিছুকাল পরে নিমাই অধ্যয়ন শেষ করিলেন এবং জনৈক ধনিকের চণ্ডী-মণ্ডপে ব্যাকরণের টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে কলাপ ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। অল্প বয়স হইলেও তিনি যখন অতিশয় দক্ষতা ও গাম্ভীর্যের সহিত ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ

---

১ সুবিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ 'দীধিতি'র রচয়িতা রঘুনাথ।

২ নিমাই ইতঃপূর্বে ব্যাকরণেরও একখানা টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন এবং বিদ্যার্থি-গণের নিকট উহা গৃহীত হইয়াছিল।

করিলেন, তখন সকলেই অতীব বিস্মিত হইল। ভাল অধ্যাপক বলিয়া শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি বিস্তার হওয়াতে, চতুর্দিক হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তখন স্থানাভাবে বুদ্ধিমন্ত খান নামক নবদ্বীপের অতিশয় সমৃদ্ধিশালী জমিদারের সুবৃহৎ মণ্ডপে তাঁহার টোল স্থানান্তরিত হইল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় পণ্ডিতগণের সঙ্গে তাঁহার বিচার হইত, বিচারে সর্বত্রই জয়লাভ করায় চারিদিকে নাম-যশের বিস্তার হইল। ফলতঃ অল্পবয়সেই তিনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পুত্রের গৌরবে শচীদেবীর বুক ফুলিয়া উঠিল, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছুকাল পরে শচীদেবী ও আত্মীয়স্বজনের আগ্রহে নিমাই শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। সুন্দরী সুশীলা বালিকা বধূকে পাইয়া শচীদেবীর প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইল। বধূও যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করিয়া জননীর ন্যায় স্নেহশীলা শাশুড়ীকে সুখী রাখিতে চেষ্টা করিতেন। দেশ জুড়িয়া নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদায়-আদায় বাড়িয়া চলিল। লক্ষ্মীদেবী বড় হইয়া ক্রমে ক্রমে সংসারের কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। শচীদেবীর পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইল। তাঁহার দুঃখের সংসার আবার সুখময় হইয়া উঠিল। ভগবানের পাদপদ্মে পুত্র ও বধূর মঙ্গল কামনা করিয়া এখন তিনি পরম শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সস্ত্রীক জগন্নাথ মিশ্র মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্টে স্বীয় জন্মভূমিতে গিয়া বাস করিতেন। বিশ্বরূপ একটু বড় হইলে তাঁহাকে লইয়া একবার এইরূপে শ্রীহট্টে গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে ফিরিবার সময় শচীদেবীর গর্ভাবস্থা ছিল। জগন্নাথের বৃদ্ধা জননী শোভাদেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এক মহাপুরুষ ঐ গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। সেইজন্য বধূসহ পুত্রকে বিদায় দিয়া বৃদ্ধা আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পৌত্র জন্মিলে যেন তাহার মুখ দেখি।" নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবার পর নিমাই জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু জগন্নাথ বাঁচিয়া থাকিতে বৃদ্ধার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। এখন পুত্রশোকাতুরা অতিবৃদ্ধা শোভাদেবীকে অন্তিমশয্যাগতা জানিয়া শচীদেবী নিমাইকে তাঁহার পূর্বকথা জানাইলে, জননীর অভিপ্রায় ও পিতামহীর আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া নিমাই শুভদিনে শ্রীহট্টে যাত্রা করিলেন।

সেই সময়ে দূরদেশে দুর্গম পথে পদব্রজে ও নৌকায় যাতায়াত যে কিরূপ কষ্টকর ছিল, তাহা আমরা এখন কল্পনাও করিতে পারিব না। নিমাই পণ্ডিত

নানা দেশ[১] গ্রাম, জনপদ দর্শন করিতে করিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্টে ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে উপস্থিত হইয়া পিতামহীর চরণ বন্দনা করিলেন। পরম রূপবান, গুণবান পৌত্রকে পাইয়া বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না; তাহাকে বক্ষে ধরিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে শোভাদেবী বারবার আশীর্বাদ করিলেন। নিমাইয়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা পূর্বেই অনেকের কর্ণগোচর হইয়াছিল; এখন তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যমণ্ডিত দেহকান্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিনয়নম্র ব্যবহার দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নিমাই জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরমানন্দে কিছুকাল পিতৃপুরুষের বাসভূমিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলের বহু পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্যার্থী তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করিতে আসিতেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, সুমিষ্ট বাক্য ও সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। নিমাইয়ের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে শ্রীহট্টের বরগঙ্গা নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। নিমাই সেখানেও গিয়াছিলেন এবং 'চৈতন্যের বাড়ী' বলিয়া সেই গ্রামে এখনও একটি স্থান পরিচিত আছে। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একখানা 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পুস্তক তাঁহার জ্ঞাতি-বংশীয়গণের দ্বারা ঐস্থানে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইত। উক্ত পুস্তক তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহকে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে।[২]

এইরূপে কিছুকাল শ্রীহট্টে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আনন্দে কাটাইয়া নিমাই নবদ্বীপে ফিরিবার জন্য বাহির হইলেন এবং পুনরায় নানা দেশ নগর দেখিয়া ধীরে ধীরে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীহট্ট-দর্শন ও পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণে তাঁহার প্রায় ছয় মাসের উপর সময় লাগিয়াছিল।

দেশের প্রাচীন প্রথা ছিল—বিদ্বান পণ্ডিত অথবা অন্যান্য কলাবিৎ গুণী ব্যক্তিগণ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রাজা জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ ঐ সকল আগন্তুক গুণীদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেন এবং খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থার সহিত স্থানীয় লোকের সঙ্গে ভাববিনিময়ের সুবিধা করিয়া দিতেন। স্থানীয় পণ্ডিত গুণী ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঐ সকল অভ্যাগতদের যে তর্কবিচারের প্রতিযোগিতা হইত, তাহাতে দেশে ঐ সকল বিদ্যা প্রচারের

১ পদ্মা পার হইয়া ফরিদপুর, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, এগারসিন্দুর, বেতাল পরগণা হইয়া ঐ অঞ্চলের সমস্ত সমৃদ্ধ জনপদ দেখিয়া শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

২ অল্পদিন পূর্বে স্থানীয় জনৈক ধর্মোন্মাদ কর্তৃক উক্ত পুস্তক অপহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুসন্ধানে জানা গেল।

বিশেষ সহায়তা হইত। বিদায়কালে ঐ সকল পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিগণকে পদমর্যাদানুযায়ী 'বিদায়' দিয়া সম্মান করারও রীতি প্রচলিত ছিল। তাহার ফলে তাঁহারা চাকুরি না করিলেও অন্নবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতেন না। প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে এই প্রথার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।

শ্রীহট্ট-যাতায়াতকালে নিমাই পূর্ববঙ্গের বহু প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সকল অঞ্চলের ভূম্যাধিকারী ধনী ব্যক্তিগণ এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনার কালে, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার নাম যশঃ খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয় এবং বিদায়-আদায়ে তিনি বহু অর্থ বস্ত্র তৈজসপত্রাদি লাভ করেন। এই ভ্রমণের ফলে নিমাই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সমাজের দুরবস্থা, ধর্মের নামে অধর্মের প্রসার, পতিত নিম্নশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধেও বিশেষ অবহিত হইয়াছিলেন।

নিমাইয়ের অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্প-দংশনে দেহত্যাগ হইয়াছিল। একে পুত্র ঘরে নাই, তাহাতে পরম আদরের বধূর দেহত্যাগে শচীদেবী শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। নিমাইও দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া দীর্ঘকাল পরে বহু অর্থবস্ত্রাদি সহ ঘরে ফিরিয়া প্রিয়তমা পত্নীর অভাবে অন্তরে ভীষণ ব্যথা পাইলেন।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সত্ত্বেও সংসার আপন রীতিতেই চলিতে থাকে। নিমাই নবদ্বীপে ফিরিবার পর, বিদ্যার্থীরা আবার সমবেত হইতে লাগিল এবং তিনিও পূর্বের ন্যায় বুদ্ধিমন্ত খানের বৃহৎ মণ্ডপে টোল করিয়া আবার তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় সকলের অনুরোধে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নাম্নী আর এক পরমা সুন্দরী গুণবতী বালিকাকে বিবাহ করিয়া মায়ের চিত্ত আনন্দিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ অনুগত ধনবান জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান উদ্যোগী হইয়া বিবাহের ব্যয়ভার স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লওয়ায় এইবার বিবাহ বিশেষ ঘটা করিয়া সুসম্পন্ন হইল এবং ছাত্রমণ্ডলী, অধ্যাপকগণ ও আত্মীয়স্বজনেরা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহ-বাসর আনন্দমুখর করিয়া তুলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতাও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন; সেজন্য প্রাণাধিকা একমাত্র দুহিতাকে বিস্তর যৌতুক সহ সুপাত্রে অর্পণ করিলেন। স্বামীগৃহে আসিয়া পতিপরায়ণা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া অনন্যমনে শাশুড়ী ও স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নিমাই পণ্ডিতের টোল ও অধ্যাপনার খ্যাতি বাড়িয়াই চলিল। এই সময়ে এক দিগ্বিজয়ী

পণ্ডিতকে[১] কাব্যবিচারে পরাস্ত করায় তাঁহার যশঃ চারিদিকে আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং নিমন্ত্রণ বিদায়-আদায় বৃদ্ধি পাইয়া সংসারের অবস্থাও খুব সচ্ছল হয়। শচীদেবী পুত্র-পুত্রবধূকে লইয়া আবার পরমানন্দে সংসার করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাসাচার্য, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের নাম আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং বিশ্বরূপের সঙ্গে আচার্যের সভায় নিমাইয়ের যাতায়াত এবং তাঁহার উপর ভক্তগণের প্রীতির কথাও বলিয়াছি। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সঙ্গে নিমাইয়ের সম্পর্ক একপ্রকার ছিন্ন হইয়া গেল। নিমাই তাঁহাদের সঙ্গে না মিশিলেও আচার্য প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। তাঁহাদের অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা—নিমাইয়ের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য-গৌরব, নাম-যশঃ চারিদিকে খুব বিস্তৃত হওয়ায় লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; কিন্তু ভক্তগণ তাহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতেন—"এমন ভগবন্নিষ্ঠ মহদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত শেষে একটা 'বিচারমল্ল' হইয়া দাঁড়াইলেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" রাস্তাঘাটে দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠাইতে চাহিতেন, কিন্তু নিমাই ব্যাকরণ, সাহিত্য তর্কশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিচার-বিতর্কে আহ্বান করিতেন। নিমাই ভগবানের কথায় কান দিতেন না। সঙ্গিগণসহ ঠাট্টাতামাশা রঙ্গরস আরম্ভ করিতেন। ভক্তগণ তাই তাঁহাকে দেখিলে পাশ কাটাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহাতেও রক্ষা পাইতেন না। মহাবলবান নিমাই দৌড়িয়া গিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইতেন এবং নানারূপ রঙ্গরসের কথাবার্তায় বিব্রত করিয়া তুলিতেন।

মুরারি গুপ্তের জন্মস্থান শ্রীহট্টে। প্রতিভাবান গুপ্ত অল্প বয়সেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং স্বধর্ম চিকিৎসা ব্যবসায়েও খুব নামযশ হইয়াছিল। নিমাইয়ের গৃহের পাশেই মুরারি গুপ্তের ঘর। ছেলেবেলা হইতেই আলাপ-পরিচয়। মুরারির বয়স নিমাই অপেক্ষা দশ-বার বৎসর বেশী। মুরারি কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্যাভিমানী হইলেও শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। শিশুকাল হইতেই নিমাইকে মুরারি অন্তরের সহিত ভালবাসেন; কিন্তু নিমাই তাঁহাকে সুবিধা পাইলেই উত্ত্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন। মুরারির সঙ্গে দেখা হইলেই নিমাই তাঁহাকে 'হট্টিয়া' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মুরারি বিরক্ত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নিমাই 'হট্টিয়া' বুলির অনুকরণে নানাপ্রকার বিদ্রূপ তামাশা আরম্ভ করিতেন। নবদ্বীপের আর একজন ভক্ত শ্রীধর, অতি গরীব

---

১ ইনি কাশ্মীর দেশীয় কেশবাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নিরীহ লোক; কলার মোচা থোড় খোলা বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। শ্রীধর আপনার ঘরে বসিয়া গভীর রাত্রে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করিতেন। তাঁহার প্রতিবেশী বিষয়ী লোকেরা এইজন্য উপহাস করিয়া বলিত—

"মহাচাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধার জনালায় রাত্রে চেঁচাইয়া মরে॥"

—চৈতন্যভাগবত

গরীব বেচারা শ্রীধরের উপর নিমাইয়ের উপদ্রবের সীমা ছিল না। বাজারে গিয়াই নিমাই তাঁহার কাছে উপস্থিত হন এবং বিনামূল্যে থোড় মোচা লইবার জন্য দাবী করেন। শ্রীধর অনুনয়-বিনয় করিয়া নিজের অবস্থার কথা জানাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেও নিমাই কিছু না লইয়া ফিরেন না। শেষে ঠিক হইল, শ্রীধর রোজ তাঁহাকে একখণ্ড থোড় এবং ভোজন করিবার জন্য খোলা বিনা পয়সায় দিবেন। শচীদেবী নিষেধ করার ফলে নিমাই অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মিশিতেন না। আচার্যও তাঁহাকে পাণ্ডিত্যাভিমানী যুবক মনে করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতেন সত্য, কিন্তু মনে মনে এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া সর্বদা ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল ও ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইতেন।

কিছুকাল পরে নবদ্বীপে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর শুভাগমন হইল। শান্ত-সমাহিত ঈশ্বরপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া নিমাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। একদিন সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে আনিয়া যত্ন-পূর্বক শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ভিক্ষা করাইলেন। সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইহার নাম শ্রীমৎ স্বামী ঈশ্বরপুরী। ইনি শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীজি মহারাজের শিষ্য এবং অদ্বৈতাচার্যের গুরুভ্রাতা। সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতে নিমাইয়ের অন্তরে খুব তৃপ্তি বোধ হইল এবং সন্ন্যাসীও নিমাইয়ের ব্যবহারে এবং শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আন্তরিক আতিথেয়তায় প্রীত হইলেন। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য পুরীজি মহারাজ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাসাধিক কাল জনৈক সদ্গৃহস্থ ভক্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থান করিলেন। তাহাকে পাইয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের প্রাণে অতীব আনন্দের সঞ্চার হইল।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরপুরীজি সেই সময়ে একখানা গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। নবদ্বীপেই গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ হইল। নিমাই পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা তাঁহার শোনা ছিল। এখন আলাপ-পরিচয় হওয়াতে পুরীজি

গ্রন্থখানা দেখিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। নিমাই অতিশয় বিনয় নম্রতা প্রকাশ করিয়া পুরীজিকে জানাইলেন, ভগবৎতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্রে তিনি অনধিকারী, কাজেই গ্রন্থ-সমালোচনার যোগ্যতা তাঁহার নাই। নিমাই পণ্ডিতের নিরভিমানিতা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পুরীজি তাঁহাকে ব্যাকরণগত দোষ এবং ভাষার ভালমন্দ বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি গ্রন্থখানা ভাল করিয়া দেখিয়া স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পুরীজি মহারাজের সঙ্গ ও তাঁহার গ্রন্থ-আলোচনা নিমাইয়ের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পাণ্ডিত্য ও তর্ক-বিচারে তাঁহার আর পূর্বের ন্যায় উৎসাহ রহিল না, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতেও অনুরাগ কমিয়া গেল। দিনে দিনে নামযশের উপরও বিরক্তি আসিতে লাগিল। এইভাবে কিছুকাল গত হইবার পর নিমাই পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াধামে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিভাবকস্থানীয় মাতৃষ্বসাপতি চন্দ্রশেখর আচার্য, অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয় ও ছাত্র সঙ্গী হইয়াছিলেন। পদব্রজে নানা দেশ হইয়া পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রসিদ্ধ স্থানসকল দেখিয়া ক্রমে তাঁহারা গয়াতে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে তীর্থকৃত্য সম্পাদন, ফল্গুতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধক্রিয়া, বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান, অক্ষয়বটমূলে দান প্রভৃতি এবং গদাধর ও গয়েশ্বরীর দর্শন ও পূজাতে গয়াধামে পরমানন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এই সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ভগবদ্-ভজনে রত ছিলেন। নিমাই এখানে আসিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শন পাইয়া খুব আনন্দিত হইলেন। ভগবৎপ্রেমে বিভোর পুরীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতে নিমাইয়ের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। নিমাই পুরীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রাঁধিয়া ভিক্ষা দেন এবং তাঁহার মুখে ভগবৎতত্ত্ব ও প্রেম-ভক্তির কথা শুনেন। ক্রমে ভগবদ্ভক্তির আস্বাদ পাইয়া তাঁহার অন্তর সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। শাস্ত্রবিচার তর্ক-বিতর্ক জয়-পরাজয় অতি তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল এবং এত কাল এই সকল বৃথা কাজে জীবন কাটাইয়াছেন ভাবিয়া অনুশোচনা উপস্থিত হইল। নিমাই শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া সাধনভজনে নিমগ্ন হইলেন। কিছুদিন পরে গয়ার কার্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহার মতিগতি, জীবনযাপন-প্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে—'যেন এক নূতন মানুষ'। অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভের সঙ্গে সঙ্গে, এইবারের ভ্রমণেও তিনি দেশের ও সমাজের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার নানা সুযোগ পাইয়াছিলেন।

গৃহে ফিরিবার পর নিমাইয়ের মাতা পত্নী ও আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার ভাবগতিক ও চালচলন দেখিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া অতীব বিস্মিত ও

শঙ্কিত হইলেন। এখন তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা শুনিতে ভালবাসেন না, পূজাঅর্চা জপধ্যানেই দিবসের অধিকাংশ কাল কাটিয়া যায়, রাত্রিও সাধনভজনেই অতিবাহিত হয়। সংসারের কাজকর্মে মোটেই মন দেন না, অধ্যাপনার ত সময়ই হয় না। লোকের সঙ্গে একেবারেই মিশেন না, নির্জনে চুপ করিয়া আপনার ভাবে থাকেন। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না করিতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে করুণ স্বরে হাহুতাশ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে শচীর প্রাণ শুকাইয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়াও পতির জন্য চিন্তিতা হইলেন এবং নিজের আহারনিদ্রা ভুলিয়া প্রাণপণে দিবারাত্র তাঁহার সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে সুস্থ করিবার জন্য শচীদেবী নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, দিনে দিনে তাঁহার ভাবের বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আত্মীয়স্বজন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিলেন, বায়ুরোগ হইয়াছে, সুচিকিৎসা করিলে উপশম হইবে। অনেক চিকিৎসাও হইল, মাথায় বহু ঠাণ্ডা তেল মালিশ করা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। বিদ্যার্থীরা পড়িবার জন্য আসিলে নিমাই তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেন, "বাবা, আমার আর পড়াইবার সাধ্য নাই, তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট যাও।" বিশেষ অনুগত প্রিয় ছাত্ররা কিছুতেই ছাড়ে না, তাঁহাদের অনুরোধে আগ্রহে কখন কখন পড়াইতে বসেন। কিন্তু পড়াইতে আরম্ভ করিয়াই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া যান, পাঠ্যপুস্তকের বিষয় ছাড়িয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে থাকেন। দুঃখিত হইয়া ছাত্রগণ একে একে বিদায় লইল, টোল ভাঙিয়া গেল। নিমাই নিশ্চিন্ত চিত্তে একাগ্রমনে কঠোর সাধনভজনে ডুবিলেন। শচীদেবীর অন্তরে বিষম উদ্বেগ, পাছে নিমাইও বিশ্বরূপের মত সন্ন্যাসী হইয়া পলাইয়া যায়। তিনি চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দিনরাত করজোড়ে ভগবানের নিকট নিমাইয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

নিমাই পণ্ডিতের আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা নবদ্বীপময় রাষ্ট্র হইল। নিমাইয়ের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত খবর পাইয়া অতীব দুঃখিত হইলেন এবং একদিন আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। গঙ্গাদাস প্রবোধ দিয়া নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, তুমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান, পণ্ডিত; অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিবারাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিতেছ কেন? ছাত্রগণকে পড়াও, সংসার দেখ, স্বধর্ম পালন কর, তাহাতেই চতুর্বর্গ লাভ হইবে।" নিমাই করজোড়ে অনুনয় করিয়া অধ্যাপককে বলিলেন, "আচার্য! আমার ত ইচ্ছা সংসার রক্ষা হয়, কিন্তু কি করিব? আমার মন আর আমার বশে নাই, কে যেন আমাকে জোর করিয়া অন্যদিকে লইয়া যাইতেছে। আপনারা আমায় ক্ষমা

করুন, সাধ্য থাকিলে অবশ্যই আপনাদের আদেশ পালন করিতাম, কিন্তু উহা আমার শক্তির অতীত।' বুঝাইয়া শুনাইয়া কোন ফল হইল না দেখিয়া গঙ্গাদাস দুঃখিত চিত্তে বিদায় লইলেন।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নিমাইয়ের সহাধ্যায়ী, নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি একদিন আসিয়া নিমাইকে ক্রিয়াকাণ্ডের প্রশংসা শুনাইলেন এবং কৃষ্ণনাম কৃষ্ণভক্তির বাড়াবাড়ি ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্মে মনোযোগী হওয়ার জন্য সদুপদেশ দিলেন। ভগবদ্ভক্তির বিরোধী উক্তিসমূহ শুনিয়া নিমাইয়ের মহা বিরক্তি আসিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া পণ্ডিতকে বিদায় দিলেন। কৃষ্ণানন্দ রাগিয়া চলিয়া গেলেন এবং লোকের নিকট প্রচার করিলেন, "নিমাই পণ্ডিত পাগল হইয়া গিয়াছে।"

নিমাইয়ের ভাবান্তরের কথা শুনিয়া, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, দামোদর, শ্রীধর ও তাঁহার সহাধ্যায়ী বিশেষ অনুগত বাল্যবন্ধু গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ দেখিতে আসিলেন। নিমাইয়ের কথাবার্তা শুনিয়া এবং ব্যবহার চালচলন দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর পুলকিত হইল। তাঁহারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন নিমাইয়ের অন্তরে অতি উচ্চস্তরের ভাব-ভক্তির বিকাশ হইয়াছে। তাঁহারা আনন্দিত হইয়া নিমাইয়ের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া নিমাইয়ের প্রাণ উল্লসিত হইল। অত্যন্ত আপনার জন মনে করিয়া নিমাই ভক্তগণকে আদর-আপ্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য ও শ্রীবাসাচার্যাদি প্রবীণ ব্যক্তিগণ শচীদেবীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "নিমাইয়ের এই অবস্থার জন্য চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই, উহা মস্তিষ্কের বিকার কিংবা পাগলামি নহে, উহা অতি দুর্লভ বস্তু। ভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত উচ্চাধিকারী ব্যক্তিগণই তীব্র সাধনভজনের ফলে এই দেববাঞ্ছিত অবস্থা লাভ করেন। উহা ভগবদ্ভক্তির চিহ্ন; কিছুদিন পরে শান্তভাব অবলম্বন করিবে।" বয়স্ক অভিজ্ঞ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণের কথায় শচীর মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর অনন্যচিত্ত নিমাই একাগ্রমনে সাধনভজনে নিবিষ্ট হইয়া দিনে দিনে নানাপ্রকার উচ্চ উচ্চতর অবস্থা সকল অনুভব করিতে লাগিলেন। মনপ্রাণ দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ হওয়ায় ব্যাকুলতা ও বিষণ্ণভাব ধীরে ধীরে কমিয়া গেল, চিত্ত প্রশান্ত হইল। তাঁহার অদ্ভুত অবস্থা ও ভগবদ্ভক্তির উপলব্ধি করিয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। পরমানন্দিত হইয়া তাঁহারা নিমাইয়ের সঙ্গলাভের জন্য ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ-সঙ্গে নিমাইয়েরও খুব আনন্দ হয়। পুলকে আনন্দিত

দেখিয়া শচীদেবীর প্রাণ অনেকটা ঠাণ্ডা হইল, বিষ্ণুপ্রিয়াও অন্তরে স্বস্তি অনুভব করিলেন।

ক্রমে ক্রমে ভগবৎপ্রসঙ্গে ও ভজন-কীর্তনে নিমাইয়ের নানাপ্রকার অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক সেবাযত্ন আরম্ভ করিলেন। তিনিও ক্রমে ভগবানের ভাবে ষোলআনা তন্ময় হইয়া গেলেন। তাঁহার পূর্বের স্বভাব ও চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। উচ্চ উচ্চ অবস্থার মুহুর্মুহুঃ প্রকাশে, তাঁহার সুন্দর বদনমণ্ডল এখন সর্বদাই দিব্য জ্যোতির্ময় বলিয়া মনে হইত। ফলে বহু লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার সুমধুর উপদেশে ও অসাধারণ প্রেমভাবে লোকের চিত্ত মোহিত হইল। দিনে দিনে ভক্তসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলেই এখন বুঝিলেন, নিমাই পণ্ডিত এক অসাধারণ মহাপুরুষ। এখন হইতে ভক্তগণ-সঙ্গে মিলিয়া নিমাই ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও ভজন-কীর্তনে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ভক্তগণের সমাবেশে, তাঁহাদের ভক্তি-ভালবাসাতে এবং অযাচিত দানে-উপহারে, শচী-দেবীর ঘরে এখন নিত্য উৎসব। মধ্যে মধ্যে আবার বিশিষ্ট ভক্তগণের গৃহেও ভক্তসঙ্গে মিলিত হইয়া নিমাই আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। ভক্তদের সহিত নিমাই ও তাঁহার পরিবারবর্গের নূতন ও মধুরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

অদ্বৈতাচার্যের প্রতি জননীর পূর্ব মনোভাব ও উক্তিসমূহ স্মরণ করিয়া নিমাই একদিন শচীদেবীকে আচার্যের নিকট ক্ষমা চাহিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনিও পূর্ব ব্যবহারের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে--আচার্য শচীদেবীর কথা ও ব্যবহারে অতিশয় লজ্জিত ও নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া বারবার তাঁহাকে প্রণাম ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে মিশ্র পরিবারের সঙ্গে আচার্য পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আবার বাড়িয়া চলিল।

মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ, শ্রীধর, গদাধর, জগদানন্দ, দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এখন হইতে সম্পূর্ণভাবে নিমাইকে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার পবিত্র সংসর্গে তাঁহাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিল। অধিকাংশ সময়ই নিমাইয়ের সঙ্গে থাকা এবং তাঁহার অভিপ্রায়মতে জীবনযাপন ও সর্বতোভাবে তাঁহার আদেশপালন, ইহাই ভক্তগণ নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

ভক্তগণ-সঙ্গে মিলিত হইয়া, নিমাই নবদ্বীপে ভক্তিপ্রেমের এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিলেন। সমাজ আলোড়িত হইল, জনগণের চিত্তে নূতন জাগরণের সাড়া পড়িল। এই সময়ে শ্রীমৎ হরিদাস ও প্রভুপাদ নিত্যানন্দ আসিয়া মিলিত হওয়ায় এই ভক্তি স্রোতস্বিনী প্রবল তরঙ্গান্বিতা হইয়া দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়া দুই কূল ভাসাইয়া বহিয়া চলিল।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কথা—নিত্যানন্দের আগমন কীর্তন—প্রচার

হরিদাস ঠাকুর অথবা 'যবন হরিদাস' প্রথম জীবনে মুসলমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ঘরেই তাঁহার জন্ম; আবার অন্যেরা বলেন, ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থায় এক সহৃদয় মুসলমান দম্পতি কর্তৃক লালিত পালিত। জন্ম যাহার ঘরেই হউক ছেলেবেলায় তিনি মুসলমান ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরভক্তি ও হরিনামে প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সর্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সকলে নিষেধ করিল, অনেক বুঝাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই হরিনাম ছাড়িলেন না। শেষে বিরক্ত হইয়া তাহারা কাজীর নিকট নালিশ করিল। কাজীও হরিনাম করিতে নিষেধ করিলেন, গুরুতর শাস্তির ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। হরিদাস পূর্বের মতই দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কাজী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'হুকুম' দিলেন, "এই ধর্মত্যাগীকে বেত মারিতে মারিতে বাইশ বাজার ঘুরাইয়া আন, যতক্ষণ হরিনাম না ছাড়ে, ততক্ষণ বেত মারা থামাইও না।" জল্লাদগণ হুকুম তামিল করিবার জন্য হরিদাসকে ধরিয়া বেত মারিতে মারিতে বাইশ বাজার ঘুরাইতে চলিল। বেতের ঘায়ে হরিদাসের দেহ হইতে রক্ত ঝরিতে আরম্ভ করিল, গাত্রচর্ম উঠিয়া গেল, কিন্তু হরিনাম বন্ধ হইল না।

তাঁহার মন 'হরি'তে সম্পূর্ণ তন্ময় হওয়ায়, বেত্রাঘাতের কষ্ট কিছুই অনুভব করিলেন না বরং ভাবোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধ মধুর হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা, আশ্চর্য তিতিক্ষা ও অপূর্ব ভক্তি দেখিয়া সকলের হৃদয় স্তম্ভিত হইল; যাহারা বেত মারিতেছিল, তাহারা অন্তরে ভয় পাইয়া আর মারিতে সাহস করিল না। কাজীও শঙ্কিত হইয়া ছাড়িয়া দিতে বলিলেন এবং ভীত চিত্তে হরিদাসের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার পূর্বের নাম কি ছিল জানা যায় না, কিন্তু সেদিন হইতে 'যবন হরিদাস' নামে পরিচিত হইলেন। ভক্তগণ শ্রদ্ধা করিয়া নাম দিয়াছেন 'ঠাকুর হরিদাস।'

হরিদাস নিজ জন্মস্থান যশোহর জেলায় বূঢ়ন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী এক গ্রামের প্রান্তদেশে জঙ্গলের ধারে কুটির বাঁধিয়া মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবভক্তির কথা সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। ক্রমে ক্রমে বহুলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ঠ হইল এবং শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই সেই অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হওয়াতে, সেখানকার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার রামচন্দ্র খাঁর অন্তরে ভীষণ ঈর্ষার উদ্রেক হইল। রামচন্দ্র মনে মনে বুদ্ধি স্থির করিয়া হরিদাসের প্রভাব নষ্ঠ এবং লোকের চক্ষে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি দুষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিলেন। রামচন্দ্রের প্ররোচনায় এবং অর্থের প্রলোভনে ঐ দুষ্টা নারী হরিদাসকে কুপথগামী করিবার জন্য একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার কুঠিয়াতে উপস্থিত হইল। হরিদাস আপন মনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকটি তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। হরিদাস চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া ইঙ্গিতে বাহিরে বসিবার স্থান দেখাইয়া দিলেন। সেখানে বসিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে হরিদাস হরিনামে তন্ময় হইলেন। স্ত্রীলোকটির কথা আর মনেই রহিল না। সেখানে বসিয়া সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। ভাবিল, হরিদাস জপ শেষ করিয়া অবশ্যই তাহার নিকট আসিবেন, কথাবার্তা বলিবেন; কিন্তু হরিদাসের জপও শেষ হয় না কিছু বলেনও না। স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হইয়া শেষে তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল এবং নিজেই কথাবার্তা বলিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল। হরিদাস আবার তাহাকে বাহিরে গিয়া জপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সে সাধুর ইঙ্গিত উপেক্ষা করিতে পারিল না; নিরুপায় হইয়া আবার বাহিরে আসিল এবং বসিয়া বসিয়া জপ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেলেও হরিদাসের জপ শেষ হইল না, তিনি আসন ছাড়িয়াও উঠিলেন না। ভোরবেলা বিষণ্ণচিত্তে স্ত্রীলোকটি স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্র খাঁ তাহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আরও কুপিত হইলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়া পররাত্রে আবার তাহাকে পাঠাইলেন। সেইদিনও সন্ধ্যার পরেই অভাগিনী কুঠিয়াতে উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে হাবভাবে হরিদাসকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। হরিদাস পূর্ব দিনেরই ন্যায় তাহাকে বাহিরে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া আপন ভজনে নিমগ্ন হইলেন। বাহিরে সেই নারী হরিনাম শুনিতে শুনিতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া হরিদাসের অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু জপও শেষ হইল না, তিনি কোন

কথাও বলিলেন না। ভোর হইতেই সে পলাইয়া গিয়া রামচন্দ্র খাঁকে নিজের দুঃখের কাহিনী জানাইয়া স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ রামচন্দ্র[১] ক্ষান্ত হইলেন না। নানা প্রলোভন দেখাইয়া, ফন্দী যুক্তি শিখাইয়া স্ত্রীলোকটিকে পরের দিনও আবার পাঠাইলেন। রাত্রি হইতে না হইতেই অভাগিনী সাজিয়া গুজিয়া পুনরায় হরিদাসের কুঠিয়ায় গিয়া হাজির হইল। অভিপ্রায়—অদ্য জপের আসনে বসিবার পূর্বেই হরিদাসকে স্ববশে আনয়ন করিবে। দুষ্টা নারী নানাপ্রকারে তাহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শান্ত সমাহিতমনা হরিদাসের চিত্ত বিন্দুমাত্রও চঞ্চল হইল না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর বাক্যে স্ত্রীলোকটির মন বশীভূত করিলেন এবং পূর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় বাহিরে বসিয়া হরিনাম শুনিবার ইঙ্গিত করিলে সেও মন্ত্রচালিতবৎ তথায় গিয়া উপবেশন করিল। আপন আসনে বসিয়া হরিদাস যথা নিয়মে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম আরম্ভ করিলেন, আর বাহিরে বসিয়া সেই সুমধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্ত্রীলোকটিরও মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

পর পর তিন রাত্রি সাধ্যমত নানারূপ চেষ্টা করিয়াও হরিদাসের চিত্তে কোন প্রকার বিকার জন্মাইতে না পারিয়া এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া একাসনে বসিয়া তন্ময়ভাবে ভগবানের নামজপে অদ্ভুত নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্ত্রীলোকটির গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল। নিজের জীবনকে সে ধিক্কার দিয়া স্বকৃত দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা আরম্ভ করিল এবং রাত্রি প্রভাত হইলে জপ সাঙ্গ করিয়া হরিদাস যখন আসন ছাড়িয়া উঠিলেন তখন সে ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পড়িয়া স্বীয় অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা চাহিতে লাগিল। সাধু হরিদাস তাহাকে কৃপা করিলেন—সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক সদ্‌ভাবে জীবন যাপন ও হরিনাম করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। অভাগিনীর সৌভাগ্যের উদয় হইল। সে পূর্ব স্বভাব চালচলন সমস্ত ত্যাগ করিল, বিষয়সম্পত্তি গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিল এবং অতি দীনহীন ভাবে জীবন যাপন ও ভজন-সাধনে কাল কাটাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মতিগতির এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, এবং অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আরও বিস্মিত হইল।

এই ঘটনার কথা প্রচার হওয়ায়, হরিদাসের উপর লোকের শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া গেল। বহু লোক সদাসর্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে ও উপদেশ শুনিতে আসায়

---

১ মুসলমান শাসনকর্তার কোপে পড়িয়া সাধুবিদ্বেষী রামচন্দ্রের শেষজীবনে বিষয়সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয় এবং তিনি অতিশয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন।

ক্রমশঃ ভিড় বাড়িয়া চলিল। তাহাতে সাধনভজনের বিঘ্ন হয় দেখিয়া হরিদাস সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত কুঠিয়াতে সেই স্ত্রীলোকটি জীবনের অবশিষ্ট কাল বাস করিয়া কঠোর সাধনভজনে কালাতিপাত করিয়াছিল।

হরিদাস সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু 'তিন লক্ষ হরিনামকীর্তন' ও তাঁহার সেই অদ্ভুত ভজননিষ্ঠা ছাড়িলেন না। সেই সময় দেশে প্রকৃত ধার্মিক সাধু মহাত্মার দর্শন বড় দুর্লভ ছিল। লোকেও এইরূপ ব্যক্তির বিশেষ আদরযত্ন করিতে জানিত না। শক্তি-সম্পদ লাভের জন্য, ঐহিক সুখভোগ, মান-প্রতিষ্ঠার জন্যই সকলে লালায়িত ছিল। ভগবানের চিন্তা, জপ-ধ্যান, নিষ্কাম প্রেম-ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল; কাজেই হরিদাসের মহিমা কে বুঝিবে? নানা দেশ ঘুরিয়া কিছুকাল পরে হরিদাস শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন এবং গঙ্গাতীরে অতি মনোরম অনুকূল স্থান পাইয়া সেখানে আসন লাগাইয়া, আপন ভাবে ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে বাস করিতেন, হরিদাসকে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি হরিদাসকে শান্তিপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং গঙ্গাতীরে অতি নির্জন স্থানে ভজনের উপযোগী একটি গুহা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। আচার্যই হরিদাসের অন্নবস্ত্র যোগাইতে লাগিলেন। ভক্তিমান আচার্যকে পাইয়া হরিদাসেরও খুব আনন্দ হইল। আচার্যের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে ও ভগবদ্ভজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া তিনি পরমানন্দে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। হরিদাসকে আচার্য অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এমনকি নিজে মহা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইয়াও পিতার মৃত্যুতিথিতে বাৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অন্ন হরিদাসকে খাওয়াইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। দীনতার প্রতিমূর্তি হরিদাস সেই অন্ন গ্রহণ করিতে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিলেও আচার্যের অত্যধিক আগ্রহে ও অনুরোধে অস্বীকার করিতে পারিতেন না। তেজীয়ান আচার্য প্রচলিত প্রথা ও সমাজবিধি উপেক্ষা করতঃ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম 'ব্রাহ্মণ্য-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ' এই সত্য অনুসরণ করিতেন। ক্রমশঃ 'নদের নিমাই'য়ের মহিমা, ভাব-ভক্তি ও কীর্তনের কথা হরিদাসের কর্ণগোচর হইল। আচার্যের মুখে নিমাইয়ের বিশেষ পরিচয় পাইয়া হরিদাস আকৃষ্ট হইলেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। হরিদাসকে পাইয়া নিমাইয়েরও আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠিল।

শ্রীমৎ নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রাম। তিনি ব্রাহ্মসন্তান। তাঁহার পিতার নাম মুকুন্দ ওঝা (ডাক নাম হাড়াই পণ্ডিত), মাতার নাম পদ্মা-

বতী। পূর্বাশ্রমে নিত্যানন্দের নাম ছিল কুবের। কথিত আছে বাল্যকালে জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ সেই সন্ন্যাসীই তাঁহাকে 'নিত্যানন্দ' নামে দেন। গৃহত্যাগের পর তিনি সাধনভজন ও তীর্থসমূহ-দর্শন-ব্যপদেশে সমগ্র ভাবতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সকলের নিকট তিনি অবধূত বলিয়া পরিচিত। তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণকে অবধূত বলা হয়। তাঁহাবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক যদৃচ্ছা বিচরণ করেন, আবার ইচ্ছা হইলে গৃহস্থের ন্যায় বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারধর্ম পালন করেন। অবধূতশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ শেষকালে চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া পত্নীগ্রহণ পূর্বক গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। বিবাহ করিবার পূর্বে বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার কালে তাঁহার যেরূপ পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা ও মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কারাদি ধারণের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, তিনি তান্ত্রিক অবধূত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের সঙ্গী, অবধূতের অবলম্বন—নীলকণ্ঠ মহাদেব (শিবলিঙ্গ) এবং তারা-যন্ত্র এখনও তাঁহার আবাসস্থান খড়দহে তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন। আবার এইরূপ একশ্রেণীর ত্যাগী পরিব্রাজক আছেন যাঁহারা জ্ঞানের অতি উচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়া বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারে কোন বিশেষ রীতি-নিয়মেব অপেক্ষা রাখেন না এবং বালকবৎ পরমানন্দে বিচরণ করেন। তাঁহাদিগকেও অবধূত বলা হয়। যোগিশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় অবধূতমণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন। নিত্যানন্দও এইরূপ উচ্চকোটীর মহাত্মা ছিলেন এবং দত্তাত্রেয়ের ন্যায় তাঁহারও অবধূত নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে।[১]

তীর্থভ্রমণকালে, কোন স্থানে নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপের সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হয়। বিশ্বরূপ তখন কোন দশনামী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সমান বয়স বলিয়া ও স্বভাবের মিল থাকায় উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই সুযোগে নিত্যানন্দ, শঙ্করারণ্যের পূর্বাশ্রমের নাম-ঠিকানা ও মা বাপ ভাইয়ের কথা সমস্ত শুনিয়া লইয়াছিলেন। পরিভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশে আসিয়া এখন তাঁহার বন্ধুর পূর্বাশ্রম ও পরিবারবর্গের কথা মনে পড়িল এবং তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে শ্রীবাসাচার্য

---

১ "যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃপুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥" "অক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধূতসংসারবন্ধনাৎ, তত্ত্বমস্যর্থ-সিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে॥"

তাঁহাকে পাইয়া অতি আদরে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। নিত্যানন্দের অতি উচ্চ অবস্থার পরিচয় পাইয়া শ্রীবাসের মনে খুব আনন্দ হইল। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা-পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীও পরম ভক্তিমতী ছিলেন। নিত্যানন্দের বালকবৎ স্বভাবে তিনি আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহে সেবা করিতেন।

নিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে আসিলেন তাহার কিছু পূর্ব হইতে নিমাই দেশে হরিনাম কীর্তনের প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। নবদ্বীপে পেঁাছিবার পূর্বেই সে কাহিনী নিত্যানন্দের কর্ণগোচর হইয়াছিল।[১] এখন তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলেন। প্রেমানন্দে মত্ত নিতাই নিমাইয়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন। উভয়েই উভয়কে পরমাদরে গ্রহণ করিলেন, উভয়ের প্রাণে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; ভক্তগণেরও উল্লাসের সীমা রহিল না। নিত্যানন্দ শচীদেবীকে দর্শন করিয়া মাতৃ সম্বোধনে পাদবন্দনা করিলেন। শচীদেবী বিশ্বরূপের সঙ্গে নিত্যানন্দের সাদৃশ্য দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে বিশ্বরূপের সংবাদ পাইয়া বিশ্বরূপেরই মত পুত্রজ্ঞানে তাঁহাকে আদর করিতে লাগিলেন। নিমাইও তাঁহাকে স্বীয় অগ্রজের ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন। শচীদেবী তাঁহাকে ডাকিতেন 'নিতাই' এবং সেই নামেই তাঁহার পরিচয় হইল। এখন হইতে নিমাই-নিতাই দুই ভাইকে লইয়া ভক্তগণ শচীদেবীর গৃহে আনন্দের হাট বসাইলেন। নিমাইকে দেখাশুনা করিবার, বিশেষতঃ কীর্তনের সময় ভাবাবস্থায় তাঁহার দেহরক্ষার ভার নিতাইয়ের উপর দিয়া শচীদেবীর প্রাণে অনেক স্বস্তি হইল। নিতাই ছায়ার ন্যায় সর্বদা নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ভাবাবেশে তাঁহার দেহ যাহাতে ভূলুণ্ঠিত না হয়, সেজন্য কীর্তনের সময় নিতাই নিমাইয়ের পশ্চাতে থাকিয়া দুই হাত মেলিয়া আগলাইয়া রাখিতেন।

শচীদেবীর গৃহে এখন নিত্য মহোৎসব। ভগবৎপ্রসঙ্গ সেবা-পূজা পাঠ-কীর্তন লাগিয়াই আছে। চারিদিক হইতে লোক আসিতেছে, নিত্য নূতন ভক্ত হইতেছে। কত লোক কত জিনিসপত্র লইয়া আসে। রঘুনাথের কৃপায় কিছুমাত্র অভাব-অনটন নাই। ভক্ত মহিলাগণের সঙ্গে মিলিতা হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শাশুড়ীর চালনাধীনে এবং স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে সানন্দে রন্ধনাদি কার্যের দ্বারা ও অন্যপ্রকারে সকলের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আত্মনিয়োগ করিলেন।

নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রতি রাত্রে ভগবৎপ্রসঙ্গ ভজন-কীর্তনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। যাহাতে বহির্মুখ লোক আসিয়া নিজেদের ভাব ভঙ্গ না করে, সেজন্য সাবধান হইয়া তাঁহারা বাহিরের লোককে

১ কাশীধামেই তিনি এই খবর পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়

ঐ সভায় প্রবেশ করিতে দিতেন না, গোপন ভাবেই উহার অনুষ্ঠান হইত। শ্রীবাসাচার্যের গৃহ অতি নির্জন দেখিয়া কিছুকাল পরে নিমাই সেইখানেই ভজনের স্থান নির্দিষ্ট করিলেন এবং প্রতি রাত্রে অন্তরঙ্গ ভক্তগণসঙ্গে শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ভজন-কীর্তনে পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় সম্বৎসর ব্যাপিয়া প্রতি রাত্রে শ্রীবাসের গৃহে ভক্তমিলন ও ভজন-কীর্তন হইয়াছিল। সেই স্থানে ভক্তগণসঙ্গে ভজন-কীর্তনে নিমাইয়ের দেহে কত বিচিত্র ভাবের বিকাশ হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। মুগ্ধচিত্ত ভক্তগণ সেই সকল অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া জীবন সফল মনে করিতেন। কখনও কখনও ভাবে নিমাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন। তখন তাঁহার বদনমণ্ডল দিব্য প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া দর্শকের নয়নমন সার্থক করিত। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান না থাকায় আত্মীয়-স্বজনের প্রাণে আশঙ্কা জাগিত। বিশিষ্ট ভক্তগণ তখন যে ভাব অবলম্বনে তাঁহার মন অন্তর্মুখী হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া তদনুসারে ভগবানের নাম শুনাইতেন, এইরূপে ধীরে ধীরে আবার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত।

নিমাইয়ের ইচ্ছানুসারে একবার আষাঢ়-পূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমা (ভগবান ব্যাসের আবির্ভাব-তিথি) উপলক্ষে শ্রীবাস-ভবনে ব্যাসপূজার আয়োজন হইয়াছিল। সন্ন্যাসিগণের পক্ষে এই পবিত্র তিথিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ আজ নিমাইয়ের আগ্রহাতিশয্যে সন্ন্যাসিগুরু ব্যাসের পূজায় ব্রতী হইয়াছেন।[১] শ্রীবাস-ভবনে আজ স্বর্গীয় সমারোহ—পূজা-উৎসবের সকল ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নিমাই-নিতাই আনন্দকীর্তনে মাতোয়ারা—ভাগ্যবান ভক্তমণ্ডলী সাশ্রুপুলকে ভজনপূজনে ডুবিয়া আছেন। শাস্ত্রবিধিমত সকল কৃত্য সমাপনান্তে নিত্যানন্দ ব্যাসের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। চন্দনচর্চিত সুগন্ধ পুষ্পমাল্য অঞ্জলিবদ্ধ করে লইয়া তিনি নয়নজলে ভাসিতেছেন। অকস্মাৎ ভাবের ঘোরে নিমাইকেই আদিগুরু ব্যাসজ্ঞানে মালা নিবেদন করিয়া নিতাই

---

১ ব্যাসপূজার প্রাক্কালে ভাবোন্মত্ত নিত্যানন্দ উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে স্বীয় দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে নিমাইয়ের সঙ্গে গঙ্গায় গমন করিয়া উহা বিসর্জন দেন। অবধূতশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দের দণ্ডবিসর্জন সম্ভবতঃ এইভাবেই হইয়াছিল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন:

"দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লইয়া॥
শ্রীবাসাদি সভেই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥"

—চৈতন্যভাগবত

বাহ্যজ্ঞানহারা হইলেন। ভাববিহ্বল নিমাইয়ের বদনমণ্ডলে বৈদ্যুতিক দ্যুতি খেলিয়া গেল--ষড়্ভুজমূর্তিতে শ্রীনিত্যানন্দের নয়নপথে প্রকট হইয়া চকিতে এক দিব্যভাবের সৃষ্টি করিলেন।

"প্রভু বোলে 'নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট কর ব্যাসেব পূজন ॥'
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক উপর ॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল ॥
ষড়্ভুজ দেখি মূর্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই॥"

—চৈতন্যভাগবত

মধ্যে মধ্যে নিমাই অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া ভক্তিভাবের উদ্দীপক পৌরাণিক নাটকের অভিনয় করিতেন। তিনি স্বয়ং প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিতেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অভিনয়ের পরিচ্ছদ পরিহিত নিমাইকে শচীদেবীও নিজ পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিতেন না। আবার কখনও কোন দেব-দেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলে নিমাই সেই সেই ভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহাতে কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, শিব প্রভৃতি পুরুষভাবের, আবার কখনও রাধা, লক্ষ্মী, দুর্গা, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি প্রকৃতি-ভাবের প্রকাশ হইত।

"কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি, ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥"

একদিন এইরূপে ব্রজলীলার অভিনয়ে নিমাই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হইয়া বরাভয় করে ভক্তগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অপার স্নেহশালিনী বরাভয়ধারিণী জগজ্জননীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ভক্তগণের প্রাণ অতীব উল্লসিত হইল। তাঁহারা ভক্তিভরে জগদম্বার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম ও যথাশক্তি পূজা অর্চনা করিয়া করজোড়ে স্তব আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভক্তগণ দেবীমাহাত্ম্য অনুসরণ করিয়া ভগবতীকে

স্তব করিলে পর, তিনিও অতীব প্রসন্না হইয়া তাহাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়াছিলেন।

"জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে।
সেইরূপে সভে স্তুতি পড়ে, প্রভু শুনে ॥
... ...
'জয় জয় জগত-জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্য কে দিবেক সীমা ॥
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্তিভেদ।
সর্বপ্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে এই কহি ॥
সর্বাশ্রয়া তুমি সর্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥
জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব জীব পালয়িতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব-জীবের জীবন।
তোমা স্মরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥
তুমি সে করহ ত্রিজগতে সৃষ্টিস্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া।
রাখহ জননি! চরণের দিয়া ছায়া ॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥

সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবের মাতা কর নিজ দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্বভূত বুদ্ধি।
তোমা স্মরিলে সর্বমন্ত্রাদির সিদ্ধি॥"

—চৈতন্যভাগবত

ভক্তগণসঙ্গে নিমাই অতি সংগোপনে আপনার ভাবে চলিলেও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তিনি যেভাবে সর্বদা সৎপ্রসঙ্গ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা আলাপ-আলোচনা করিতেন, ভাগবত-তত্ত্ব ভক্তিমার্গ ও সাধনভজনের উপদেশ দিতেন, সর্বোপরি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপে যে নূতন ভাবের প্রকাশ হইত, তাহাতে বহু ব্যক্তির জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। আবার ঐ সকল ভক্তগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নিত্য নূতন লোক আশ্রয় লইতে আসিত। এইরূপে দিনে দিনে তাঁহার প্রভাব বাড়িয়া চলাতে ঈর্ষাপরায়ণ ধর্মদ্বেষী একদল লোক বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা নিমাই এবং ভক্তগণের, বিশেষতঃ তাঁহাদের ধর্মমত ও ভজনপ্রণালীর নিন্দা করিয়া, চারিদিকে নানাপ্রকার কুৎসা রটাইতে লাগিল। ভাবের বিরোধী, অধার্মিক অসৎলোকের সংসর্গে ভাবভক্তির বিশেষ হানি হয় বলিয়া নিমাই ও ভক্তগণ ঐ সকল লোক হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করিতেন। বিশেষতঃ ভজনকালে ঐ সকল লোককে কিছুতেই নিকটে আসিতে দিতেন না। ইহাতে নিন্দুকেরা নিন্দা করিবার আরও সুযোগ পাইল। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাই রাত্রে শ্রীবাস আচার্যের গৃহে ভক্তগণসহ মিলিত হইয়া নানারূপ দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করেন। বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে সমাজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রচার করিলেন, "নিমাই পণ্ডিত বেদসম্মত ধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া কতকগুলি ভণ্ডের সঙ্গে মিলিয়া সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে।"

গোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ স্বীয় স্বভাবের দোষে লোকের নিকট 'চাপাল গোপাল' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সে নিমাই ও ভক্তমণ্ডলীর কুৎসা প্রচার করিবার জন্য একদিন রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীর দ্বারদেশে একটি মদের হাঁড়ি এবং কলাপাতায় লাল জবা ফুল, আতপ চাউল, দূর্বা ইত্যাদি এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিল যে, সকালে উহা দেখিয়া লোকের সন্দেহ হইবে, শ্রীবাসের ঘরে রাত্রে তান্ত্রিক কাপালিকদিগের ন্যায় কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। ভোরবেলা দরজা খুলিবামাত্রই শ্রীবাস সমস্ত দেখিতে পাইলেন এবং নিন্দুকদিগের কাণ্ড বুঝিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিলেন।

শ্রীবাসাচার্যের শাশুড়ী ছিলেন ঘোর বিষয়াসক্ত ও ভগবদ্‌বিমুখী। নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হইয়া জামাতা বিপথে চলিতেছে বলিয়া তাঁহার খুব দুঃখ হইয়াছিল। রাত্রে শ্রীবাসের গৃহে নিমাই যখন ভক্তগণসঙ্গে মিলিত হইতেন, তখন বিরুদ্ধবাদী ও বহির্মুখ বলিয়া বুড়ীকে সেখানে থাকিতে দেওয়া হইত না। বুড়ীর অন্তরে খুব কৌতূহল হওয়ায়, তিনি একদিন অতি গোপনে গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া রহিলেন। রাত্রে ভজনের সময় অন্যদিনের ন্যায় অন্তরে উল্লাস ও ভাবের প্রকাশ না হওয়ায় সেদিন ভক্তগণসহ নিমাই অতীব দুঃখিত হইলেন। কারণানুসন্ধান করিয়া নিমাই বলিলেন, "কোন অভক্ত বাহিরের লোক এখানে আছে কিনা খোঁজ দেখি।" তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সন্ধান করিয়া, শ্রীবাসের শাশুড়ীকে পাওয়া গেল এবং তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর ভজনে চিত্ত খুব একাগ্র হওয়ায় সকলেই আনন্দে মগ্ন হইলেন। নিন্দুকদের এই সকল অপচেষ্টা সত্ত্বেও নিমাই যথা নিয়মে ভক্তদিগকে লইয়া সাধনভজনে রত রহিলেন। কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নিকে কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। ভগবদিচ্ছায় যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহাও আর শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আবদ্ধ রহিল না, নিমাই আর আপনার ভাবে ভক্তসঙ্গে গোপনে থাকিতে পারিলেন না। লোকের সঙ্গে তিনি যতই মিশেন ততই তাহাদের ত্রিতাপজ্বালার পরিচয় পান। তাঁহার কোমল প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের ব্যথা জুড়াইতে ভগবানের কথা শুনাইবার জন্য আকুল হইলেন। ইহার ফলে প্রকাশ্যে সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভজন-কীর্তন আরম্ভ হইল। এখন হইতে নিমাই প্রত্যহ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বিকালবেলা নবদ্বীপের রাস্তায় এবং গঙ্গার ঘাটে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন।

পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ এবং গয়াযাত্রার কালে নিমাই ধর্মের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপেও সমাজের অতি উচ্চস্থানে বসিয়া তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এখন আবার সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া, দেশের দুঃখদুর্দশা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। একদিকে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জাত্যভিমান, পাণ্ডিত্যগর্ব ও ভগবদ্‌বিমুখী বাদবিতণ্ডায় বৃথা আয়ুক্ষয়; অন্যদিকে শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতির অতিশয় দুরবস্থা, ধর্মে-শাস্ত্রে অজ্ঞতা, অস্পৃশ্যতা, ভগবদুপাসনায় অনধিকার, এমনকি পূজা-পার্বণ-উৎসবাদি উপলক্ষেও একত্র মিলনে অযোগ্যতা এবং বিদেশীয় বিজাতীয় ধর্মে আগ্রহ ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, অযাচিত হরিনাম বিতরণের মধ্যেই এই সমাজব্যাধি ও ধর্মবিপ্লব নিরোধের মহৌষধ রহিয়াছে। তাঁহার সুমধুর কীর্তনে, অমায়িক ব্যবহারে, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে,

সর্বোপরি প্রাণ-মন-বিমোহনকারী সরল সহজ ভগবৎ-তত্ত্বপূর্ণ মধুর উপদেশে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইল।

তাঁহার হরিনাম প্রচাবের ফলে ক্রমশঃ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা ও ঐক্য বৃদ্ধি এবং ঈর্ষা-দ্বেষ, ভেদবৈষম্যের ভাব কমিতে আরম্ভ হইল। নিমাই সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেন, তিনি ভক্তগণসঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রচার করিতেন;—জোড়হাতে অনুনয় করিয়া বলিতেন, "ভাই, এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম কেন বৃথা ক্ষয় করিতেছ, কেন ত্রিতাপজ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছ? হরিকে ডাক, হরিনাম কীর্তন কর, অন্তরে পরম আনন্দের সঞ্চার হইবে। ভগবদ্ভজন ভিন্ন শান্তি-লাভের আর কোন উপায় নাই।" তাঁহার প্রচারে উচ্চনীচ ভেদ নাই, ধনীদরিদ্র বিচার নাই, পণ্ডিতমূর্খ জ্ঞান নাই; নিমাই যাহাকে দেখেন তাহাকেই বুঝাইয়া শুনাইয়া ভগবানের পথে আনিবার হরিনাম লওয়াইবার চেষ্টা করেন। ভগবদ্-ভাবে বিভোর তাঁহার কমনীয় মূর্তি, সুমধুর বাণী ও অমায়িক ব্যবহারে লোকের প্রাণ মন বিমোহিত হইয়া যায়, তাহারা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস নিমাইয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী, নবদ্বীপের সর্বত্র, বিশেষতঃ অলিতে গলিতে ঘুরিয়া পতিত কাঙ্গাল দীনদুঃখী ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন, ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, তাহারা জাগিয়া উঠিল। নিমাইয়ের প্রভাব ও দেশে ধর্মভাবের বৃদ্ধি, বিশেষতঃ ইতর সাধারণের অভ্যুদয় দেখিয়া সমাজের রক্ষণশীল গোঁড়ার দল বিষম চিন্তায় পড়িলেন। তাঁহারা এবং ধর্মবিরোধী গুণ্ডাপ্রকৃতি দুষ্ট লোকেরা নিমাইকে পরম শত্রু মনে করিয়া, তাঁহার নিন্দা ও অনিষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিল। সেই সময়ে নবদ্বীপে জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই ভাই নগর-রক্ষার কার্যে নিযুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণসন্তান হইলেও তাহারা সদাচার-স্বধর্ম ভুলিয়া, গুণ্ডামি মাতলামি করিয়া কাল কাটাইত। লোকের নিকট তাহারা 'জগাই মাধাই' নামে পরিচিত ছিল। নিমাইয়ের ধর্মপ্রচার, হরিনাম-সংকীর্তন তাহাদের মোটেই ভাল লাগিত না। ক্রমে কীর্তনের জ্বালায় তাহারা অস্থির হইয়া উঠিল। কিছুকাল পরে যখন দেখিতে পাইল, তাহাদের গুণ্ডা সহচরেরাও অনেকে নিমাইয়ের দলে ভিড়িয়া সংকীর্তনে যোগ দেয়, হরিনামে গড়াগড়ি যায়, তাহাদের সঙ্গে মিশে না, মদ খায় না, গুণ্ডামি করে না, তখন তাহারা আর সহ্য করিতে পারিল না; প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে নিতাই হরিদাসের সহায়তায় হরিনাম বিতরণে আত্মসমর্পণ

করিয়াছেন। যাহাকে দেখেন তাহাকেই প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া হরিনাম লইতে অনুনয় করেন।

"নিতাই যারে দেখে তারে বলে জোড় কর করি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর-হরি ॥"

ভাবে ভোলা নিতাই একদিন প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন। প্রেমভাবে বিভোর হইয়া হরিনাম কীর্তন করিয়া নবদ্বীপের রাস্তায় চলিয়াছেন, এমন সময় জগাই মাধাই দুই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে দুই ভাই তাঁহার দিকে আসিতেছে, মুখে অশ্লীল গালাগালি। ভাবে বিভোর নিতাইও নাচিতে নাচিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন, মুখে সুমধুর হরিনাম। নিতাইকে দেখিয়া দুই ভাই ক্ষেপিয়া গিয়াছে, মাধাইয়ের হাতে মদের কলসী ছিল, ছুড়িয়া নিতাইয়ের মাথায় মারিল। মাটির কলসী মাথায় ঠেকিয়া ভাঙিয়া গেল এবং উহার আঘাতে মাথা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কান্ড দেখিয়া চারিদিকে লোকে হায় হায় করিয়া উঠিল। কিন্তু নিতাইয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নাচিতে নাচিতেই অগ্রসর হইয়া মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া গাহিলেন,

"হরি বলে আয়, নেচে আয়, জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই ॥"

আজ নিতাইয়ের প্রেমের পরশে পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল। বিবেকের উদয় হওয়াতে দুই ভাই নিত্যানন্দের চরণে পড়িয়া বার বার ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

এদিকে নিতাইয়ের মাথায় কলসী মারার কথা শুনিয়া ভক্তগণসহ নিমাই ছুটিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার সেই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া লোক ভীত হইল, ভক্তগণের বিস্ময় জন্মিল। তখন আকুলচিত্ত জগাই মাধাই নিমাইয়ের চরণে লুটাইতে লাগিল, অতিশয় আর্তি প্রকাশ করিয়া কৃপাভিক্ষা করিল। চারিদিকে বহু লোক জড় হইয়াছে; কিন্তু সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক নিস্পন্দ। কিন্তু নিমাইয়ের চিত্ত নরম হইল না। তিনি পাষন্ডদিগকে ক্ষমা করিলেন না। তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দয়াল নিতাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুই ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য, তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য, নিমাইকে ধরিয়া বসিলেন। করুণহৃদয় নিত্যানন্দের অদ্ভুত প্রেমে উপস্থিত সকলের চিত্ত আর্দ্র হইল। নিমাইয়ের অন্তরে অতিশয় দুঃখ হইলেও তিনি নিতাইয়ের দিব্যচরিত্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ক্ষমা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, "মার খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়াল

কোথায় আছে"—ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। নিতাইয়ের প্রেমে তাঁহার অন্তর পুলকিত হইল, চিত্ত শান্ত হইল। তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রেম-ভাবের বারংবার প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার কৃপাতেই ইহারা উদ্ধার পাইল।" নিমাই যে শুধু জগাই মাধাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করিলেন তাহাই নহে, তিনি তাহাদের উপর বিশেষ কৃপা করিলেন। তাই সেইদিন হইতে দুই ভাইয়ের জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং তাহারা অতিশয় সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিয়া হরিনাম করিতে লাগিল।

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাহাদের দৃষ্টান্তে বহু লোকের জীবনের পরিবর্তন ঘটিল। নবদ্বীপের বহু পাপীতাপী পূর্বের কু-অভ্যাস ছাড়িয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল। জগাই মাধাইয়ের উপদ্রবে নবদ্বীপের লোক অস্থির ছিল, এখন তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের পরোপকার প্রবৃত্তি ও ধর্মভাবে সকলের অন্তরে শ্রদ্ধা জন্মিল। নিমাইয়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী জগাই-মাধাই প্রত্যহ প্রাতে সকলের আগে গঙ্গায় গিয়া গঙ্গার ঘাট ধুইয়া ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত যাহাতে লোকে সুখে স্নানাহ্নিক করিতে পারে। এখনও নবদ্বীপে গঙ্গায় 'মাধাইয়ের ঘাট' দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনে দিনে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিমাইয়ের ভগবৎপ্রসঙ্গ ভজন-হরিনাম-কীর্তন ধর্মপ্রচার খুব জোরে চলিতেছে। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীধর শ্রীবাস, হরিদাস মুরারি, মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা সর্বদা নিমাইয়ের কাছে থাকিয়া তাঁহার প্রচার-কার্যে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন। সকলের উৎসাহে কীর্তনের বিশেষ উপযোগী করিয়া নূতন ধরনের মৃদঙ্গ (খোল) নির্মাণ করা হইল, বড় বড় করতাল প্রস্তুত হইল। সন্ধ্যার পরে ভাল ভাল গায়ক-বাদক সহ খোল করতাল শিঙ্গাদি বাজাইয়া শত শত ঘৃতের মশাল জ্বালাইয়া, বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া, নৃত্যগীত করিতে করিতে নিমাই নবদ্বীপের রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যহ নগরসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। সেই মহাসংকীর্তন-ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিত, নৃত্যে ধরণী কম্পিত হইত, ভাবাবেশে বিভোর হইয়া শত শত লোক ধুলায় গড়াগড়ি দিত। উচ্চ নীচ ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া ভক্তগণ প্রেমে পুলকিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেন, একে অন্যের পদরজঃ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সে-দৃশ্য দেখিলে মনে হইত যেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে মানুষে মানুষে ভেদ-বিসংবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে। কীর্তনের সময়ে নিমাইয়ের অঙ্গে কত যে অলৌকিক ভাবের বিকাশ হইত তাহার সীমা নাই। ভাবাবেশ-কালে তাঁহার দিব্য কান্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত আর ভাবিত, এই অপরূপ

জ্যোতিঃ মানুষে কখনও সম্ভব হয় না। জীব উদ্ধারের জন্য সাক্ষাৎ ভগবানের করুণাই এই দেবোপম নরাকারে মূর্তিমান হইয়াছে।

"বাহু তুলি, হরি বলি, প্রেম-দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥"

কীর্তনের সময় অনেক ভক্তিমান ব্যক্তি প্রেমে পুলকিত হইয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে কীর্তনীয়াগণের মধ্যে কদলী, বাতাসা, ফল, মিষ্টি ছড়াইয়া দিতেন। ভক্তগণসহ নিমাই মহাপ্রসাদজ্ঞানে সেই সকল দ্রব্য কুড়াইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া, যে যেমন পারেন লুটিয়া নিয়া আনন্দ করিতে করিতে খাইতেন এবং খাওয়াইতেন। এইভাবে 'হরিলুট' আরম্ভ হইল। হরিলুটে কোন সামাজিকতা নাই, উচ্চ নীচ বিচার নাই, ছোট বড় ভেদ নাই, সকলেই সমান, সকলেরই অধিকার। প্রেমে হুড়াহুড়ি করিয়া যে যেমন পার লুটিয়া লও। নিমাই প্রচার করিলেন, "প্রেমের লুট পড়েছে নদীয়ায়, তোরা কে নিবি ভাই, ছুটে আয়।"

মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেশে দিনে দিনে মুসলমান-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও নবদ্বীপে তাহাদের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় নগণ্য ছিল। কিন্তু রাজার জাতি, কাজেই প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল খুব। মুসলমান নবাবের নিয়োজিত কাজী সাহেব তখন প্রধান বিচারক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাহার ভয়ে সকলকেই সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। নিমাইয়ের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপে হিন্দু মুসলমানকে খুব প্রীতির সহিতই একত্রে বাস করিতে দেখা যায়। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক কলহ তখন ছিল না বলিলেই চলে; বরং পরস্পর পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন। মুসলমানেরা ত অনেকেই হিন্দুর বংশধর এবং তখন পর্যন্ত সকলেরই পূর্বপুরুষ জ্ঞাতিকুটুম্বের নাম-পরিচয়ও স্মরণ ছিল। এজন্য পূর্ব-সম্পর্ক অনুসারেই পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা ও 'নানা' 'চাচা' 'মামু' ইত্যাদি ব্যবহার ও সম্বোধন এবং স্নেহ-ভালবাসার আদানপ্রদান চলিত। সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে পরস্পর পরস্পরের সাথী হইতেন। এমনকি শ্রাদ্ধ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, উৎসবে-পর্বে যতদূর সম্ভব যোগ দিয়া, একে অন্যের সহায়তা ও আনন্দ বর্ধন করিতেন। এইভাবে সমস্ত দেশেই হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে আপনার ধর্মে নিষ্ঠা রাখিয়াও খুব প্রীতি-সদ্ভাব বর্তমান ছিল।

কিন্তু নিমাইয়ের দলবৃদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে, পাষণ্ডী শত্রুদল ঈর্ষায় জ্বলিয়া এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে দল বাঁধিয়া কাজীর নিকট গিয়া নালিশ করিল, "নিমাই পণ্ডিতের অত্যাচারে, আমাদের নবদ্বীপে থাকা দায় হইয়াছে।" কয়েকজন মুসলমানকেও তাহারা আপনাদের দলে ভিড়াইয়াছিল,

সেই সকল মুসলমানেরাও গিয়া কাজী সাহেবকে জানাইল, "নিমাই পণ্ডিতের জ্বালায় নবদ্বীপে থাকা কষ্টকর, তাঁহার কীর্তনের চিৎকারে রাত্রে ঘুম হয় না, নমাজ পড়িতে পারা যায় না।" সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া কাজী সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নবদ্বীপের সন্নিকটেই তাঁহার বাড়ী। একদিন তিনি স্বয়ং নবদ্বীপে গিয়া খোঁজখবর লইলেন, সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হুকুম দিলেন, "আজ হইতে আর কেহ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে পারিবে না।"

"এতদিনে প্রকট হৈল হিন্দুয়ানী।
এবে উদ্যম চালাও কার বল জানি॥[১]
কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি মুই ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥"

কাজীর হুকুম শুনিয়া ভক্তগণের ভীষণ ভয় উপস্থিত হইল। শত্রুরা খুব খুশী হইয়া ভাবিল, এতদিন পরে নিমাইকে খুব জব্দ করিয়াছি। সাধারণ লোক ভাবিতে লাগিল, "কি জানি এইবার নবদ্বীপে কি কাণ্ড ঘটিবে।" নিমাই বিন্দুমাত্রও ভয় পাইলেন না, বরং উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাল করিয়া আজ নগর কীর্তনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।" ভক্তগণকে খুব উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,—

"সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥"

সেদিন অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া মহাসংকীর্তনের বিরাট ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যা হইতেই শত শত ঘৃতের মশাল জ্বলিয়া উঠিল, একসঙ্গে বহু খোল করতাল, শিঙ্গা বাজিতে লাগিল। অসংখ্য ভক্ত-পরিবৃত নিমাই কীর্তন করিতে করিতে রাজপথে বাহির হইয়া অগ্রসর হইলেন। কীর্তন ভাল করিয়া জমাইবার জন্য তিন দলে বিভক্ত করা হইল। প্রথম দলে প্রধান গায়ক হইলেন হরিদাস, দ্বিতীয় দলে অদ্বৈতাচার্য এবং সকলের পশ্চাতে তৃতীয় দলে নিত্যানন্দ, সঙ্গে নিজে নিমাই সেই বিরাট দলের সহিত নগর কীর্তন করিয়া চলিলেন। মহাসংকীর্তন-ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রেমানন্দে মত্ত ভক্তগণ নাচিয়া গাহিয়া ভাবে বিভোর হইয়া চলিতেছেন। দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চারি-

---

১ পাঠান্তর—"এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কেন বল জানি॥"

দিক হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিতেছে, আবার সেই অপূর্ব ভাবে আত্মহারা হইয়া তাহারাও কীর্তনে যোগ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। ক্রমে উহা এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হইল। নিমাই অতিশয় দক্ষতার সহিত সুপরিচালনা করিয়া সেই বিরাট কীর্তনের দল সহ ধীরে ধীরে কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারে শত শত মশালের আলো, খোল করতাল শিঙ্গার শব্দ সহ সংকীর্তনের রোল, আর অসংখ্য জনতার মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে কাজীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমে সেই ধ্বনি নিকটবর্তী হওয়াতে কাজী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং কীর্তনের দল বাড়ীর নিকট আসিলে, ভীত হইয়া অন্দরমহলে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। কাজীর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া নিমাই কীর্তন সমাপ্ত করিলেন। পরে দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া জনৈক সম্ভ্রান্ত লোককে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া কাজীর সঙ্গে দেখা করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। লোকমুখে নিমাই পণ্ডিতের সদ্অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া কাজী সাহেবের উদ্বেগ দূর হইল। বাহিরে আসিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কাজী সাহেব নিমাই পণ্ডিতকে অভ্যর্থনা করিলেন; নিমাইও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

"প্রভু বলেন, আমি তোমার হইলাম অভ্যাগত
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম কেমত?
কাজী কহেন তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করিবারে রহিনু লুকাইয়া ॥
এবে তুমি শান্ত হৈলা আমি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥"

কাজী সাহেব নিমাইকে 'ভাগিনা' সম্বোধন করিয়া কুটুম্বিতা পাতাইলেন। নিমাইও তাঁহাকে 'মামা' ডাকিয়া আপনার জন করিয়া লইলেন। মামা-ভাগিনেয় দু'জনে খুব প্রীতির সহিত পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিমাই কাজী সাহেবকে বুঝাইলেন, "ভগবানকে ভক্তি করা, তাঁহাকে

চিন্তা ও তাঁহার নাম জপ করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। কীর্তনে তাঁহার নাম জপ হয়, চিন্তা হয়, ভক্তিভাব বৃদ্ধি পায়, মানুষ পরমানন্দ লাভ করে, জীবের ত্রিতাপজ্বালার শান্তি হয়।" নিমাইয়ের বিনয়নম্র ব্যবহার, সুমধুর বাক্য, গভীর তত্ত্বোপদেশে কাজীর অন্তর গলিয়া গেল। সেই দিন হইতে তিনিও নিমাইয়ের পরমানুরাগী বলিয়া পরিচিত হইলেন। কীর্তনের আর কোন বাধা রহিল না, অধিকন্তু শুভানুধ্যায়ী মহানুভব কাজী সাহেবের চেষ্টায় নিমাই ও ভক্তগণের সন্তোষের জন্য নবদ্বীপে গো-হত্যা বন্ধ হইল। কাজী সাহেবের দৃষ্টান্তে বহু মুসলমান নিমাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রে ও ধর্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া পরম শান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকটে এখনও কাজী সাহেবের সমাধিস্থান বর্তমান। বহু লোক উহা ভক্তিভাবে দর্শন ও 'সেলাম' করে।

এই ঘটনায় নিমাইয়ের প্রভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-কাপালিক নানা সম্প্রদায়ের বহু লোক ধর্ম লাভ করিবার জন্য ও তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিত। তিনিও সকলকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং সুমধুর বাক্যে তাহাদের তপ্ত হৃদয় শীতল করিতেন। নিমাই সকলকেই 'ভগবানের শরণাগত হইয়া সরল প্রাণে ভক্তিভাবে তাঁহাকে ডাকা ও তাঁহার নাম কীর্তন করা' ভগবানলাভের এই সহজ সরল নূতন পন্থা দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার উপদেশে বহু লোকের জীবন পরিবর্তিত হইল।

আমরা পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মহীনতার কথা বলিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে, সেই সময়ে তাহাদের কোন ধর্মই ছিল না। বাংলাদেশে মুসলমানসংখ্যা বৃদ্ধির ইহা এক প্রধান কারণ। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের ফলস্বরূপ বহু লোক ধর্ম-শাস্ত্র-আচার বিহীন হইয়া অতিশয় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ ইহাদিগকে সমাজে স্থান দিতেন না। তাহা ছাড়া, দেশের প্রান্তভাগে এমন বহুসংখ্যক প্রাচীন অধিবাসী ছিল, যাহারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া হিন্দুসভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। রক্ষণশীল হিন্দুগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্য ইহাদের সহিত মিশিতেন না, ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতেন। কোন প্রকার ধর্ম-উপাসনা ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না, কাজেই উহাদের মধ্যে অনেকে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের, কতক লোক তান্ত্রিক কাপালিকদিগের, আবার কেহ কেহ হিন্দুগণের ধর্ম-উপাসনার অনুকরণ করিয়া চলিত বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্মভাবের অভাবে শান্তি পাইত না। নিমাইয়ের প্রেমের আহ্বানে ইহারা দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল।

তিনি সর্বস্তরের লোককে লইয়া হরিনাম সংকীর্তন করিতেন, তাহাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, সদ্‌ভাবে সদাচারে জীবন যাপন করার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন। প্রেমের বলে নিমাই লোকের চিত্ত জয় করিলেন, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, আচার-ব্যবহার সমস্তই পরিবর্তিত হইল। তাঁহার কৃপাতে ইহারা মালা তিলক শিখাদি আর্যচিহ্ন ধারণ, নাম-মহামন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিব-রাত্রি, রামনবমী প্রভৃতি ব্রত পালন এবং বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়ার যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া, উপবীতহীন দ্বিজেতর শূদ্র জাতিরূপে বিরাট হিন্দু সমাজে মিশিয়া গেল। ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকে এখন আবার উপবীতধারী দ্বিজরূপেও হিন্দুসমাজের শীর্ষে অবস্থিত।

মুসলমান ধর্মের সাম্য ও মৈত্রীভাব লোকের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল; উপাসনাকালে উচ্চনীচ ভুলিয়া তাহারা সকলেই একত্রে দাঁড়াইত। কিন্তু নিমাইয়ের প্রেমভাব লোকের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট করিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্মে ভগবদ্‌ভজনে হরিনাম-সংকীর্তনে, উচ্চনীচ সকলে শুধু যে একত্রে দণ্ডায়মান হইল তাহা নহে; আপন-পর ভেদ বিস্মৃত হইয়া, একত্রে নৃত্যগীত কোলাকুলি করিয়া, পদমর্যাদা ভুলিয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিল, আবার পরস্পরের প্রতি সম্মান করিয়া পদরজঃ গায়ে মাখিল। নিমাই ভগবানের উপাসনাতে, তাঁহার নামে, ভক্তিমুক্তিলাভে সকলেরই সমান অধিকার ঘোষণা করায় ইস্‌লামের বাহ্যিক সাম্যভাবের প্রতি লোকের আকর্ষণ দূর হইয়া গেল। তিনি প্রচার করিলেন, "ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডাল, ভগবদ্‌বিমুখ ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।" তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—

"মুচি যদি ভক্তি করি ডাকে কৃষ্ণ কবে।
কোটি নমস্কার করি তাঁহার চরণে ॥"

দেশে, সমাজে ক্রমশঃ এই ভাব প্রবল হইতে লাগিল। সিংহবিক্রমে সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া ঐশী শক্তিতে শক্তিমান নিমাই আপনার ভাবে সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈরাগ্য-সন্ন্যাস—নীলাচল গমন

দেশ জুড়িয়া হরিনামের ঢেউ উঠিয়াছে, চারিদিকে হরিনাম-সংকীর্তন। লোকের মুখে হরিনাম শুনিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। নিমাইয়ের আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তিনি দেখেন লোকে মুখে ভগবানের নাম করে বটে, কিন্তু চিত্তে ভগবানের প্রতি অনুরাগ নাই। অধিকাংশ লোকের অন্তরেই বিষয়ভোগেচ্ছা, কাম-কাঞ্চনে আসক্তি পূর্ববৎ বর্তমান। কীর্তনে অশ্রু ঝরে, প্রেমে দেহ গড়াগড়ি যায়, ভাব হয় সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই বিষয়তৃষ্ণা, কাম-কাঞ্চনের টান!

লোকের অন্তর হইতে প্রবল বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য নিমাই বিবেক-বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। মনে হইল, "মানুষ কাহাকে দেখিয়া শিখিবে? বিশিষ্ট ভক্তগণকে? তাঁহাদের অন্তরে কাম-কাঞ্চনাসক্তির লেশমাত্রও নাই সত্য, কিন্তু বাহিরে তাঁহারাও ত স্ত্রীপুত্র ধনজন লইয়া সংসারী সাজিয়া রহিয়াছেন।" নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া মনে হইল, "আমি নিজেও ত এই বিষয়ের দ্বারাই পরিবৃত। আমার রূপ যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি স্ত্রী, অগণিত ভক্তের সেবা-পূজা, মান-যশ দেখিয়া লোকের মনে কি ভাবের উদয় হয়? তাহারা নিশ্চয়ই মনে করে, 'ভগবানকে ডাকার, হরিনাম সংকীর্তনের ইহাই ফল'!"

এদিকে শত্রুরাও বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "নিমাই পণ্ডিত খুব চালাক লোক! আহাম্মকগুলিকে ঠকাইয়া দিব্য আছে! ঘরে যুবতী স্ত্রী, টাকাকড়িরও অভাব নাই; বেশ খায়দায় আর মজা লুটে।" ক্রমে এই সকল কথা কানে আসায় নিমাইয়ের চিন্তা বাড়িতে লাগিল। নিমাই সংসারে থাকিলেও অসংসারী। তাঁহার মনপ্রাণ ভগবদ্ভাবে বিভোর। বিষয়েন্দ্রিয়জনিত যে ক্ষণিক সুখ-ভোগের আশায় লোক লালায়িত, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে অতি হেয় এবং সর্ব অনর্থের মূল। তাঁহার অন্তর সর্বতোভাবে সেই সেই মোহপাশ হইতে বিমুক্ত থাকিলেও সংসারী লোকের চক্ষে তিনি তাঁহাদেরই একজন, তিনিও বিষয়ী। বিষয়ের সঙ্গে এই বাহ্যিক সম্পর্কও ষোল আনা ছেদন করিবার জন্য নিমাইয়ের চিত্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। নিমাই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার ভক্তসঙ্গে আনন্দ নৃত্যগীত কীর্তন কমিয়া গেল দেখিয়া শচীর চিত্তে অসীম উদ্বেগের সঞ্চার হইল। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ কাঁদিলেও তিনি প্রাণপণ যত্নে

স্বামীকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টায় তাহা গোপন করিতে চাহিলেন। ভক্তগণও অতীব দুঃখিত হইলেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া নিমাই স্থির করিলেন, এই সংসারাশ্রম—কাম-কাঞ্চনের সম্পর্ক ষোল আনা ত্যাগ করিবেন। স্নেহময়ী মাতা, পতিব্রতা পত্নী এবং অনুগত ভক্তগণকে ছাড়িয়া সর্বতোভাবে ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় লইবেন,—সন্ন্যাসী হইবেন; মস্তক মুণ্ডন করিয়া ও কৌপীন ধারণ করিয়া, কাঙ্গালবেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইবেন। ভগবানের জন্য নিজে সর্বস্ব ত্যাগ না করিয়া, লোককে ত্যাগের উপদেশ দেওয়া বৃথা। অবশ্য মাতা, পত্নী ও ভক্তগণকে ছাড়িবার কথা মনে করিয়া, তাঁহাদের দুঃখের কথা ভাবিয়া, চিত্ত অবসন্ন হইল। তাঁহাদের কোমল অন্তরে এই তীব্র আঘাত কি ভীষণ! নিমাই শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার যখন ধর্মের গ্লানি, সমাজের দুরবস্থা, লোকের দুঃখদুর্দশার চিত্র মনে পড়িল, তখন গৃহত্যাগের জন্য অধিকতর ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, গৃহ সংসার ত্যাগ ব্যতীত জীব-উদ্ধারের, লোকশিক্ষার আর কোন উপায় নাই। কাজেই মাতা, পত্নী ও ভক্তগণের দুঃখকষ্ট তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য, আত্মীয়স্বজন ও ভোগসুখের আশা চিরতরে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসজীবনের দুঃখকষ্ট কঠোরতা বরণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

"দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া।
বলে, জীবে শিক্ষা দিব সন্ন্যাস করিয়া ॥
দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সর্বগ্রাম।
সর্বজীবে উদ্ধারিব দিয়া হরিনাম ॥"

নবদ্বীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী কাটোয়া নগরে কেশব ভারতী নামক একজন তত্ত্বজ্ঞানী প্রাচীন সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। এই সময়ে একদিন তিনি নবদ্বীপে আসিয়া ভিক্ষার জন্য মিশ্রভবনে উপস্থিত হইলে নিমাই অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রদ্ধা ও যত্নে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা সুনির্বাহ হইল। পরে আহারান্তে বিশ্রামকালে কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসের অধিকার ও গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে নিমাই জানিতে চাহিলেন। কেশব ভারতী তাঁহাকে এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন,—বৃদ্ধা জননীর তিনি একমাত্র পুত্র, পতিব্রতা সহধর্মিণীও সন্তানের মুখদর্শন করেন নাই। সংসারে তিনিই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা আবশ্যক এবং তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন সন্ন্যাস অবৈধ।

সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণে মাতা-পত্নীর অনুমতি অত্যাবশ্যক শুনিয়াও নিমাই স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায় অন্তরের তীব্র বৈরাগ্য দিনে দিনে অধিকতর প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরে একদিন সুযোগ বুঝিয়া তিনি জননীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শুনিবামাত্র শচীর অন্তরে শেল বিদ্ধ হইল। মাথায় করাঘাত করিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের দুঃখ দেখিয়া অন্তরে খুব কষ্ট হইলেও তিনি স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া ও বিশেষভাবে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, নিমাই প্রথমে মায়ের মন ঠাণ্ডা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে সংসারের অনিত্যতা, মনুষ্যজীবনের কর্তব্য, ভগবদ্ভজনে পরমানন্দ লাভ প্রভৃতি উচ্চ প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাতে উভয়ের মন সংসারের ঊর্ধ্বে ভগবদনুভূতির রাজ্যে আকৃষ্ট হইল।[১] জননীর চিত্তের অবস্থা অনুকূল করিয়া, নিমাই ধীরে ধীরে জাগতিক দুঃখের পারে অনন্ত শান্তি লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। পুত্রের মঙ্গল আশায় ও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য শচীমাতার চিত্তও উদ্গ্রীব হইল। বিশেষতঃ সংসার-বন্ধনে থাকিয়া নিমাইয়ের জীবনধারণ অতীব কষ্টকর বুঝিয়া, জননীর প্রাণে আতঙ্ক জন্মিল, পাছে নিমাইয়ের কি জানি কি হয়! শচী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজ সুখদুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া নিমাইকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন। ইহাতে নিমাইয়ের মন অতিশয় প্রসন্ন হইল, হৃষ্টচিত্তে মায়ের চরণে বারংবার প্রণাম করিয়া তাঁহার শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন।[২]

---

১ "কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ। মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি। শ্রীকৃষ্ণ চরণ বই অন্য নাহি গতি॥
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন। সেই হর্তা সেই কর্তা সেই মাত্র ধন॥
তা বিনু সকলি মিছা কহিনু এ তত্ত্ব। তা বিনু সকল মিথ্যা সকল জগত॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চরণে হৈলে কত হৈত লাভ॥
সংসারে আরতি কার মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে॥"

—চৈতন্যমঙ্গল।

২ "ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেম। আজ্ঞা দেহ বেদনী মা চিত্তে দেহ ক্ষেম॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ। খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম॥
ধন উপার্জন করে আনে বড় দুঃখ। ধনই যাউক কিম্বা আপনি মরুক॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন। সর্কল সম্পদ সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥"

—চৈতন্যমঙ্গল

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কৈশোর অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন, বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। তিনি তখন পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, লোকের মুখে পতির সন্ন্যাসের অভিপ্রায় শুনিবামাত্র কালাপেক্ষা না করিয়া নিজেই শ্বশুর-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রে আহারান্তে নিমাই যখন শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন চোখের জলে তাঁহার চরণযুগল ভিজাইয়া স্বীয় মনোব্যথা নিবেদন করিলেন। পতিপ্রাণার অন্তরের কষ্ট বুঝিতে পারিয়া চিত্ত দ্রব হইলেও নিমাই আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। কোমল প্রেমবাক্যে প্রথমে তাঁহাকে শান্ত করিলেন, পরে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন।[১] পতির মুখে উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ব—জীব-জগতের স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা, বিষয়ভোগের কষ্টকর পরিণাম, ভগবানের আরাধনায় পরমানন্দ, প্রীতি ও মনুষ্যজীবনের সার্থকতার কথা শুনিতে শুনিতে শচীদেবীর ন্যায় তাঁহার অন্তরে বিবেক-বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পতির ধর্মপথের সহায় হওয়াই সহধর্মিণীর কর্তব্য ভাবিয়া সংসারের ক্ষণিক সুখভোগের আশা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। নিজের সুখ-ভোগের আশায় পতির ইষ্টলাভের পথে অন্তরায় হইতে লজ্জিতা হইলেও, বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা চিন্তা করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল এবং তিনি বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত গৃহে থাকিবার জন্য স্বামীকে প্রার্থনা জানাইলেন। নিমাই হাসিমুখে মায়ের নিকট অনুমতি লাভের কথা প্রকাশ করিলে দেবীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যেমন মাতা তেমন পুত্র! অনিত্য সংসারে উভয়েরই অনাসক্তির কথা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া আর বাধা দিতে ইচ্ছা করিলেন না সত্য, কিন্তু, নিজেও গৃহত্যাগ করিয়া সীতার ন্যায় পতির অনুগমন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, নিমাই তাঁহাকে সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম, স্ত্রীমুখদর্শন ও স্ত্রী-সম্পর্ক সর্বতোভাবে পরিবর্জনের বিধি জানাইলেন, এবং তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার উপর রঘুনাথের সেবা-পূজা, বৃদ্ধা জননীর সেবাশুশ্রূষা, অতিথি-অভ্যাগতদের

---

১ "জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, মিছা করি করহ গেয়ান।
মিছা পতি সুতনারী, পিতামাতা যত বলি, পরিণামে কে হয় কাহার॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি, যত দেখ সব মায়া তার।
কি নারী পুরুষ দেখ, সভারি সে আত্মা এক, মিছা মায়া বন্ধে হয় দুই॥
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি, এই কথা না বুঝয়ে কোই।
রক্ত-রেত সম্মিলনে, জন্ম মূত্র-বিষ্ঠা স্থানে, ভূমে পড়ে হঞা আগেয়ান॥
বালবৃদ্ধ যুবা হঞা, নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া, দেহে গেহে করে অভিমান।
বন্ধু কন্দে যারে পালি, তারা সব দেয় গালি, অভিমানে বৃদ্ধকাল বঞ্চে।
শ্রবণ নয়ন অন্ধে, বিষাদ ভাবিয়া কান্দে, তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥"
— চৈতন্যমঙ্গল

সেবা ও গৃহস্থাশ্রমের রক্ষার ভার দিয়া, সহধর্মিণীর কর্তব্যপালনের জন্য উৎসাহিত করিলেন। সতীর নিকট স্বামীর আদেশ বেদবাক্য: পতিব্রতা চিরকালের জন্য পতিকে প্রেমে ঋণী করিয়া, তাঁহার প্রদত্ত গুরুভার মস্তকে লইলেন। পত্নীরও অনুমতি পাইয়া নিমাইয়ের মন খুব প্রফুল্ল হইল। অতঃপর যে-কয়দিন তিনি গৃহে ছিলেন পত্নীকে তাঁহার অধ্যাত্মসম্পদের ভাগী করিবার জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।[১]

তাঁহার গৃহত্যাগের সংকল্প ভক্তগণের কাছে অবিদিত রহিল না। তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া গৃহত্যাগ না করিবার জন্য কাতরভাবে বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু ভক্তগণের দুঃখে নিমাই দুঃখিত হইলেও, স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, বরং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। ফলতঃ নিমাইয়ের সংকল্প অটুট রহিল।

সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াও শচীদেবী পুত্রকে আরও কিছুদিন গৃহে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। মায়ের আদেশ অনুযায়ী নিমাই আরও কিছুকাল গৃহে থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। ইতোমধ্যে পূর্বের ন্যায় ভক্তগণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এবং ভগবৎপ্রসঙ্গে ও ভজন-কীর্তনে আনন্দ করিয়া সকলের চিত্ত প্রসন্ন করিতে থাকিলেন। মাতা-পত্নীর অনুমতি পাইয়া নিমাইয়ের চিত্তের উদ্বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল। তাই গৃহত্যাগের জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা বাড়িলেও বাহিরে দেখা যাইত তিনি পূর্বের ন্যায় সদানন্দ সুরসিক, ভক্তগণের চিত্তবিমোহনকারী।

স্নেহময়ী জননী ও পতিব্রতা পত্নী তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেও, নিমাই বুঝিতে পারিলেন, চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। বিদায়কালে তাঁহাদের অন্তরে যে কি নিদারুণ আঘাত লাগিবে এবং শোকের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়া বিষম উদ্বেগ জন্মিল। মনে হইল সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিলে নিজের চিত্তে দুর্বলতা আসিবে না ত? তাহার উপর অনুরাগী ভক্তগণ আছেন, তাঁহাদের ভক্তি-স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করাও সহজ নহে। নিমাই স্থির করিলেন, গোপনে, সকলের অগোচরেই গৃহত্যাগ করিবেন। আর চিরকাল এইরূপেই ত লোকে সন্ন্যাসী হয়! আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাতে বলিয়া-কহিয়া কে বাড়ী-ঘর ছাড়িতে পারে? নিমাইয়ের বয়স এখন চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। শীতকাল, মাঘমাস গতপ্রায়, নিমাই শুভদিন দেখিয়া আপনার সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন।

---

১ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই নিমাই স্বীয় পত্নীকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

আগামী কল্য সংক্রান্তি, সূর্য মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে গমন করিতেছেন,—অতি শুভদিন। নিমাই গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া চুপিচুপি ঘরের বাহিরে আসিলেন। নিদ্রিতা জননীর উদ্দেশ্যে বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও তাঁহার শয়নগৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া মনে মনে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইলেন। মিশ্রপরিবারের গৃহদেবতা প্রভু 'রঘুনাথ', পরিবারের সকলেই তাঁহার আশ্রিত সেবক। 'রঘুনাথের মন্দিরে দরজার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহার কাছে সন্ন্যাসের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।[১] অতঃপর বৃদ্ধা জননী ও যুবতী পত্নীর রক্ষার ভার তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া এবং স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া সাশ্রুনয়নে করজোড়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তিভাবাবেশে নিমাইয়ের চিত্ত বিহ্বল হইলেও কষ্টে আত্মসংবরণ পূর্বক পুনর্বার 'রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া অতি সন্তর্পণে বাড়ীর বাহিরে আসিলেন এবং দ্বারদেশে জননী-জন্মভূমির উদ্দেশ্যে প্রণামানন্তর রাস্তায় বাহির হইয়া অতি ত্বরিত গতিতে দৌড়িয়া চলিলেন। তাঁহার পরিধানে মাত্র একখানি বস্ত্র, দ্বিতীয় সম্বল সঙ্গে নাই, আর মুখে শ্রীভগবানের মধুর নাম। শীতের রাত্রি হইলেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি সাঁতরাইয়া গঙ্গা পার হইলেন এবং আর্দ্রবস্ত্রে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভোরবেলা কাটোয়ায় শ্রীমৎ স্বামী কেশব ভারতীজী মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতকালে আর্দ্রবস্ত্রে দণ্ডায়মান নিমাইকে দেখিয়া ভারতী মহারাজের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নিমাই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর করজোড়ে সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানাইলেন। মোহনির্মুক্ত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর হৃদয়ও আজ নিমাইকে দেখিয়া নরম হইয়া গেল। তিনি তাঁহার পরিবারের অবস্থা চিন্তা করিয়া সন্ন্যাস প্রদানে অসম্মত হইলেন। ভারতী নিমাইকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিমাইয়ের চিত্ত টলিল না। তিনি আপন সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিয়া বারবার কাতরভাবে ভারতীর চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "স্বামিন্! কৃপা করিয়া আমার সংসার-পাশ কাটিয়া দিন, আমাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন।" ভারতী বলিলেন, "নিমাই, বৃদ্ধা জননীর একমাত্র সন্তান তুমি, ঘরে বালিকা স্ত্রী, এখনও

১ "বাহিরে আসিয়া প্রভু দাঁড়ায়ে অঙ্গনে। যথাবিধি রাত্রিবাস করিয়া বর্জনে ॥
তবে করবাদ্য* করি বিষ্ণু ভগবানে। করিলেন পরণাম অষ্টাঙ্গ বিধানে ॥
বিষ্ণুরে প্রণাম করি শচীর কুমার। বাহির হলেন খুলি বাহিরের দ্বার ॥
অন্তর্দ্বার উদ্ঘাটন অনাদি রূপেতে। প্রভুর আছয়ে কহে বেদপুরাণেতে ॥
বাহিরে আসিয়া জন্মভূমিরে মাথায়। পরণাম করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥"
—বংশী-শিক্ষা

* বিগ্রহ শয়নে থাকিলে হাততালি দিয়া প্রণাম করা বিধি।

সে পুত্রমুখ দর্শন করে নাই। তোমার বয়সও অল্প, মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ; গৃহে ফিরিয়া যাও, গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য পালন কর। পুত্র জন্মিলে তাহাকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিও। পরে বয়স হইলে, তাহার উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইও।" নিমাই বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভো! আর এক মুহূর্তও সংসারের সম্পর্ক আমার সহ্য হইতেছে না। মৃত্যুর ত কালাকাল অপেক্ষা নাই। শাস্ত্রের উপদেশ আছে যখনই অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে।" নিমাইয়ের সংকল্পের দৃঢ়তা ও সন্ন্যাসের জন্য চিত্তের ব্যাকুলতার পরিচয় পাইয়া আশ্রমস্থ সকলে অবাক হইলেন এবং কেশব ভারতীরও মন প্রফুল্ল হইল। ভারতী মহারাজ আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া নিমাইকে সন্ন্যাসের অনুমতি প্রদানপূর্বক প্রাথমিক কৃত্য, মুণ্ডন ও আত্মশ্রাদ্ধাদি কার্য সুসম্পন্ন করিতে আদেশ দিলেন। হৃষ্টচিত্তে নিমাই তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিয়া অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হইলেন।

ভারতীর আশ্রমের নিকটেই মধু নাপিতের বাড়ী। এই আশ্রমে যে কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, মধুই তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করে। অনেকের মাথা সে মুড়াইয়াছে এবং এই কর্মে তাহার হৃদয়ও খুব কঠিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ প্রভাতকালে নিমাই যখন মাথা মুড়াইবার জন্য আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া মধুর কঠিন হৃদয় আবার কোমল হইয়া গেল; মধু নিমাইকে অনুনয় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আমায় ক্ষমা কর। এই কচি বয়স তোমার, আর এমন সুন্দর রূপ! তোমার মাথা মুড়াইয়া আমি তোমাকে পথের ভিখারী করিতে পারিব না। তোমার পায়ে পড়ি, ঘরে ফিরিয়া যাও।" নিমাই কিন্তু ফিরিলেন না। মধুরস্বরে মধুকে বলিলেন, 'ভাই, আমার প্রতি নির্দয় হইও না, আমি অতি দীনহীন, আমাকে দয়া কর। তুমি দয়া করিয়া আমাকে ভগবানের পথের পথিক করিয়া দাও।"

ত্যাগ-বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য, সংসারের অনিত্যতা, বিষয়ভোগের দুঃখময় পরিণাম, মনুষ্যজীবনের কর্তব্য, ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণই পরমানন্দ লাভের একমাত্র পথ, সন্ন্যাস গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কথা বুঝাইয়া নিমাই মধুকে মোহিত করিলেন এবং ব্যাকুল হইয়া তাহাকে মস্তক মুণ্ডনের জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। অগত্যা মধু সম্মত হইল এবং চোখের জল মুছিয়া তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। নিমাই প্রফুল্লচিত্তে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং ভারতীর সম্মুখে আসিয়া প্রণত হইলেন। মুণ্ডিত মস্তকে তাঁহার অপূর্ব রূপের শোভা দেখিয়া ভারতীর চিত্ত অতীব প্রসন্ন হইল। নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডনান্তে, মধু চোখের জল মুছিয়া ক্ষুর গঙ্গায় বিসর্জন দিল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এমন কর্ম সে আর করিবে না।

মাঘ মাসের শেষ—আজ মকর শেষ সংক্রান্তি,[১] গংগাস্নানের যোগ। সকাল-বেলা বহু নরনারী গংগায় স্নান-দানাদি করিতে আসিয়াছেন। ঘাটের নিকটেই ভারতীর আশ্রম। 'নদের নিমাই'কে সকলেই চিনে, তাঁহার সুমধুর কীর্তন, নৃত্য-ভাবাবেশ কে না দেখিয়াছে? আশ্রমে স্বামিজী-মহারাজের সম্মুখে মুণ্ডিত মস্তকে নিমাইকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অনুসন্ধান করিয়া যখন সমস্ত ব্যাপার অবগত হইল, তখন লোকের দুঃখের সীমা রহিল না। বয়স্কা প্রাচীনা গৃহিণীরা চোখের জলে ভাসিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভারতী মহারাজের কাছে বসিয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এমন কর্ম করিবেন না, আপনার পায়ে পড়ি মহারাজ! ইহাকে সন্ন্যাসী করিবেন না। বৃদ্ধা জননীর এ একমাত্র পুত্র, ঘরে যুবতী স্ত্রী, এখনও তাহার কোন সন্তান হয় নাই। তাঁহাদের সংসারে আর কেহ নাই, এ-ই একমাত্র ভরসা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার মায়া-মমতা নাই, ইহাকে না দেখিলে তাহারা প্রাণে বাঁচিবে না।" নিমাইকেও তাঁহারা অনুনয়-বিনয় করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "বাবা ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমায় না দেখিয়া তোমার মা এতক্ষণে হয়ত মারা গিয়াছেন! আর তোমার স্ত্রী ছেলেমানুষ, সেও পাগল হইয়া থাকিবে। আমাদের কথা রাখ বাবা, সন্ন্যাসী হইও না, ঘরে ফিরিয়া যাও।" অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কারা বিষণ্ণ হৃদয়ে একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিমাইয়ের দিকে তাকাইয়া তাঁহার স্ত্রীর ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

পুরুষদিগের মধ্যেও বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আশ্রমে একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা করজোড়ে স্বামিজীকে অনুনয় করিলেন, নিমাইকে যেন সন্ন্যাস না দেন। নিমাইকেও তাঁহারা বুঝাইয়া শুনাইয়া বাড়ী ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুবকেরা একত্র হইয়া যুক্তি করিল—নিমাইকে কিছুতেই সন্ন্যাসী হইতে দিবে না, জোর করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস বন্ধ করিবে।[২]

স্থির ধীর প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মবিদ্ ভারতী নির্বাক, চিত্রার্পিতের ন্যায় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান নিমাই করজোড়ে সমাগত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি বড় দুর্ভাগা। ভগবানের কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত। আপনারা নির্দয় হইয়া তাঁহার চরণ-আশ্রয়ে বাধা জন্মাইবেন না; আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা। সংসারে থাকিয়া আমার প্রাণধারণ অসম্ভব। যাহাতে এই দুঃখপূর্ণ, অনিত্য সংসারের মোহ-পাশ ছেদন করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারি আপনারা তাহার সহায় হউন। ইহাই আপনাদের নিকট

---

১ "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥"

২ মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিতে কাটোয়াবাসীর বিলাপের কথা আছে।

প্রার্থনা করি। আমার স্নেহময়ী জননী ও ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণী আমায় গৃহ-পিঞ্জর হইতে মুক্তি দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি পাইয়াছি; এখন আপনারা সকলে সহায় হইলেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" নিমাই গম্ভীর-ভাবে দৃঢ়স্বরে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বাক্যে সকলের চিত্ত জয় করিলেন। তাঁহার যুক্তি-যুক্ত শাস্ত্রসম্মত কথায় কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না, বরং বিবেকের উদয় হওয়ায় সকলেরই চিত্তে সাময়িক বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা ও সন্ন্যাসের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলের অন্তরে শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তাঁহার মাতা ও পত্নীর অনুমতির কথা শুনিয়া আর কেহ সন্ন্যাসে বাধা দিতে ইচ্ছা করিল না। নিমাইয়ের মাতা ও পত্নীর কঠোর হৃদয়ের আলোচনা করিতে করিতে স্ত্রীলোকেরা ঘরে চলিলেন এবং নিমাইয়ের অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিতে বলিতে পুরুষেরাও বিদায় লইলেন। নিমাই নিশ্চিন্ত হইয়া ভারতী মহারাজের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ ও আপনার কর্তব্যকর্মের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নবদ্বীপ হইতে তাঁহার মাতৃষ্বসাপতি (মেসো) চন্দ্রশেখর আচার্য, প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিমাই ঘর হইতে বাহির হইবার পরে, রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিষ্ণু-প্রিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনসর্বস্ব বিছানায় নাই। প্রাণ ধড়ফড় করিতে লাগিল, খুঁজিয়া দেখিলেন, কোন সন্ধান পাইলেন না। চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া শচীকে উঠাইলেন;[১] কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ী ও বধূ চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। জননী আর্তস্বরে 'নিমাই নিমাই' বলিয়া ডাকিলেন কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, দিগন্ত শুধু প্রতিধ্বনি তুলিল 'নাই নাই'।[২] তাঁহাদের আর্তনাদে পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, ভক্তগণ ছুটিয়া আসিলেন, বহু লোক একত্র হইল। তন্ন তন্ন করিয়া সকলেই খোঁজখবর লইতে আরম্ভ

---

১ "এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া শিরে মারে করাঘাত ॥
এ মোর প্রভুর, সোনার নূপুর, গলার সোনার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব কুরিয়া জিতে না পারিব আর ॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া ॥"

—লোচন দাসের পদ

২ "ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি, কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ মনে পড়ি বাহিরাঙ্গনে ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥"

—লোচন দাসের পদ

করিল, চারিদিকে লোক ছুটিল। অনেকক্ষণ পরে জানা গেল, তাঁহাকে নিঃসম্বলে একাকী কাটোয়ার রাস্তায় যাইতে দেখা গিয়াছে। শুনিয়া সকলেরই ধারণা হইল, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কেশব ভারতীর নিকট গিয়াছেন। তখন সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া নিমাইয়ের পিতৃস্থানীয় অভিভাবক 'মেসোমহাশয়' চন্দ্রশেখর আচার্য, অগ্রজতুল্য নিত্যানন্দ ও প্রিয় ভক্ত মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজনকে কাটোয়ায় পাঠাইলেন- তাঁহারা বুঝাইয়া শুনাইয়া নিমাইকে বাড়ী ফিরাইতে পারিবেন, এই ভরসা। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে থাকিয়া আত্মীয়স্বজনেরা, শ্রীবাসাচার্য ও তাঁহার স্ত্রী মালিনী দেবী এবং অপর অন্তরঙ্গ স্ত্রীপুরুষ ভক্তগণ যথাসাধ্য সান্ত্বনাদি দিতে লাগিলেন।

কাটোয়াতে ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রশেখর ও ভক্তগণ নিমাইকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত দেখিয়া ভয়ে তাঁহাদের সকলের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তাঁহারা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে নিমাইয়ের কাছে গিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। ভারতীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকেও করজোড়ে নিবেদন করিলেন, নিমাইকে সন্ন্যাসী না করিয়া গৃহে পাঠাইবার জন্য।

নিমাইয়ের কুসুমকোমল হৃদয় আজ বজ্রের মত কঠোর। মাতা-পত্নীর গভীর শোকের উচ্ছ্বাস, শোচনীয় দুরবস্থার বর্ণনা শুনিয়াও তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্র টলিল না। আপন সংকল্পে অটল অচল সুমেরুবৎ স্থির থাকিয়া নিমাই চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "আপনি পিতৃতুল্য, আপনার আদেশ অমান্য করা মহা অপরাধ। মাতা পত্নী আত্মীয়স্বজন ভক্তগণ সকলেরই নিকট আমি অপরাধী। কিন্তু, কি করিব! সাধ্য থাকিলে আমি আপনাদের কষ্ট দিতাম না। সংসারের বন্ধন, বিষয়সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইলে, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে না পারিলে, আমার চিত্তে শান্তি হইবে না। গৃহে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনারা আমায় জোর করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু বাড়ী ফিরিলে প্রাণরক্ষা দায় হইবে।" নিমাই অতিশয় কাতর হইয়া করুণ স্বরে চন্দ্রশেখর, নিত্যানন্দ ও ভক্তগণকে আপনার অন্তরের অবস্থা নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার অভীষ্টসাধনে—সন্ন্যাসগ্রহণে বাধা না জন্মাইবার জন্য করজোড়ে বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্নেহময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হৃদয় বিগলিত হইল। চন্দ্রশেখর নিমাইয়ের তীব্র বৈরাগ্য এবং সংকল্পের দৃঢ়তা বুঝিয়া তাঁহাকে আর বাধা দেওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। নিত্যানন্দাদি সকলে বুঝিলেন—নিমাইকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। কাজেই তাঁহারাও তাঁহার ইষ্টলাভের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। চন্দ্রশেখর অশ্রুপূর্ণলোচনে

নিমাইকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদানপূর্বক বলিলেন, "বাবা, আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, তোমার শ্রেয়োলাভের পথে আর বিঘ্ন উৎপাদন করা উচিত নহে। তোমার চিত্ত যাহাতে শান্তি লাভ করে, সেই পন্থাই অবলম্বন কর। ভগবানের কৃপায় তোমার মনোরথ সিদ্ধ হউক। তাঁহার পাদপদ্মে তোমার চির কল্যাণ কামনা করি।"

চন্দ্রশেখর আচার্য, নিত্যানন্দ ও ভক্তগণের অনুমোদন লাভ করিয়া নিমাইয়ের অন্তর অতিশয় প্রফুল্ল হইল। চন্দ্রশেখর ক্রিয়াপটু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ; নিমাই উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকেই সন্ন্যাসের পূর্বকৃত্য আত্মশ্রাদ্ধাদি যথাশাস্ত্র সম্পাদন করাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন।

এই অনুরোধ রক্ষা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হইলেও নিমাইয়ের প্রীতির জন্য—তাঁহার আরব্ধ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য চন্দ্রশেখর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানতুল্য নিমাইকে সন্ন্যাসের পথে সহায়তা করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর হইলেন।

শাস্ত্রজ্ঞ আচার্যের সহায়তায় সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকর্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন হইল। নিমাই চিরকালের জন্য পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করিয়া সর্বশেষে নিজের পিণ্ড নিজে গ্রহণ করিলেন। এই মহান দৃশ্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের হৃদয় স্পর্শ করিল, ক্ষণিকের জন্য সকলেই এই অনিত্য সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইলে নিমাই উপবাসী থাকিয়া ভারতী মহারাজ ও আশ্রমস্থ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন। রাত্রির প্রথমার্ধও ধ্যানধারণাতে কাটিল।

গভীর রাত্রে হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। প্রসন্নচিত্ত সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসিবৃন্দ মণ্ডলাকারে চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। মুণ্ডিতমস্তক শিখা-সূত্রধারী শুচিশুভ্রবেশ তেজঃপুঞ্জকায় শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র অগ্নিসম্মুখে স্থিরাসনে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ যতিরাজ ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতী সুখাসনে সমাসীন। ব্যাস-বশিষ্ঠ-শুক-শঙ্করের ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রচার ও সনাতন বৈদিক আদর্শের সংরক্ষণের জন্য, আবার যেন আত্মবিদ্ মহর্ষিগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের প্রাণ-গঙ্গার গৈরিক স্রোতে পুনরায় উত্তাল তরঙ্গ-তুফান উঠিয়াছে। পল্লীবাংলার শ্যামল তটভূমিতে আসিয়া সে-উদ্বেল তরঙ্গপ্রবাহ বুঝি পরিণতির পথে চলিয়াছে—বুঝি আর একবার রূপ পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছে! নিথর-নিঝুম এই হিমের নিশীথে, অশোক-বকুল-বট-অশ্বত্থের ছায়ায় ঘেরা ভারতী

মহারাজের আশ্রমে, আজ নগাধীশ· হিমালয়ের গাম্ভীর্যময় প্রশান্তি নামিয়া আসিয়াছে।

বিধানবিদ্ ভারতী মহারাজের নির্দেশানুসারে যথাশাস্ত্র সমস্ত ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে বিরজা-হোম আরম্ভ হইল। নিমাই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া আত্মশুদ্ধি করিলেন,—বর্ণ, আশ্রম, দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ইহ-পরলোকের ভোগবাসনা, সংসারপাশ-জীবাভিমান, সমস্ত অজ্ঞান চিরতরে ভস্মীভূত হইল। ভারতী শিখাছেদন করিয়া দিলেন, যজ্ঞসূত্র ও শিখা ভস্মে পরিণত হইল; মায়িক জগতের সঙ্গে, গৃহ-গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে নিমাইয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল।

শিখা-সূত্র-বিহীন সন্ন্যাসী জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; তাঁহার স্থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ হইতেছে। আচার্য ভারতী তাঁহাকে প্রৈষমন্ত্র, পরমহংস গায়ত্রী, ব্রহ্মমন্ত্র, মহাবাক্যাদি শ্রবণ করাইলেন; গৈরিক রঞ্জিত কৌপীন-বহির্বাস, দণ্ড-কমণ্ডলু দান করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী' নামে বিভূষিত করিলেন।[১]

এখন হইতে তিনি আর জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন 'বিশ্বম্ভর মিশ্র' কিংবা, শচীদেবীর প্রাণের দুলাল 'নিমাই', বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ 'গৌরাঙ্গসুন্দর' নহেন। আজ হইতে তাঁহার পরিচয় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত দশনামী[২] সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতী মহারাজের শিষ্য, শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। লোকে নামের সংক্ষেপ করিয়া 'শ্রীচৈতন্য' বলিয়া সম্বোধন করায়, জগতে তিনি 'শ্রীচৈতন্যদেব' নামেই পরিচিত হইয়াছেন। ভক্তগণ সম্মান প্রদর্শন করতঃ বলেন—"শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।" কেহ কেহ বলেন তাঁহার নাম হইয়াছিল স্বামী চৈতন্যানন্দ; পরবর্তীকালে ভক্তগণ 'শ্রীকৃষ্ণ' যোগ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য নামেই প্রাচীন গ্রন্থেও পরিচয় আছে।

গুরুমুখে মহাকাব্য শ্রবণানন্তর মনন নিদিধ্যাসন করিতে না করিতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমাধিস্থ হইলেন। তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণে—প্রাণের প্রাণ পরমাত্মায়—পরাৎপর পরব্রহ্মে একীভূত হইলেন। মনবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্দশায় নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হইলেন। অদ্ভুত শিষ্যের উচ্চতম অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ভারতী মহারাজ স্তম্ভিত। অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পুলকিত হৃদয়ে তিনি শিষ্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ

---

১ ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতিমকরান্মনীষী
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ।

—মুরারি গুপ্তস্য চৈতন্যচরিতং

২ দশনাম—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী।

পরে ধীরে ধীরে নিমাইয়ের মন একটু নীচে নামিয়া আসিলে, অর্ধবাহ্যদশায় ভাবসমাধি হইল। তখন তাঁহার প্রিয়তম পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় বিগ্রহ সর্বব্যাপীরূপে সর্বত্র দর্শন করিয়া তিনি অদ্ভুত প্রেমভাবে বিহ্বল হইলেন। ক্রমে ক্রমে মন আরও নীচে নামিয়া আসিলে স্থূল জগতের জ্ঞান উদয় হওয়ায় নিমাই বাহ্যদশায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হইয়া মন আবার সমাধিতে লীন হইল,—অন্তর্দশা উপস্থিত হইল। এইরূপে তিনি কখন অন্তর্দশা (নির্বিকল্প সমাধি), কখন অর্ধবাহ্যদশা (ভাবসমাধি), আবার মধ্যে মধ্যে বাহ্যদশায় (স্থূল জগতের জ্ঞানে) অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদৃষ্টপূর্ব অবস্থাসকল ও ভাবাবেশ দেখিয়া আশ্রমস্থ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদিগের বিস্ময়েব সীমা রহিল না।

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, সন্ন্যাসীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তে মহাপ্রস্থানের পথে হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেন; আর লোকালয়ে ফিরিতেন না। পরবর্তীকালে আচার্যগণ এই প্রথার পরিবর্তে তীর্থাদিতে বাস করতঃ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবন যাপনের প্রণালী প্রবর্তন করেন। সেই পুরাতন প্রথার স্মৃতি এখনও প্রাচীন মঠ ও আশ্রমে দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নূতন সন্ন্যাসীরা মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হন ; তখন প্রাচীনগণ তাঁহাদিগকে 'জগদ্ধিতায়' প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করেন।

পরদিন সকালেই গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণান্তর নবীন পরিব্রাজক পথে বাহির হইলেন। চন্দ্রশেখরাদির নিকট হইতে বিদায় মাগিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, "আপনারা নবদ্বীপে গিয়া সেখানকার ভক্তগণকেও আমার 'নমো নারায়ণায়'[১] জানাইবেন।"[২] তিনি সন্ন্যাসীদিগের প্রিয় সাধন-

১ "দণ্ডধারণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে লোকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে, সন্ন্যাসিগণও 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রত্যাভিবাদন করেন।

২ মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিতে—

"নমো নারায়ণায়েতি সদ্বাক্যং ভক্ত সন্নিধৌ, বক্তব্যং ভবতা যেন মমানন্দোভবিষ্যতি।"

মতান্তরে—সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহস্থদের 'নমো নারায়ণায়' বলা বিধি নহে।

যথা—প্রণামং ন যতির্ব্রূয়াত আশিষং ব্যাসশাসনাৎ।
নারায়ণেতি চ ব্রূয়াৎ প্রণতায়ুবিবৃদ্ধয়ে ॥—যতিধর্মসংগ্রহ

তবে লোকোত্তর পুরুষেরা সামান্য বিধি লঙ্ঘন করিলেও দোষ নাই। যথা—
'তেজীয়সাং ন দোষায়।'

ভূমি উত্তরাখণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মনে অভিপ্রায়, পথে কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক[১] —যাহাতে বলা হইয়াছে, 'সংসারাশ্রম পরিত্যাগান্তে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করাকেই মহাত্মারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাচীন পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন',- চৈতন্যদেব সেই সুমধুর শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে রাস্তায় চলিতেছেন। তিনি সকলকে ছাড়িয়া একাকী বাহির হইলেও নবদ্বীপের ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁহারা অদূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সন্ন্যাসের পরদিন চৈতন্যদেব রাস্তায় চলিতেছেন সত্য, কিন্তু বহির্জগতের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। কখনও একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় জড়বৎ হইয়া থাকেন, আবার কখনও ভাবাবেশে 'কোথা কৃষ্ণ, কোথা বৃন্দাবন' বলিয়া ছুটিয়া চলেন। কোন দিকে চলিয়াছেন, কোন দিকে যাইতে হইবে, কোথায় ঠিক পথ, কিছুই খেয়াল নাই। কি করিতেছেন, কি করিতে হইবে, এই ভাবনাও নাই। তিনি শুধু ভগবদ্ভাবে বিভোর, প্রেমে বিহ্বল। এইরূপেই সমস্ত দিবারাত্র কাটিল। ইহার মধ্যে না ছিল নিদ্রা, না আহার। ইহাতে নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারেই প্রথম দিন অনিদ্রায় উপবাসে গিয়াছে, দ্বিতীয় দিন কাটিল ভাবের আবেশে। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইলে চৈতন্যদেব সন্ধ্যায় এক বটবৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করিলেন। হরিনাম কীর্তন-ভজন, ধ্যান-ধারণাতে রাত্রিও কাটিয়া গেল। যে স্থানে চৈতন্যদেব রাত্রে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, অদ্যাপি ঐ স্থান 'বিশ্রামতলা' বলিয়া পরিচিত।

> 'গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ, শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস,
> দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও, সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও॥"
> —স্বামী বিবেকানন্দ (সন্ন্যাসীর গীতি)

সন্ন্যাসীর ইহাই সনাতন আদর্শ। আদর্শ সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব রাত্রি প্রভাতেই ভগবানের নাম স্মরণ করতঃ আবার পথে বাহির হইলেন। কাটোয়ার উত্তর-

---

১ এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৩।৫৩

পশ্চিম অঞ্চলে তখন জনবসতি বিরল, জঙ্গলাকীর্ণ। অনিদ্রা অনাহারে তখন তাঁহার দেহও অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই দুর্গম রাস্তায় বেশী অগ্রসর হওয়া কঠিন হইল, আবার মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া গন্তব্যস্থান ও রাস্তা ভুলিয়া যাইতেছেন, কখনও বা বিপরীত দিকেই চলিতেছেন। ভক্তগণ-সহ নিত্যানন্দও নিজেদের আহার-নিদ্রা, দুঃখকষ্ট ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। আজ তাঁহার দেহের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া নিত্যানন্দের মনে ভীষণ চিন্তা হইল। এইভাবে চলিলে ত দেহরক্ষা হইবে না। তখন তিনি মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া, সঙ্গী ভক্তগণের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ একজনকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের নিকট পাঠাইয়াদিলেন। অপর সঙ্গী-দিগকে পশ্চাতে আসিতে বলিলেন এবং নিজে অগ্রসর হইয়া চৈতন্যদেবের নিকটে গিয়া আপনার বৃন্দাবন দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দকে পাইয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইল এবং উভয়ে একসঙ্গে যাওয়া স্থির করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ পথ দেখাইয়া এবং ক্রমে চৈতন্যদেবকে ভুলাইয়া লইয়া শান্তিপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দেশ-গ্রাম-রাস্তা কিছুরই খেয়াল নাই। বৃন্দাবনচন্দ্র ও তাঁহার পুণ্যলীলা-স্থানের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল, ভাবে বিভোর। মধ্যে মধ্যে গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্য জগতের জ্ঞান লোপ পাইতেছে। আবার কখনও অধীর হইয়া নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভুপাদ, বৃন্দাবন কতদূর?" এইভাবে অগ্রসর হইয়া, যখন উভয়ে গঙ্গার নিকটবর্তী হইলেন, তখন নিতাই গঙ্গার তটদেশ দেখাইয়া বলিলেন, আর বেশী দূর নহে "ঐ যে যমুনার তীর দেখা যায়।" যমুনার নাম শুনিয়া চৈতন্যদেবের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। দ্রুতবেগে গঙ্গাতীরে অগ্রসর হইয়া তিনি ভাববিহ্বল চিত্তে যমুনার মাহাত্ম্য পাঠ করিলেন এবং সানন্দে অবগাহন করিলেন।

স্নানান্তে চৈতন্যদেব চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সমস্তই যেন পূর্ব পরিচিত বলিয়া মনে হয়। অপর পারে পূর্বদিকে চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন, চিরপরিচিত শান্তিপুরের গঙ্গাঘাট বলিয়া বোধ হইতেছে। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দের প্রেরিত খবর পাইয়া, অদ্বৈতাচার্য নৌকাসহ আসিয়া উপস্থিত। চৈতন্যদেব অতীব বিস্মিত হইয়া নিত্যানন্দের মুখের দিকে চাহিলে তিনি তখন হাসিতে হাসিতে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আচার্যের অন্তরে নিত্যানন্দের প্রতি অতিশয় ভক্তি জন্মিল; তিনি বারংবার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আচার্য নিত্যানন্দকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "অবধূতশ্রেষ্ঠ,

আপনার জন্যই আজ প্রভুর দেহ ও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের জীবনরক্ষা হইল।" চৈতন্যদেব যখন দুঃখ করিয়া বলিলেন, তাঁহাকে এইভাবে ঠকাইয়া গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া দেখান ঠিক হয় নাই, তখন আবার আচার্য হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই, গঙ্গা যমুনা একত্র মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন, এবং পশ্চিম কিনারে যমুনারই ধারা, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।"

ভক্তগণসহ অদ্বৈতাচার্য অত্যন্ত শোকাকুল ছিলেন, চৈতন্যদেবকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। নিত্যানন্দের আজ্ঞানুসারে আচার্য গৈরিক-রঞ্জিত নূতন কৌপীন বহির্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন,--কারণ স্নানান্তে বদল করিবার মত দ্বিতীয় বস্ত্র চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিল না। আচার্য করজোড়ে সেই গৈরিকবস্ত্র নিবেদন করিলেন এবং শ্রীচৈতন্যও তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই নববস্ত্র-পরিহিত নবীন সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া সকলে দেখিলেন,

"গৌর দেহ কান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে ঝলমল॥"

আচার্যপ্রদত্ত অতি সুন্দর কাষ্ঠপাদুকা পদযুগলে ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তক দণ্ড-কমণ্ডলুধারী অতি সৌম্য প্রশান্তমূর্তি যতিরাজ যখন দণ্ডায়মান হইলেন, তখন সকলেই পুলকিত অন্তরে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া একে একে নবীন সন্ন্যাসীকে অভিবাদনান্তর তাঁহার শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসীপ্রবরও 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।

অনন্তর আচার্য অতি বিনীতভাবে করজোড়ে নিজগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইলে, মৃদুহাস্য সহকারে চৈতন্যদেব সম্মতি প্রদান করিলেন এবং নৌকাতে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের ঘাটে অবতরণপূর্বক নিত্যানন্দ ও ভক্তগণসহ ধীরে ধীরে আচার্য-গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন-বার্তা আগুনের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত হইল, নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। 'ওঁ নারায়ণো হরিঃ' বলিয়া সন্ন্যাসী ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আচার্যের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে আনন্দকলরবে আচার্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। আচার্য পাদবন্দনা পূর্বক চৈতন্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া সঙ্গিগণসহ সমাদরে গৃহা-ভ্যন্তরে লইয়া গিয়া উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। আচার্য-গৃহিণী সীতাদেবী স্নেহের নিমাইকে মুণ্ডিত মস্তকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিবেন বলিয়া প্রথমে শোকাকুল থাকিলেও, এখন নিমাইয়ের সেই চিত্তপ্রশান্তিকর

ভুবনমোহন মূর্তি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দের সঞ্চার হইল, হৃদয় শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পূর্ণ হইল। দূর হইতে দর্শন করিয়া দেবী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম করিলেন এবং নবীন সন্ন্যাসীকে প্রথম ভিক্ষা দিবার আগ্রহে অধীরা হইয়া মনের সাধে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য রন্ধনে ব্যস্ত হইলেন। পূর্বে হিন্দুরমণীগণ, সাক্ষাৎ নারায়ণ-বিগ্রহ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের মাতৃকুলে জন্মগ্রহণের চরম সার্থকতা মনে করিতেন। এখনও বৈদিক ভাবপ্রধান স্থানসমূহে প্রাচীনগণের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা কিছু কিছু দেখা যায়। তাহাতে আবার পরম আদরের নিমাইকে নূতন সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহারই গৃহে উপস্থিত দেখিয়া সীতাদেবীর সকল দুঃখ সুখে রূপান্তরিত হইল।

রন্ধন পরিসমাপ্ত হইলে আচার্য তিনটি ভোগ পরিবেশন করাইলেন। সুন্দর ধাতুপাত্রে গৃহদেবতার ভোগ সজ্জিত হইল। সন্ন্যাসীর ধাতুপাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, এজন্য কলার পাতা ও ঠোঙ্গাতে অন্নব্যঞ্জনসমূহ এবং মাটির খুরি ও গেলাসে করিয়া দই ক্ষীর পায়েস ও জল ইত্যাদি সাজাইয়া অপর দুইটি ভোগ প্রস্তুত হইল।

"তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি ॥
বত্রিশা আটিয়া কলার আঙ্গাটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥"

গৃহদেবতার ভোগ নিবেদন, আরাত্রিক সম্পাদন করিয়া আচার্য তাঁহাকে শয়ন দিলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেব আরতি দর্শন করিলেন। অতিশয় ভক্তিভাবে আচার্যের সেবা-পূজাদি দেখিয়া তাঁহাদের খুবই আনন্দ জন্মিল। সন্ন্যাসীর স্ত্রীলোকদর্শন নিষেধ, এজন্য সীতাদেবী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া অতিশয় ভক্তিভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন, সন্ন্যাসিদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন না। আচার্য স্বয়ং সেইজন্য অগ্রসর হইলেন, বিশেষতঃ অতিথিকে স্বহস্তে সেবা করা স্বয়ং গৃহস্বামীরই কর্তব্য। সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ নারায়ণ, এইজন্য তাঁহাকে প্রসাদী অন্ন দেওয়া হয় না। আচার্য সেইজন্যই পূর্বে কলাপাতে দুইটি পৃথক ভোগ সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিদ্বয়কে,—চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে করজোড়ে আহ্বান করিয়া আচার্য এখন সেই ভোগ দুইটি গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তুলসীমঞ্জরী সংযুক্ত, অতি পরিপাটিরূপে সুসজ্জিত অপূর্ব ভোগ দুইটি এবং আচার্যের আন্তরিক সেবানিষ্ঠা ও ভগবদ্‌ভক্তি দেখিয়া চৈতন্যদেবের মন প্রফুল্ল হইল এবং তিনি শতমুখে আচার্যের

প্রশংসা করিলেন। অতঃপর সেই ভোগের সামান্যমাত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উহা হইতে কিয়দংশ পৃথক করিয়া দিতে বলিলেন। তখন আচার্য অতিশয় কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, ঐ ভোগ দুইটি তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই সজ্জিত হইয়াছে, উহা তাঁহারা কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহার জীবন সফল হইবে। চৈতন্যদেব এত অধিক পরিমাণ অন্ন ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণ দেখিয়া উহা গ্রহণ করিতে আপত্তি জানাইয়া বলিলেন,

"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় দমন ॥"

আচার্য ছাড়িলেন না, জোড়হাতে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, ইহা অতি সামান্য জিনিস, খাইলে কিছুই দোষ হইবে না। আচার্যের আগ্রহ, ব্যাকুলতা, অনুরোধ, উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে তিনি নিত্যানন্দ-সহ ভোজনে বসিলেন।

আচার্য ও নিত্যানন্দ উভয়েই আজ খুব আনন্দিত। চৈতন্যদেবকে স্বগৃহে পাইয়া আচার্যের প্রাণে অতিশয় উল্লাস হইয়াছে। নিত্যানন্দও তাঁহাকে নিয়মমত স্নানাহার করাইতে পারিয়া, বিশেষতঃ, আপনার স্থানে আপনার লোকের মধ্যে লইয়া আসিয়া খুব স্বস্তি অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে সর্বদাই রঙ্গরস হাস্যকৌতুক চলে। আহার শেষ হইলে নিত্যানন্দ কৌতুক করিয়া আচার্যকে বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পেট ভরিয়া খাইতে দিলে না। তার উপর আজ আবার তিন দিন উপবাসী।" আচার্য বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তুমি রাশি রাশি খাইলে এত খাবার কোথায় পাইব?" নিত্যানন্দ ক্রোধের ভান করিয়া, পাতা হইতে একমুঠা অন্ন লইয়া ছুড়িয়া আচার্যের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "নাও তোমার অন্ন, আমি আর খাইতে চাহি না।" অন্তরে আচার্য নিজেকে প্রসাদস্পর্শে কৃতার্থ মনে করিলেন, কিন্তু বাহিরে ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি জাতিকুলহীন, ভ্রষ্টাচারী অবধূত, ব্রাহ্মণের অপমান করিতে ভয় কর না! আমি ইহার প্রতি-বিধান করিব।" এইরূপে রঙ্গরসে পরমানন্দে ভোজন পরিসমাপ্ত হইল। আচমন করাইয়া আচার্য সন্ন্যাসিদ্বয়কে মুখশুদ্ধির জন্য তুলসীমঞ্জরী ও লবঙ্গ-এলাচ-কাবাবচিনি আনিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া পান দিলেন না।

"লবঙ্গ এলাচী বীজ, উত্তম রসবাস[১]।
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥"

১ রসবাস—কাবাবচিনি।

অদ্বৈত-ভবনেই চৈতন্যদেবের আসন হইল। আচার্য, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি কয়েকদিন সেখানে বিশ্রাম করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভগবৎপ্রসঙ্গে ও কীর্তনে পরমানন্দে রাত্রি অতিবাহিত হইলে, পর-দিবস প্রত্যুষেই নিত্যানন্দ তাঁহার অনুমতিমতে শচীদেবীকে আনিবার জন্য শিবিকা লইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন। একখানা মাত্র শিবিকা প্রেরিত হইল, চৈতন্যদেবের অনভিপ্রেত বলিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য শিবিকা প্রেরিত হইল না।

নিতাইকে দেখিয়া ও নিমাইয়ের খবর পাইয়া শোকাকুলা বৃদ্ধার মৃতদেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল; শচীদেবী শান্তিপুরে গমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। তখন, লজ্জা সম্ভ্রম সঙ্কোচে আবৃতা, শোকে-উদ্বেগে জর্জরিতা, অনাহার-অনিদ্রায় অতিশয় ক্ষীণা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া অতিশয় দীনহীনার ন্যায় শাশুড়ীর পাশে আসিয়া অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, একবার পতির পাদপদ্ম দর্শনের আশায়। সেই করুণ দৃশ্যে নিতাইয়ের চিত্ত দ্রবীভূত হইলেও তিনি শচীদেবীকে জানাইলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সেখানে যাওয়াতে চৈতন্যদেবের সম্মতি নাই। শাশুড়ী-বধূ দুজনের অন্তরে এই বাক্য শেলসম বিদ্ধ হইল। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া একা যাইতে চাহিলেন না, তখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির সন্ন্যাসধর্ম রক্ষার জন্য নিজেই যাইতে অস্বীকৃত হইলেন এবং নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীকে শিবিকায় তুলিয়া দিলেন। শচীদেবী বারংবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে ধরিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া মুখচুম্বন করিলেন এবং বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য ঈশানের উপর তাঁহার রক্ষার ভার দিয়া ৺রঘুনাথকে প্রণামানন্তর নিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুর রওয়ানা হইলেন।

শচীদেবী শান্তিপুর আসিলে চৈতন্যদেব ছুটিয়া গিয়া মায়ের পায়ে পড়িলেন।

"শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হইয়া।
কাঁদিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইল বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইল বিকল ॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥"

কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া,—

"কাঁদিয়া বলেন শচী, 'বাছারে নিমাই'।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ ॥"

মায়ের কাতর বাক্যে সন্ন্যাসীর মন অতিশয় দ্রব হইল।

"কাঁদিয়া বলেন প্রভু, শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ॥
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই যে করিব ॥
এত বলি পুনঃপুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হৈয়া আই কোলে লহে বারবার ॥"

পুত্রের সুমিষ্ট বাক্য, অতুল শ্রদ্ধাভক্তি মায়ের অন্তর পুলকিত করিয়াছে। স্নেহে বিগলিতহৃদয় শচীদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সন্ন্যাসী পুত্রকে ভিক্ষা করাইলেন। চৈতন্যদেবের ইচ্ছানুসারে শচীদেবীও কয়েকদিন অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবার জন্য সকলেরই অত্যন্ত আগ্রহ।

"শুনি শচী সবাকারে করিলা মিনতি।
নিমাইর দরশন আর মুই পাব কতি ॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুই অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥
যাবৎ আচার্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুই ভিক্ষা দিব সবাকারে মাগো দান ॥"

শচীদেবীর অভিপ্রায় জানিয়া অপর সকলে নিরস্ত হইলেন। তিনিই প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিমাইকে ভিক্ষা দেন, আচার্য ও তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী তাঁহাকে সহায়তা করেন।

সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিবার জন্য বহু লোক আসিতে লাগিল. নবদ্বীপের অন্তরঙ্গ ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইলেন। শান্তিপুর যেন নদীয়া হইল, আর অদ্বৈত-গৃহ হইল শ্রীবাস-অঙ্গন। আচার্যের গৃহে নিত্য মহোৎসব। অন্তরঙ্গগণ চৈতন্যদেবের বিরহ বিস্মৃত হইলেন, তাঁহার সদা হাস্যময় শ্রীবদন দেখিয়া সন্ন্যাসের দুঃখও ভুলিলেন—।

"কেশ না দেখিযা ভক্ত যদি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥"

ভগবৎপ্রসঙ্গ, কীর্তন, নৃত্যগীত, ভাবাবেশ, আনন্দোল্লাসে ভক্তগণের মন মজিয়া রহিল। পূর্বে যাহারা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, সেই সকল লোকেরও ভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। কাকবিষ্ঠার ন্যায়, সংসারেব সারবস্তু স্ত্রী-ধন-জন-মান-যশঃ পরিত্যাগের কথা ভাবিয়া তাহাদের বিস্ময় জন্মিল, ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইল। অনেক দুষ্কর্মার অনুশোচনা করিতে করিতে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল,—এখন হইতে তাহারা চৈতন্যদেবের অনুগত হইয়া ধর্ম-পথের পথিক হইল। সন্ন্যাসী সকলের গুরু, পূজ্য। পূর্বে যাঁহারা ধন জন বিদ্যা কুলগৌরবে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, এখন তাঁহারাও নিঃসঙ্কোচে সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জগদ্‌গুরু সন্ন্যাসী কৃপাদৃষ্টিতে সকলের চিত্ত প্রসন্ন করিয়া মনের সংশয়জাল, অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কয়েক দিবস কাটিয়া গেলে চৈতন্যদেব আচার্য ও ভক্তগণকে জানাইলেন,

"সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে, কুটুম্ব লইয়া ॥"

তাঁহার কথাতে সকলের মনে ভীষণ চিন্তার উদয় হইল। চৈতন্যদেব উত্তর-পশ্চিমে গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে নিত্যানন্দ, আচার্য ও ভক্তগণ সকলেই তাঁহাকে অন্যত্র না গিয়া এই স্থানেই বরাবর বাস করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় আরম্ভ কবিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আকুতি মিনতি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শেষে তিনি জানাইলেন, মা যেখানে বলিবেন তিনি সেখানেই থাকিবেন। ইহাতে ভক্তগণের চিত্তে খুব ভরসার সঞ্চার হইল; তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া শচীদেবীর নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিলেন, "মাতঃ! আপনার আজ্ঞার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আপনি আদেশ করিলে তিনি অন্যত্র না গিয়া এই স্থানেই অবস্থান করিবেন। তাহা হইলে আপনার ও আমাদের

পরমানন্দ হইবে।" সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া শচীদেবী গাম্ভীর্য অবলম্বন করিলেন; পুত্রের সন্ন্যাসধর্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুলহৃদয়া স্নেহময়ী জননী ধীরভাবে ভক্তগণকে বলিলেন,

"তিঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয় ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুইঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব পার করিতে গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন ॥
আপনার সুখ দুঃখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি ॥"

শচীদেবীর বাক্যে সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলেই 'ধন্য ধন্য' বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন, "এমন মা না হইলে কি এরূপ পুত্র জন্মে।" মায়ের অভিপ্রায় জানিয়া চৈতন্যদেবের খুব আনন্দ হইল, তিনি ভূমে লুটাইয়া বারংবার জননীর চরণবন্দনা করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। শচীদেবীর ইচ্ছানুসারে চৈতন্যদেব আরও দিনকয়েক অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিতে সম্মত হওয়ায় ভক্তগণের চিত্ত প্রফুল্ল হইল।

আচার্যের গৃহে, শান্তিপুরে আনন্দের স্রোত বহিতেছে, দেশদেশান্তর হইতে বহু লোক আসিয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। হরিনাম সংকীর্তনের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া এবং ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রেম-ভাবাবেশ, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া অনেকে তাঁহাকে চিরকালের মত আত্মসমর্পণ করিতেছে। নদীয়ার সকলেই আসিল, সন্ন্যাসী নিমাইকে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিল। মাত্র একজন আসিলেন না,—আসিতে পাইলেন না। সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার দাবী ও আগ্রহ তাঁহারই সর্বাপেক্ষা বেশী, কারণ সন্ন্যাসী তাঁহারই সর্বাপেক্ষা নিকটতম-প্রিয়তম। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির সন্ন্যাসধর্মের মর্যাদা লংঘন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শান্তিপুরে গমন ও স্থূলচক্ষে তাঁহাকে দর্শনের জন্য অধীরা হইলেন না; বরং তাঁহার গুরুর আদেশ ও অভিপ্রায়ানুযায়ী নিজ জীবন সর্বপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার তপস্যাময় অলৌকিক জীবন অতঃপর ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পরম আশ্রয় স্বরূপ হইবে। পতির আদেশানুযায়ী

তিনি বাকী জীবন অতিশয় নিষ্ঠা-ভক্তির সহিত বৃদ্ধা শাশুড়ী, গৃহদেবতা 'রঘুনাথ, অতিথি অভ্যাগত ও ভক্তগণের সেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন এবং অবসরকাল ভগবানের আরাধনা ও জপধ্যানে ব্যয় করিতেন।

পতির গৃহত্যাগের পর হইতে দেবী যাবতীয় ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া সংসারেই সন্ন্যাসিনীর ন্যায় তপস্যায় জীবনযাপন করিতেন। তিনি লজ্জাসম্ভ্রম, ক্ষমা-তিতিক্ষার মূর্তিমতী বিগ্রহ। কখনও কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ ত দূরের কথা, কেহ তাঁহার মুখদর্শন করিতেও পাইত না। তিনি শাশুড়ীর পশ্চাতে তাঁহার অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়া এবং তাঁহার পদে দৃষ্টি রাখিয়া গঙ্গা-স্নানে যাইতেন। স্বহস্তে বন্ধনাদি যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিয়া সকলেব আহারান্তে অতিশয় সামান্য প্রসাদমুষ্টি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ঈশান নামক জনৈক কায়স্থ ভক্ত মিশ্রপরিবারের অতিশয় অনুগত ছিলেন এবং বহুকাল হইতে উক্ত পরিবারেরই একজন হইয়া বাস করিয়া সমস্ত কার্যে যথাসম্ভব সহায়তা করিতেন। নিমাই সন্ন্যাসী হইলে পর ঈশানই সংসারের অভিভাবক স্বরূপ হইযা সমস্ত দেখাশুনা করিতেন। ঈশান প্রাণপণে মিশ্র-পরিবারের সেবা করিয়া নিজ জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

শচীদেবীর ইচ্ছানুসারে আরও কয়েকদিন অদ্বৈতভবনে বাস করিয়া চৈতন্যদেব সকলের নিকট নীলাচল যাত্রার জন্য বিদায় চাহিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না দেখিয়া তিনি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে আপন আপন ঘরে গিয়া, সদ্ভাবে জীবন যাপন, স্বধর্ম পালন, ভগবানের উপাসনা ও তাঁহার নাম জপ-কীর্তন করুন, ইহাই মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য। এই কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করিলেই আমার প্রতি যথার্থ ভালবাসা প্রকাশ পাইবে, আমার আনন্দ হইবে।" জননীর চরণে বারংবাব প্রণামানন্তর তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন এবং শিবিকায় করিয়া তাঁহাকে ভক্তসঙ্গে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর আচার্য ও ভক্তগণেব নিকট বিদায় লইয়া স্বয়ং নীলাচল যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ, দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কয়েকজন কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাঁহারাও সঙ্গী হইলেন। তন্মধ্যে নিত্যানন্দ অবধূত, আর বাকী কয়েকজন ব্রহ্মচারী—ইহারা সন্ন্যাসী না হইলেও গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না; কাজেই তাঁহাদের সঙ্গী হওয়াতে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ ছিল না। ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র দিতে চাহিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করিতে নাই, এজন্য চৈতন্যদেব যাত্রাকালে সঙ্গীদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া সঙ্গে কোন জিনিষপত্র লইতে মানা করিলেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—

"ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যেদিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন ॥
প্রভু যারে যেদিন বা না লিখে আহার।
রাজপুত্র হই তবু উপবাস তাঁর ॥"

—চৈতন্যভাগবত

অদ্বৈতাচার্য ভক্তগণসহ শান্তিপুরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া, চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে 'হৃদয়ের ধন'কে বিদায় দিলেন। সৌম্য শান্ত প্রসন্ন-গম্ভীর সন্ন্যাসী ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চোখের আড়ালে গমন করিলে জ্ঞানী আচার্য আর হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। শান্তিপুরের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল।

ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে নবীন সন্ন্যাসী শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণমুখে গঙ্গার তীরে তীরে অগ্রসর হইলেন। ভিক্ষান্নে উদর-পূরণ এবং দেবালয়ে, সাধুর আশ্রমে, মণ্ডপে কিংবা বৃক্ষতলে নিশিযাপন করিয়া মনে খুব আনন্দ হইতে লাগিল। সংসারশৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গমের কি স্ফূর্তি! ভিতরের আনন্দ চোখে মুখে যেন ফুটিয়া পড়িতেছে; দেখিলেই লোক মুগ্ধ হয়। যেখানে যান লোকের ভিড় জমিয়া যায়। অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসে। সন্ন্যাসী শুভদৃষ্টিতে সকলের মঙ্গল বিধান করেন, সুমধুর বাক্যে মন মোহিত করিয়া সকলকে সদ্ভাবে জীবন-যাপন, স্বধর্মপালন ও ভক্তিভাবে ভগবানের নাম করিবার জন্য উপদেশ দেন। আবার স্থানে স্থানে নিত্যানন্দ ও ভক্তগণকে লইয়া হরিনাম কীর্তন করেন; তাঁহার সেই সুমধুর কীর্তন ও অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়, ভক্ত হয়।

এইরূপে ভগবদ্ভক্তি ও হরিনাম প্রচার করিয়া ক্রমে বঙ্গদেশের শেষপ্রান্তে, সাগরসঙ্গমের নিকট ছত্রভোগে[১] উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ 'অম্বুলিঙ্গ' নামক মহাদেব দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শিবপূজা ও স্তব-স্তুতি করিলেন। গঙ্গা বিশালভাবে প্রবাহিতা হইয়া এইস্থানেই সাগরে মিশিয়াছেন, এখনকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। স্থানের সৌন্দর্য ও শিবের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া চৈতন্যদেব সেখানে বিশ্রাম করিলেন। দৈবযোগে তথায় তদঞ্চলের ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খাঁর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রামচন্দ্র

১ ছত্রভোগ—ডায়মণ্ডহারবারের দিকে জয়নগর মজিলপুরের নিকটবর্তী স্থান। এখানে অম্বুলিঙ্গ মহাদেব এখনও বর্তমান।

নবীন সন্ন্যাসীর তেজোময় কান্তি ও অপূর্ব ভক্তিভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রণামানন্তর স্বীয় পরিচয় প্রদানান্তে তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক ভিক্ষা ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সেই সময়ে পুরী যাওয়া বড়ই কঠিন ছিল। বাংলার অধিপতি মুসলমান নবাব ও উড়িষ্যার অধীশ্বর হিন্দু রাজার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলায় সীমান্ত প্রদেশ অতিশয় দুর্গম ও সংকটপূর্ণ ছিল। সীমান্তরক্ষী প্রহরীরা লোককে নানা-প্রকারে উৎপীড়ন করিত। তাহা ছাড়া অরণ্যময় প্রদেশে চোর-ডাকাতের এবং নদী ও সমুদ্রে জলদস্যুগণেরও ভয় ছিল। আবার স্থানে স্থানে যাত্রিগণের নিকট হইতে সরকারী শুল্ক আদায় করিবার জন্য ঘাঁটি থাকিত। রাজতরফ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় রাজ্যেই সাধু ফকিরগণের অবাধগতি থাকিলেও অনেক সময় ঘাটিয়ালগণ সাধুকে ছদ্মবেশী ভাবিয়া উপদ্রব করিত। ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র চৈতন্যদেবের পুরী যাওয়ার কথা জানিয়া অতিশয় ব্যগ্র হইলেন এবং পথে যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সেজন্য সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া জলপথে সীমান্ত অতিক্রম করিবার জন্য একখানা ভাল নৌকা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া চৈতন্যদেব ভক্তগণসহ নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং বঙ্গোপসাগরের কিনার দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বালেশ্বরের নিকটবর্তী 'প্রয়াগঘাট' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন এবং সেখানে স্নান ও দর্শনাদি করিয়া পুনরায় পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐসকল অঞ্চলের প্রহরীরা এবং ঘাটিয়ালেরা সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার মুখে ভগবদ্‌ভক্তির উপদেশ পাইয়া, অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছিল এবং স্বচ্ছন্দ গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। এমনকি চোর-ডাকাতেরাও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিল। তিনিও সকলের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাদৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাঁহারা ক্রমে রেমুনা গ্রামে আসিয়া 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' দর্শনান্তে স্তবস্তুতি ভজন কীর্তন করিলেন। পূজারীদিগেরও তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিল এবং রাত্রে ভোগের পর বহু পরিমাণ প্রসাদী ক্ষীর আনিয়া দিলেন। চৈতন্যদেব সামান্যমাত্র গ্রহণ করিয়া বাকী ফিরাইয়া দিলেন।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনান্তে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাজপুর অতি প্রসিদ্ধ স্থান। গয়ার ন্যায় এখানেও লোকে পিতৃ-পুরুষের মুক্তির জন্য পিণ্ডপ্রদান করে। বৈতরণী নদীতে স্নান-তর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেও বহু লোক তথায় যায়, এখানকার পীঠাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীবিরজা দেবী ও ত্রিলোচনেশ্বর মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির অতিশয় কারুকার্যখচিত ও দর্শনীয়

ছিল। যাজপুরে ছোটবড় আরও, কত যে অসংখ্য মন্দির ছিল তাহার সীমা নাই। কালাপাহাড়ের আক্রমণে ঐ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে। এখনও সেই সকল ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। চৈতন্যদেবের সময়ে যাজপুর সমৃদ্ধিশালী ছিল। তিনি সেখানে অবস্থান করিয়া ভগবতীর দর্শন ও পূজাদি করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করেন। যাজপুর হইতে চলিয়া উড়িষ্যার রাজধানী কটকে 'সাক্ষীগোপাল' দর্শন করতঃ সঙ্গীগণসহ ক্রমে তাঁহারা ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ভুবনেশ্বরের পৌরাণিক নাম একাম্রকানন। ইহা অতি পবিত্র স্থান, শিবের পরম প্রিয় ক্ষেত্র। এখানকার বিন্দুসরোবর এক অতি পবিত্র তীর্থ। ভারতবর্ষে চারিটি পবিত্র সরোবর আছে, কৈলাসে মানস সরোবর, কচ্ছ দেশে নারায়ণ সরোবর, কিষ্কিন্ধাতে পম্পা সরোবর এবং ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবর। চৈতন্যদেব বিন্দু-সরোবরে স্নান করিয়া ভুবনেশ্বর ও গৌরীকে দর্শন-পূজাদি করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন।[১] ভুবনেশ্বরের প্রতি ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইলে অতিশয় প্রেমভাবে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। মনোহর ছন্দে, সুস্বরে, সুষ্ঠু উচ্চারিত সেই অপূর্ব স্তব শুনিয়া সেখানকার সমাগত লোক, মন্দিরের পূজারী-সেবক সকলেই আকৃষ্ট হইলেন এবং তেজঃপুঞ্জকায় সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহার সম্বর্ধনা করিলেন। মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্যচরিত'-গ্রন্থে চৈতন্যদেবের উচ্চারিত উক্ত স্তবটি সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য চৈতন্যদেবের মনে খুব আগ্রহ হইয়াছিল। অন্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি উহা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সর্বান্তর্যামী ভুবনেশ্বরের নিকট উহা অজ্ঞাত রহিল না। জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণ বহু প্রসাদ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে পরম

---

১ "তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী—বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
'বিন্দুসরোবর' শিব সৃজিলা আপনি॥
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দিকে শিবধ্বনি করে অনুচর॥
… … …
নিজপ্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব॥"

—চৈতন্যভাগবত

সমাদরে প্রদান করিলেন। ভুবনেশ্বরের অযাচিত করুণা উপলব্ধি করিয়া চৈতন্যদেবের মনের ভক্তিভাব আরও শতগুণে বর্ধিত হইল। তৎপরে সেখান হইতে চলিয়া তাঁহারা কমলপুরে আসিয়া ভাগী নদীতে স্নান করতঃ 'কপোতেশ্বর মহাদেব' দর্শন করিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দের এই সকল স্থান পূর্বেই দেখা ছিল এবং এই সকল স্থানের মাহাত্ম্য ও ইতিবৃত্ত তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহার মুখে ঐ সকল স্থানের কাহিনী শুনিয়া ভক্তগণসহ চৈতন্যদেবের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। এইরূপে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিবার পর নিত্যানন্দ গোপালের অদ্ভুত কাহিনী বিস্তৃতভাবে শুনাইয়া সকলকে মোহিত করেন। কাহিনীটির সার-সংক্ষেপ এই ঃ

কোন সময় জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি ব্রাহ্মণ যুবককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। যুবকটির সেবাযত্নে বৃদ্ধ অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন এবং দেশে ফিরিলে স্বীয় দুহিতা তাহাকে অর্পণ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুবকটি কুলগৌরবে বৃদ্ধ অপেক্ষা হীন ছিল; কাজেই উক্ত প্রস্তাব অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সে বৃদ্ধকে ঐরূপ সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে থাকে। বৃদ্ধ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি এক মন্দিরে অধিষ্ঠিত শ্রীগোপাল বিগ্রহকে সাক্ষী রাখিয়া যুবকের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহের অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলেন। তীর্থদর্শনান্তে দেশে ফিরিবার পর বৃদ্ধ যখন যুবকের নিকট কন্যাকে সমর্পণ করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই প্রতিবাদ করিল। অন্তরে প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও বৃদ্ধ আত্মীয়স্বজনের বাধা উপেক্ষা করিয়া যুবককে কন্যাদান করিতে পারিলেন না। যুবকটি বৃদ্ধের অবস্থা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল। তখন সে বৃদ্ধের সত্যরক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া গ্রামের লোকের নিকট নালিশ করিলে বিচারক সাক্ষী তলব করিলেন। ভক্ত যুবক নিরুপায় হইয়া তখন সেই দূরদেশে গোপালের মন্দিরে গিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিল, "প্রভো! তুমি যদি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য না দেও, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ধর্ম নষ্ট হইবে; দয়াময়! আশ্রিত দাসের প্রতি সদয় হও।" ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য গোপালের প্রত্যাদেশ হইল, "যুবক! তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে দেশে গমন কর। আমি স্বয়ং তোমার পশ্চৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সাক্ষী দিব; কিন্তু সাবধান, অবিশ্বাসী হইয়া পিছনে ফিরিয়া তাকাইও না। যদি পিছনে ফিরিয়া চাও, আমি আর অগ্রসর হইব না। তুমি চলিতে আরম্ভ করিলে, পিছনে আমার গমনের সঙ্কেতস্বরূপ নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইবে।"

যুবক ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বারংবার ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণামানন্তর দেশে

ফিরিয়া চলিল। চলিবার সময় পশ্চাদ্দেশে নূপুরের সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার মনে যে কি আনন্দ জন্মিল, তাহা বলিবার নহে। বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ একবারও ফিরিয়া দেখিল না। চলিতে চলিতে বহুদিন পরে যখন দেশের নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন একদিন হঠাৎ মনে হইল, "যাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে লইয়া আসিলাম, তাঁহাকে ত একবারও স্বচক্ষে দেখিলাম না।" সরল ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া যখন ফিরিয়া চাহিল, অমনি নূপুরের ধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল। চকিতদৃষ্টি যুবক আপনার নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের আর্তিতে গোপাল প্রসন্ন হইয়া জানাইলেন, "আমার বাক্য অনুযায়ী আর অগ্রসর হইব না, তবে এইখানেই অবস্থান করিয়া তোমার সাক্ষ্য প্রদান করিব।" ভক্তিমান ব্রাহ্মণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল; গোপালের আবির্ভাবে সকল লোক চমকিত হইল। বৃদ্ধের কন্যা-সম্প্রদানে আত্মীয়স্বজনের নিষেধ আর খাটিল না। সেই হইতে গোপাল এই স্থানেই প্রকট হইয়া ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন। পরিণয়ান্তে সস্ত্রীক যুবক গোপালের সেবাতেই সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সাক্ষীগোপালের মূর্তি ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম, মুরলীধর। তিনি পীতধড়া ও মোহনচূড়ায় সজ্জিত। তাঁহার সেবাপূজা ভোগরাগ সাজসজ্জাও অতি পরিপাটি।[১]

যাহা হউক, যাত্রীরা পুরীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। পথে অনেক দূর হইতেই জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পাওয়া যায়। কমলপুর নামক স্থানে আসিলে সেই পবিত্র ধ্বজা নয়নগোচর হইবামাত্র পরিব্রাজকগণের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

ভূলুণ্ঠিত হইয়া সকলে জগন্নাথের পাদপদ্ম স্মরণ পূর্বক প্রণাম করিলেন। দেশে দেশে ভগবদ্‌ভক্তি ও হরিনাম প্রচার করিতে করিতে, ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে শান্তি লাভের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া, ভক্তগণসহ চৈতন্যদেব পুরীর প্রবেশদ্বার আঠারনালাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এত দুঃখকষ্ট বাধাবিঘ্ন সহিয়া, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, আজ তাহার সার্থকতা। আঠারনালাতে পৌঁছিয়া সকলের হৃদয় প্রেমভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রাস্তায়

---

১ পূর্বে চৈতন্যদেবের সময়ে, সাক্ষীগোপালের মন্দির কটকে ছিল। বর্তমানে উহা পুরীর নিকটবর্তী সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে অবস্থিত। বিদ্যানগর (রাজমহেন্দ্রী) নামক স্থানে ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া সাক্ষীগোপাল প্রকট হইয়াছিলেন। কটকের রাজা পুরুষোত্তম সেই দেশ জয় করার পর গোপালকে কটকে লইয়া আসেন, এই রূপ প্রবাদ আছে।

চলিবার সময় ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবের অনেক সময়ই বাহ্য বিষয়ে লক্ষ্য থাকিত না। সেইজন্য তাঁহার দণ্ড নিত্যানন্দই বহন করিয়া চলিতেন। পুরী প্রবেশ করিবার মুখে আঠারনালাতে আসিয়া চৈতন্যদেব স্বহস্তে ধারণ করিবার জন্য দণ্ড চাহিলেন; কিন্তু তাহা আর পাইলেন না। শুনিলেন আসিবার পথে অবধূত দণ্ড ভাঙ্গিয়া ভাগী[১] নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ পরমহংসাগ্রণীর বাহ্যিক দণ্ডধারণ অনাবশ্যক মনে করিয়াই যে অবধূতশ্রেষ্ঠ ঐরূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দণ্ড ভাঙ্গার কথা শুনিয়া চৈতন্যদেবের খুব দুঃখ হইল এবং এজন্য সকলকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন, "এখন হইতে আমি একাকী চলিতে ইচ্ছা করি; তোমরা পশ্চাতে—আমি অগ্রে যাইতেছি।"

এই বলিয়া সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একাই চলিলেন। অল্প অগ্রসর হইলেই শ্রীমন্দির নয়নগোচর হইল।

---

১ সেই স্থানে নদী এখনও দণ্ডভাঙ্গা বলিয়া পরিচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন--সার্বভৌম মিলন
দাক্ষিণাত্য যাত্রা ও রামানন্দ-সঙ্গে তত্ত্বকথা

বহুদিনে কত দুঃখকষ্টের মধ্যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চৈতন্যদেব আজ পুরীতে আসিয়াছেন। মন্দির দর্শন করিয়া অন্তরের প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে, দৌড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বহুকালের বাঞ্ছিত ধন 'দারু-ব্রহ্ম'-মূর্তি দর্শন করিয়া ভাবের আবেশে প্রিয়তমের পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন,—মন্দিরতলে দেহ লুটাইয়া পড়িল। এদিকে শ্রীমূর্তি স্পর্শ করায় চারিদিকে হৈহৈ পড়িয়া গেল, প্রহরী বেত তুলিয়া মারিতে আসিল। সেই সময়ে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন রাজার সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি ও অপূর্ব ভাবাবেশ দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতে প্রহরিগণ নিরস্ত হইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও বাহ্য সংজ্ঞা হইল না দেখিয়া সার্বভৌম লোকের সহায়তায় সন্ন্যাসীকে উঠাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন।

সঙ্গীদের সহিত নিত্যানন্দ কিছুক্ষণ পরে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু চৈতন্যদেবকে তথায় দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদের অন্তরে ভীষণ উদ্বেগ জন্মিল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, একটু আগেই জনৈক সংজ্ঞাহীন সন্ন্যাসীকে বাসুদেব সার্বভৌম মন্দির হইতে নিজভবনে লইয়া গিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তাঁহারা সন্ধান লইয়া তাড়াতাড়ি সার্বভৌমের বাড়ীর[১] দিকে ছুটিলেন। পথে গোপীনাথ আচার্যের সাথে দেখা। গোপীনাথ নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সার্বভৌমের ভগ্নিপতি। এখন পুরীতেই বাস করেন। ভক্ত গোপীনাথের সঙ্গে মুকুন্দের পূর্বের আলাপ-পরিচয় ও সৌহার্দ ছিল। এই দুঃসময়ে, ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাকে পাইয়া সকলের ভরসা হইল। মুকুন্দ গোপীনাথের সঙ্গে নিত্যানন্দের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলেন। গোপীনাথ নিত্যানন্দের মুখে চৈতন্যদেবের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সার্বভৌমের যত্ন-শুশ্রূষাতে ততক্ষণে চৈতন্যদেব অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন,

১ পুরীর বর্তমান গঙ্গামাতা মঠ সার্বভৌমের বাড়ী।

তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নিত্যানন্দ ও সঙ্গীদিগকে দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে সুস্থ শরীরে দেখিয়া তাঁহাদেরও প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। গোপীনাথের মুখে সকলের পরিচয় শুনিয়া সার্বভৌম খুব সুখী হইলেন এবং পরম সমাদরে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার গৃহেই অবস্থান ও বিশ্রামের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক তাঁহাদের প্রিয়তম সঙ্গীর রক্ষার জন্য সার্বভৌমকে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সার্বভৌম নিজ পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদের জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রস্নান ও অন্যান্য তীর্থকৃত্যের অতি সুন্দর ব্যবস্থা করাইলেন। পরম আনন্দে তাঁহাদের স্নানদর্শনাদি নিষ্পন্ন হইল। সার্বভৌমের নিমন্ত্রণে ভক্তগণ সহ চৈতন্যদেব সেদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। 'মহাপ্রসাদ' ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অন্তরে আনন্দের অবধি রহিল না। চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া সার্বভৌম তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটেই এক অতি নির্জন জায়গায় জনৈক আত্মীয়ের আলয়ে তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া দিলেন।

বিশাল উড়িষ্যা তখন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। মহাপরাক্রমশালী পরম ভক্ত রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি দেশের অধীশ্বর। মুসলমান বাদশাহগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তিনি নিজ বাহুবলে স্বদেশের বিজয়পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছেন। উড়িষ্যাতে পুরী, ভুবনেশ্বর, যাজপুর, কোনার্ক প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ বিরাট মন্দিরসমূহ অবস্থিত। ভারতের সর্বপ্রদেশের স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু তীর্থযাত্রীরা সেই অতীতকালেও উড়িষ্যায় আসিয়া ঐ সকল স্থান দর্শন করিতেন। ধর্মপ্রাণ রাজা তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য সর্বদাই তৎপর ছিলেন এবং মুক্তহস্তে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট, অতিথিশালা সদাব্রত প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বিদেশী যাত্রী বা পথিক যাহাতে নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে, সেজন্য সর্বত্র সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত ছিল। তীর্থদর্শন করিতে আসিয়া অনেক বিদেশী যাত্রী পুরীর মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। রাজার সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি, বরং বিদেশীর সুখসুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য। হিন্দুরাজা শাস্ত্রানুযায়ী অপত্যস্নেহে প্রজাপালন করাকেই রাজধর্ম মনে করিতেন ; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইহার যথাযথ পালনে মোক্ষলাভ, ব্যতিক্রমে নরকবাস। দেশকাল অনুসারে শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবার জন্য হিন্দুরাজগণ বৃত্তি দিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিয়োগ করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র

অনুসারেই তখন দেশের বিচার-শাসন চলিত, সেজন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ রাজসভা অলংকৃত করিতেন; ইঁহাদের উপাধি ছিল সভাপণ্ডিত। বাসুদেব সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে সভাপণ্ডিত করিয়াছিলেন। শোনা যায়, সার্বভৌমের খ্যাতি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বাংলাদেশ হইতে পরম সমাদরে উড়িষ্যায় লইয়া গিয়াছিলেন। সার্বভৌম পুরীতেই আত্মীয়স্বজন সহ বাস করিতেন। রাজ্যে ও রাজার নিকটে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।

আচার্য শঙ্কর বিকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দূর করিয়া ভারতে সনাতন বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বেদ ও বৈদিক ধর্মের সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিধামে চারিটি প্রধান মঠ, ও ঐ সকল মঠের অধীনে সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানে ও তীর্থক্ষেত্রে বহু শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের উত্তরপ্রান্তে হিমালয়ে যোশী (জ্যোতিঃ) মঠ, পূর্বপ্রান্তে পুরীক্ষেত্রে গোবর্ধনমঠ, দক্ষিণপ্রান্তে রামেশ্বরে শৃঙ্গেরীমঠ এবং পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারকাতে শারদামঠ স্থাপন করিয়া উক্ত চারি মঠের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষকে বিভাগ করতঃ ঐ সকল মঠাধীশের উপর ধর্মরক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে, অত্যল্পকালের মধ্যে, সারা ভারতে বৈদিক ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। কালপ্রভাবে ঐসকল মঠের কখন উন্নতি কখন অবনতি ঘটিয়াছে, আবার কোন কোন মঠের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিতও হইয়াছে সত্য, তথাপি এখনও সমগ্র ভারতে ঐসকল মঠ, মঠাধীশ ও সম্প্রদায়ের অসাধারণ প্রভাব। বলিতে কি, বিদেশী বিধর্মীর প্রবল আক্রমণ এবং পরাধীনতার ঘোর অমানিশাতেও ঐসকল মঠে সনাতন ধর্মের, জ্ঞানভক্তির এবং ত্যাগ-তপস্যার বর্তিকা উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিয়া দিশাহারাকে পথ দেখাইয়াছে। আচার্য শঙ্করের ন্যায় পরবর্তীকালে রামানুজাদি আচার্যগণও স্বীয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য স্থানে স্থানে ঐরূপ মঠ, আখড়াসমূহ স্থাপন করেন। পুরীতে এখনও সর্ব সম্প্রদায়ের মন্দির মঠ আখড়াসমূহ বর্তমান আছে। ঐসকল মঠে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বৈরাগীরা বাস করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সাধনভজন সহায়ে নিজেদের জীবন গঠন ও পরম পুরুষার্থ লাভের চেষ্টা করেন এবং তীর্থদর্শন-ভ্রমণাদি উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সনাতন ধর্মের প্রচারের দ্বারা জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করেন।

বাসুদেব সার্বভৌমের সময়েও পুরীতে বহু ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী বাস করিতেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের ও সাধনভজনের পক্ষে পুরী অতিশয় উপযোগী স্থান বলিয়াই সাধুসন্ন্যাসীদিগের মনে ঐস্থানে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। সার্বভৌম যে শুধু বড় নৈয়ায়িক ও মীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন তাহা

নহে, বেদান্তশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পুরীর বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীকে তিনি শাঙ্করভাষ্যাদি সহ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। চৈতন্য-দেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পরে সার্বভৌমের মনে খুব দুঃখ হইল। হওয়াই স্বাভাবিক। চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে সার্ব-ভৌমের আত্মীয়তা ছিল। সেই সূত্রে পরম স্নেহের পাত্র নিমাই এমন কচি বয়সে বৃদ্ধা জননী ও বালিকা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে দেখিয়া বাসুদেব খুবই দুঃখ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে সন্ন্যাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন, তিনি ভারতীনামা সন্ন্যাসীর শিষ্য, তখন আরও দুঃখ হইল। কারণ সার্বভৌম মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত হইলে কি হইবে? বিষয়ী লোকের প্রধান কাম্যবস্তু মান-যশঃ ও সামাজিক মর্যাদা-গৌরবের প্রতি ষোল আনা দৃষ্টি থাকে। উহাকেই তাঁহারা সংসারের সারবস্তু মনে করেন। কাজেই, তখন ভারতীনামা সন্ন্যাসীর অপেক্ষা, অন্য কোন নাম-ধারী সন্ন্যাসীদের গৌরব অধিক থাকায়, নিজ প্রিয়জনকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করিবার ইচ্ছা হইল। চৈতন্যদেবকে বলিলেন, তাঁহার মত হইলে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবশালী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী দ্বারা পুনরায় সংস্কার করাইবেন। কিন্তু পরমার্থৈকদৃষ্টি চৈতন্যদেবের নিকট ঐসকল অতি হেয় বস্তু। তিনি অতি বিনীতভাবে সার্বভৌমকে জানাইলেন, তাঁহার ন্যায় অধম অধিকারীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; কাজেই এজন্য আর কোনরূপ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। সার্বভৌম এইরূপ মনোভাব দেখিয়া খুশী না হইলেও এজন্য আর অনুরোধ করিলেন না; তবে যুবক সন্ন্যাসীর প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাকে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাসুদেব বলিলেন, "সন্ন্যাসধর্ম ঠিক ঠিক পালন করা অতীব কঠিন, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় যুবকের পক্ষে। তুমি আমার নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি মার্জিত হইবে এবং যথার্থ সন্ন্যাসীর জীবনযাপনে সক্ষম হইবে। আমি তোমাকে অতিশয় যত্ন করিয়া সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইব।" চৈতন্যদেব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার পরম হিতৈষী রক্ষাকর্তা আশ্রয়দাতা, আপনার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিব।"

সার্বভৌমের নিকট চৈতন্যদেবের বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ হইল। তিনি শাঙ্করভাষ্য সহ ব্যাসসূত্র (ব্রহ্মসূত্র) ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, চৈতন্যদেব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। বাসুদেব ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সগুণ ব্রহ্মবাদ, ভক্তি-উপাসনা প্রভৃতি খণ্ডন করতঃ চৈতন্যদেবকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন: একমাত্র নির্গুণ নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বই শ্রুতির (উপনিষদের) প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই প্রয়োজন। প্রেমভক্তির

মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেব ভগবদুপাসনার বিরোধী যুক্তিতর্ক শুনিয়া অন্তরে বিষম ব্যথা পাইলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া মৌনভাবে সার্বভৌমের ব্যাখ্যা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে না দেখিয়া পণ্ডিতের মনে সংশয় জন্মিল। সাত দিন পরে সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর না কেন? কিছুই কি বুঝিতে পার না?" চৈতন্যদেব গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "সূত্রভাষ্য বেশ বুঝি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাতেই সব গোলমাল হইয়া যায়। আপনার ব্যাখ্যা ঠিক ঠিক মনে লাগে না।"[১] ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের মুখের উপর এত বড় স্পর্ধা! যুবক সন্ন্যাসীর ধৃষ্টতায় বাসুদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সূত্রভাষ্য বুঝাই-বার জন্যই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি—আর তুমি বল সূত্রভাষ্য বুঝিতে পার, আমার ব্যাখ্যাতে সব গোলমাল হয়! সূত্রভাষ্য কি বুঝিয়াছ বল দেখি?"

আচার্য শঙ্কর ব্যাসসূত্র (ব্রহ্মসূত্র)-ভাষ্যে অতি সুস্পষ্ট ভাষায়, ব্রহ্মের দ্বিবিধভাব—সবিশেষ ও নির্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। উপাসনাদি শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা সমর্থিত বলিয়া দর্শাইয়াছেন এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের মোক্ষলাভের জন্য ভগবদুপাসনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি পরবর্তীকালে, অনুভববিহীন বাদ-বিতণ্ডা-সম্বল পণ্ডিতগণ তাঁহার ভাষ্যের আশয় ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া একদেশী ব্যাখ্যা প্রচার করেন। ঐ সকল ব্যাখ্যাতাদিগের মতে, সর্বোপাধি-বিবর্জিত একমাত্র নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ, এবং ব্যাসসূত্র ও শাঙ্করভাষ্যে তাঁহারই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। আর সেই তত্ত্ববস্তুই একমাত্র জ্ঞানগম্য,—সুতরাং ভক্তি-উপাসনা নিরর্থক। শঙ্করের দোহাই দিয়া ঐ সকল পণ্ডিতেরা সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভক্তি-উপাসনার বিরোধী একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ ও শ্রুতি-স্মৃতির কদর্য অপপ্রচার করিতেন। এই প্রকার শাস্ত্রবিচার ও স্বানুভববিহীন সিদ্ধান্ত সমর্থনই তাঁহাদের মতে জ্ঞানাবস্থিতি বা মোক্ষ। বাসুদেব সার্বভৌমও তখন ঐ শ্রেণীর বেদান্তী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

---

১ "প্রভু কহে, সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ, সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥"

যাহা হউক, সার্বভৌমের আহবানে শ্রীচৈতন্যদেব স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে, অথচ সরল সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও ভক্তি-উপাসনার তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া সার্বভৌমের একদেশী ব্যাখ্যার দোষ দেখাইলেন।

সার্বভৌমও স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক যুক্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে সে সমস্ত টিকিল না, তিনি একে একে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সমস্তই খণ্ডন করিলেন। ঘোরতর তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুজনেই মহাপণ্ডিত; শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায-শাস্ত্রাদি সহায়ে উভয়েই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এইভাবে, উপর্যুপরি কয়েকদিন উভয়ের মধ্যে বিচার চলিল। পরিশেষে সার্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিয়া চৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তখন চৈতন্যদেব ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রের শ্রুতিসম্মত প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন। শুনিয়া বাসুদেবের মন মোহিত হইল। আচার্য শঙ্করের ভাষ্যের প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করিয়া, শঙ্করেরই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী আজ আবার বেদান্তের আবরণে প্রচারিত নাস্তিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রখর বুদ্ধিশানিত তর্কযুক্তির ভাগীরথী-ধারায় নাস্তিক—তথাকথিত বেদান্তিগণের বিচার-বিতণ্ডা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তসমূহ ও যুক্তি-মীমাংসার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সার্বভৌম ভাবিতে লাগিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তত্ত্ববস্তুকে করস্থিত আমলকীর ন্যায় অপরোক্ষ অনুভব করিয়াছেন, সেইজন্যই ইহার বাক্যসমূহ এমন সহজ সরল, হৃদয়গ্রাহী অথচ সারগর্ভ। উপলব্ধিবিহীন শুধু পাণ্ডিত্য সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুবিষয়ে মানুষকে সংশয়মুক্ত করিতে পারে না—হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে না। সার্বভৌমের জ্ঞানগরিমা ও পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হইল। প্রবীণ আচার্য শিষ্যস্থানীয় হইয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিলেন, আর নবীন যুবক আচার্যের আসন গ্রহণ করিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে শাঙ্করভাষ্যের মর্মানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন।[১]

চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির প্রভাবে নীরস শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইল। স্বধর্মনিষ্ঠ উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণের হৃদয় হইতে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার

---

১ চৈতন্যভাগবতের মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদ এবং সার্বভৌম তদ্বিরুদ্ধ মতবাদ অবলম্বন করিয়া তর্কযুদ্ধ করিয়াছিলেন। পুরীতে বহুকাল হইতে অদ্বৈত-বাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রামানুজী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্ত সম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত; সার্বভৌমের পক্ষে তাঁহাদের মতানুবর্তন বিচিত্র নহে। পরে রায় রামানন্দের সহিত কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি সার্বভৌমের নিকট ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে সার্বভৌমই তাঁহাকে রায়ের নাম-পরিচয় দিয়াছেন।

দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥

দূর হওয়ায় চিত্তের মলিনতা কাটিয়া গেল। তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হওয়াতে এক অত্যদ্ভুত অনুভব উপস্থিত হইল। সার্বভৌম দর্শন করিলেন, দূর্বাদল-শ্যামকায়ে যুগলকরে ধনুর্বাণ, এবং নবনীরদকায়ে যুগলকরে বেত্রবেণু ধারণ করিয়া জীবকুলের পরিত্রাণের জন্য পূর্ব পূর্ব যুগে যে ঐশীশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল,—ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য, তপ্তকাঞ্চনকায়ে গৈরিক ধারণ করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে তাঁহারই আবার চৈতন্যরূপে আর্বিভাব হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে, শ্রীশ্রীরাম ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপে অভেদে উপলব্ধি করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সার্বভৌম বারংবার প্রণাম করতঃ 'ষড়্ভূজধারী'[১] ভগবানরূপে বহু স্তবস্তুতি করিয়া চিরকালের জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন।

"দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর জুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তার স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥
শুনি প্রভু সুখে তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এখন হইতে তিনি তাঁহাকে নিজ অভীষ্ট দেবতারূপে দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন।

সার্বভৌমের মতিগতির পরিবর্তন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল। চৈতন্যদেবের মহিমার কথা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সার্বভৌম তাঁহার ভগ্নীপতি, গোপীনাথ আচার্যকে ভক্তি উপাসনার জন্য পূর্বে ঠাট্টা-তামাসা করিতেন। এখন সার্বভৌমকে ভক্তিভাবে গড়াগড়ি দিতে দেখিয়া, রহস্যপূর্ণ বাক্যে পূর্বের ভাব স্মরণ করাইয়া গোপীনাথ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের অন্তরে ভক্তিভাব এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, একদিন ভোরবেলা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে চৈতন্যদেব বাসুদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়া মন্দির হইতে প্রাপ্ত প্রসাদী মালা ও প্রসাদান্ন তাঁহার হাতে দিলে, তিনি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিবার পূর্বেই নিঃসঙ্কোচে পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

১ কথিত আছে সার্বভৌম স্বহস্তে পুরীর মন্দিরগাত্রে চৈতন্যদেবের ষড়্ভুজ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বাসুদেব সার্বভৌমের সহিত ভক্তি ও ভগবৎতত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন থাকিয়া চৈতন্যদেব অতীব আনন্দে পুরীতে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে অনেক উড়িষ্যাবাসীও ভক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন, সমুদ্রস্নান, মহাপ্রসাদ-ভিক্ষা, ভজনকীর্তন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ এবং ধ্যানধারণাতে বিভোর সন্ন্যাসীর দিন পরমানন্দে কাটিলেও কিছুকাল পরেই তিনি দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দোলযাত্রা নিকটবর্তী, ভক্তগণ তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য। তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং পুরীতে দোলের আনন্দোৎসব দেখিয়া তাঁহারও খুব আনন্দ হইল। দোলের পরেও, সার্বভৌমাদি পুরীর ভক্তগণ এবং নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি গৌড়ীয় সঙ্গী-ভক্তগণের আগ্রহে তিনি আরও কিছুদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণ সমীপে বাস করিলেন।

চৈতন্যদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ প্রাতঃকালেই মন্দিরে যাইতেন। সেখানে যাইয়া নাটমন্দিরের ভিতরে গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দূর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে তাঁহার হৃদয়সমুদ্র প্রেমভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; সেইজন্য ভয়ে নিকটে অগ্রসর হইতেন না, পাছে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া যান। এইভাবে গরুড়স্তম্ভে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে দর্শন করিবার পরামর্শ সার্বভৌমই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। দারুব্রহ্ম জগন্নাথকে সকলেই নিজ নিজ ইষ্ট মূর্তিরূপে দর্শন করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার মন একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত, কোন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কখনও তিনি প্রেমে পুলকিত হইয়া অবিরল এমন প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন যে, তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ভূমিতে পতিত হইত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবের উদয় হওয়ায় তাঁহার দেহেও নানাপ্রকার আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যাইত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ ভক্তগণসঙ্গে নিকটে থাকিয়া অতি সাবধানে তাঁহার দেহরক্ষা করিতেন, আর দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া সেই প্রেমের ছাব নিরীক্ষণ করিত। ভক্তগণের আগ্রহে আরও কিছুদিন পুরীবাস করিবার পর বৈশাখ মাসের শেষভাগে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন।

বহুকাল পূর্বে উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইলেও দাক্ষিণাত্যে সনাতন ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। পুরাকালে আর্য-ঋষিগণ সকলেই প্রায় উত্তরাখণ্ডবাসী। কিন্তু পরবর্তী যুগের প্রধান প্রধান আচার্যগণের অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্যাগী মহাত্মারা

'সন্ন্যাসী' ও 'বৈরাগী' (জ্ঞানী ও ভক্ত) প্রধানতঃ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য শ্রীমৎ শংকর এবং বৈরাগী সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ রামানুজ ও দ্বৈতবাদী শ্রীমৎ মধ্বাচার্য। ইঁহাদের সকলেরই জন্মস্থান দক্ষিণ দেশে। ঐসকল আচার্যের জন্মভূমি ও শিক্ষা সাধনার স্থান দর্শন, তাঁহাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায়-মঠ ও মতামতসমূহের বিশেষ পরিচয় লাভ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-মন্দির-বিগ্রহ দর্শনের জন্য চৈতন্যদেবের অন্তরে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আবার, তিনি স্বীয় অগ্রজের অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণে যাইতেছেন ইহাও ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়।

চিরচঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করিবার জন্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা অভ্যাসের জন্য এবং ভগবানের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য মহাত্মারা নিঃসম্বল পরিব্রাজকরূপে তীর্থাদি দর্শন করিয়া বিচরণ করেন। এইভাবে কিছুকাল যাপন করিবার পর ভগবানে নির্ভরতা আসিলে এবং সংসারের মায়ামোহ সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে তাঁহারা অনুকূল স্থানে আসন করিয়া ভগবদ্‌ভজনে কালাতিপাত করেন।[১] শুভদিনে চিরাচরিত রীতি অবলম্বনে চৈতন্যদেবও তীর্থযাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! চিত্তের চাঞ্চল্য মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত কর। তীর্থদর্শনান্তে যেন স্থিরচিত্তে তোমার চরণপ্রান্তে বাস করিতে পারি।"

নিত্যানন্দ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; দাক্ষিণাত্যের রাস্তাঘাট, মঠমন্দির, তীর্থক্ষেত্রসমূহ তাঁহার বিশেষরূপে জানা ছিল। তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি অন্যান্য গৌড়ীয় সহযাত্রীদিগেরও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য আগ্রহের সীমা নাই, তাঁহারাও সঙ্গে চলিতে চাহিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব কাহাকেও সঙ্গী করিতে রাজী হইলেন না। শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ লইবার জন্য তিনি নিঃসম্বল একাকী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সার্বভৌম ও অন্যান্য সকলের বিশেষ অনুরোধে শেষে সন্ন্যাসীদিগের অনুচর ব্রহ্মচারী

---

১ যাবৎ স্যাচ্চঞ্চলং চিত্তং ন স্যাদ্ যাবৎ সুনির্মলং
তাবৎ তীর্থানি পুণ্যানি বিচরেৎ সর্বতঃ পুমান্।
ততঃ সুনির্মলে চিত্তে স্থিতধী পুরুষোত্তমে
নিবাসং কুরুতে নিত্যং পথিক সাশ্রয়ে যথা॥

—চৈতন্য-চরিত (মুরারি গুপ্ত)

হিসাবে কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন।[১] ভক্তগণ বিদেশে ভ্রমণকালে সুখসুবিধার জন্য তাঁহার সঙ্গে অত্যাবশ্যক দ্রব্য দিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কিছু দিতে নিষেধ করিলেন এবং সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র॥"

বর্তমান কালের ন্যায় তখনকার দিনে চলাচলের এত সুবিধা—রেল ষ্টীমার মোটরগাড়ী উড়োজাহাজ প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহন না থাকিলেও বহু লোকে পদব্রজেই সারা ভারত পর্যটন করিয়া তীর্থাদি দর্শন করিতেন। সে সময়েও পথিকের সুবিধার জন্য সমস্ত দেশ জুড়িয়া সুপ্রশস্ত রাজপথ বিদ্যমান ছিল। পথিকগণের আরামের জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে অশ্বত্থ বট আম্র নিম্ব প্রভৃতি সুশীতল ছায়াপ্রদ ঘনপল্লব বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করা হইত। বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে জলাশয়, পান্থশালা সরাই-চটী নির্মিত হইত। সাধু-সন্ন্যাসী, গরীব-দুঃখী, পথিকের জন্য সদাশয় ধনী ব্যক্তিগণ সদাব্রত অতিথিশালা মন্দির দেবায়তন উদ্যানাদি প্রতিষ্ঠা করিতেন। এখনও দেশের সর্বত্রই সেই সকল প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর দৃষ্টিতে অতিথি দেবতার ন্যায় পূজ্য, অতিথি বিমুখ হইলে গৃহস্থের মহা অকল্যাণ। তাই সকলেই যথাসাধ্য অতিথিকে সেবা করিত। এজন্য তীর্থযাত্রী পথিকের কোথাও তেমন অসুবিধা বা কষ্টভোগ করিতে হইত না। মুসলমান আক্রমণের পর হইতে উত্তর ভারতে দেশের অভ্যন্তরে সময় সময় রাজনীতিক বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ-বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ থাকিলেও দক্ষিণ দেশ শান্তিপূর্ণই ছিল। উত্তর ভারতেও তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীর উপর সহসা কোন প্রকার উপদ্রব বা অন্যায় অত্যাচার হইত না। এমনকি মুসলমান শাসকগণও এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

প্রদেশবিশেষে কথ্যভাষা পৃথক পৃথক হইলেও সর্বত্রই এমন একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন ছিল যাহার সাহায্যে পরস্পরের সহিত মোটামুটি ভাবের আদান-

১ "তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥"

প্রদান চলিত। বর্তমান কালের হিন্দুস্থানীর ন্যায় প্রাচীনকালে 'প্রাকৃত ভাষা' প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। সমাজের উচ্চস্তরে সারা ভারতেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা ছিল। ইহারই ফলে এই সুবৃহৎ দেশের স্থান-বিশেষে লিখিত গ্রন্থ বা প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িত। আবার সাধু-সন্ন্যাসী, পাণ্ডা-পর্যটক অনেকেরই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে অল্পবিস্তর ব্যুৎপত্তি থাকিত। পদব্রজে স্থানে স্থানে দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া চলিতে চলিতে তাঁহাদের বিভিন্ন স্থানের চলতি কথাবার্তা অনেকটা আয়ত্ত হইয়া যাইত। এখনও এইরূপ পরিব্রাজক সাধু দেখা যায়, যাঁহারা বিশেষ লেখাপড়া না জানিলেও পাঁচ-সাতটি প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারেন। কাজেই চৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারে, আমাদের বর্তমান সময়ের দুরবস্থার ন্যায় বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই ইহা নিশ্চিত।

শ্রীশ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করতঃ শুভক্ষণে চৈতন্যদেব পুরী হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রের কিনারে কিনারে চলিয়া সেদিন আলালনাথে [১] আসিয়া রাত্রিবাস হইল। ভক্তসঙ্গে নিত্যানন্দ আলালনাথ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। পরদিন ভোরবেলা প্রেমালিঙ্গনান্তে সাশ্রুনয়নে সন্ন্যাসীকে বিদায় দিয়া তাঁহারা পুরী অভিমুখে ফিরিলেন; আর সৌম্য শান্ত যতিরাজ সঙ্গী সেবক সহ ধীরে ধীরে দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। ভগবানের নাম কীর্তন ও স্মরণ-মনন করিতে করিতে চৈতন্যদেব পূর্বের ন্যায় ভিক্ষান্নে উদর পূরণ এবং আশ্রমে দেবালয়ে কিংবা ভক্তসজ্জনের গৃহে রাত্রি কাটাইয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন স্থান, তীর্থ, মন্দির ও দেববিগ্রহাদি দর্শন, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ, পণ্ডিত গুণী-মানী ব্যক্তিগণের সহিত সদালাপ, স্বধর্মনিষ্ঠ ভক্ত সদ্‌গৃহস্থগণ-সঙ্গে ধর্মচর্চা করিয়া এবং বিভিন্ন স্থানের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ দেখিয়া মনে খুব আনন্দোল্লাস জন্মিল।

তিনি যেখানে উপস্থিত হন, তাঁহার সেই উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, দিব্য দেহ-কান্তি এবং ভগবৎপ্রসঙ্গে অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। পরস্পরের মুখে শুনিয়া, এই অসামান্য সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য সর্বত্রই লোকের ভিড় লাগিয়া থাকে। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু, সকলের নমস্য। সর্বত্রই লোক সাক্ষাৎ নারায়ণ-মূর্তি সন্ন্যাসীকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া উপদেশ-

---

১ পুরী হইতে ৬।৭ ক্রোশ দূরে আলালনাথ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখানে বাসুদেবের মন্দির আছে বলিয়া শোনা যায়। আবার উহার সন্নিকটে ঐ অঞ্চলে আলালনাথ নামক সুপ্রসিদ্ধ এক শিবের মন্দিরও আছে।

প্রার্থী হয় এবং আশীর্বাদ মাগে। প্রেমিক সন্ন্যাসীও সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান-পূর্বক সমাদরে গ্রহণ করেন এবং সৎপথে থাকিয়া স্বধর্মপালন, নিষ্ঠা-ভক্তি সহকারে ভগবানের ভজন ও নামকীর্তন করিবার জন্য উপদেশ দেন। তিনি যখন মধুর বাক্যে সকরুণ দৃষ্টিতে মনঃপ্রাণ মোহিত করিয়া লোককে ধর্মোপদেশ দেন, তখন সকলেরই মনে এক প্রবল ধর্মপ্রেরণা জাগ্রত হয়। স্থানে স্থানে লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া উচ্চ হরি-সংকীর্তন করেন। কীর্তনে তাঁহার দিব্য ভাবের প্রকাশ দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হইয়া ভাবে, "এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী কে?" আবার কখনও কখনও প্রেমে বিগলিত হইয়া তিনি কোন কোন ভাগ্যবানকে আলিঙ্গন করতঃ চিরকালের জন্য 'আপনার জন' করিয়া লন। কোন কোন স্থানে ধর্মদ্বেষী নাস্তিক ব্যক্তিগণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। অধিকাংশ স্থলেই ঐ সকল পাণ্ডিত্যাভিমানিরা তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানে, শানিত যুক্তি-বিচার ও তত্ত্ববস্তুর অপরোক্ষ অনুভবজনিত অলৌকিক শক্তিতে পরাস্ত হইয়া মস্তক অবনত করে; অনেকেই তাঁহার মতানুবর্তী হইয়া আশ্রয় লয়। এইভাবে ধর্ম-প্রচার করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি গঞ্জাম জেলায় কূর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

কূর্মক্ষেত্র অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সেখানে ভগবানের কূর্মবিগ্রহ বর্তমান রহিয়াছে। চৈতন্যদেব দর্শনাদি করিয়া অতীব আনন্দিত মনে তথায় অবস্থান করিলেন। সেই কূর্মক্ষেত্রে বাসুদেব নামক জনৈক ভক্ত বাস করিতেন। পূর্ব কর্মফলে বাসুদেবের দেহ নিদারুণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে পচিয়া গিয়াছিল। এমনকি সেই পচা ঘায়ের মধ্যে পোকা জন্মিয়াছিল। ভক্ত বাসুদেব আপন প্রারব্ধ ফল জানিয়া সেই ভীষণ কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করতঃ ভগবদ্-ভজনে কালাতিপাত করিতেন। কথিত আছে, কোন কারণবশতঃ তাঁহার দেহের ক্ষত হইতে কোন পোকা নীচে পড়িয়া গেলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আবার স্বস্থানে রাখিয়া দিতেন। চৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য চারিদিকে লোকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার নাম শুনিয়া বাসুদেবও দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু ভিড়ের জন্য ভালরূপ দর্শন হইতেছে না, অথচ নিজের অস্পৃশ্যতার জন্য অগ্রসরও হইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ চৈতন্যদেবের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। জহুরীই জহর চিনিতে পারেন; চৈতন্যদেব ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং বাসুদেবের পুনঃপুনঃ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। ভক্তিপ্রেমে বাসু-দেবের অন্তর বিগলিত হইল, উপস্থিত লোকেরাও এই মহান দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। চৈতন্যদেব বাসুদেবকে কৃতার্থ করিলেন; ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহাকে সর্বদা নাম কীর্তন করিতে উপদেশ দিলেন। পরে বাসুদেব

একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেবের পুণ্যস্পর্শে তাঁহার কুষ্ঠাক্রান্ত দেহ নিরাময় সুন্দর সুস্থ ও সবল হইয়াছিল।

কূর্মক্ষেত্র হইতে চলিয়া সন্ন্যাসী সীমাচলম্ (ওয়ালটেয়ারের নিকটে সিংহাচলম্) তীর্থে শ্রীশ্রীনৃসিংহ ভগবান দর্শন করিলেন। উচ্চ পর্বতের উপর অতি মনোরম প্রদেশে নৃসিংহ দেবের মন্দির। ঐ স্থানকে নৃসিংহক্ষেত্র বা প্রহ্লাদপুরীও বলে। সেখানে ভগবানের সেবাপূজার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। চৈতন্যদেব ভক্তিপ্রেমে পুলকিত হইয়া এবং নৃসিংহদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনান্তর বিদায় লইলেন এবং দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমে গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে পেঁৗছিলেন।

বিদ্যানগর[১] তখন উড়িষ্যারই অন্তর্ভুক্ত। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে রামানন্দ রায় সেই দেশ শাসন করিতেন। রামানন্দ রায় পুরীর অধিবাসী। তাঁহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই পুরীতে বাস করিতেন। পুরীতে অবস্থানকালে সার্বভৌমের নিকট চৈতন্যদেব ভক্তিতত্ত্ববিৎ রামানন্দের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ একদিকে যেমন বিচক্ষণ রাজ-নীতিক, প্রতাপান্বিত প্রজারঞ্জক শাসনকর্তা; অন্যদিকে তেমনই অসাধারণ পণ্ডিত, যথার্থ তত্ত্বদর্শী ও প্রেমিক-ভক্ত। সাধন-ভজনের বলে সিদ্ধভক্ত রামানন্দ জীবন্মুক্ত অবস্থায় সংসারে বাস করিতেন। পূর্বে প্রেমিকভক্ত রামানন্দের ভগবদ্‌ভক্তি ও প্রেমভাবের উপর পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্বভৌমের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, বরং তিনি ঐ সকলকে তাচ্ছিল্যই করিতেন। চৈতন্যদেবের কৃপায় এখন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় পূর্বভাবের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তাই পুরী হইতে যাত্রাকালে সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে রামানন্দ রায়ের ভক্তিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি এবং সাধন-ভজনের ফলে তাঁহার অপূর্ব উপলব্ধির বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন বিদ্যানগরে রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে খুব আনন্দ পাইবেন এবং ভক্তিমার্গ ও সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক উচ্চ তত্ত্ব শুনিতে পাইবেন।

বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেব গোদাবরীতে স্নান করিলেন। স্নানান্তে ঘাটের সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি স্থানে বসিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ পালকিতে চড়িয়া স্নানের জন্য ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অগ্রে বহু ব্রাহ্মণ বেদধ্বনি করিতেছেন, পশ্চাতে

১ বিদ্যানগর—বর্তমান রাজমাহেন্দ্রীর নিকটবর্তী স্থান। রাজমাহেন্দ্রীর দক্ষিণে গোদাবরীর অপর পারে কবুর নামক স্থানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়।

বহু বাদ্যকর বিবিধ বাজনা বাজাইতেছে। পারিষদ, শরীররক্ষী সৈন্যদল ও ভৃত্যগণসহ রাজোচিত ভাবে আসিয়া রামানন্দ রায় ঘাটে অবতরণ করিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নানাহ্নিক-দানাদি কার্য সুসম্পন্ন করিলেন। সমারোহ এবং লোক ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন, ইনিই এখানকার শাসনকর্তা রায় রামানন্দ। কর্তব্যকর্ম সমাপনান্তে রায় ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অদূরে সুখাসনে সমাসীন, তেজপুঞ্জঃকায় নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহাব নেত্র আকৃষ্ট হইল। রায় দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া অতিশয় ভক্তিভরে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসীও ভগবানের নাম উচ্চারণ কবতঃ তাঁহাকে যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শুভেচ্ছা প্রকাশ করিয়া সন্ন্যাসী জানিতে চাহিলেন, তিনিই রায় রামানন্দ কিনা। যখন শুনিলেন ইনিই রামানন্দ রায়, তখন অতিশয় পুলকিত হইয়া রায়কে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "পুরীতে সার্বভৌম আপনার মহত্ত্বের কথা আমাকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছেন, আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।" প্রেমের স্পর্শে উভয়ের অন্তরে ভাবের উদয় হইল, দেহে পুলক অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভাবে বিভোর হইয়া গদগদ স্বরে,—

> "রায় কহে সার্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
> পরোক্ষেও মোর হিতে হয় সাবধান ॥
> তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন।
> আজি যে সফল মোর মনুষ্যজনম ॥
> কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
> কাঁহা মুঁই বাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥"

উপস্থিত লোকজন অতীব বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—

> "এই ত সন্ন্যাসী দেখি তেজ ব্রহ্মসম।
> শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন ॥
> এই মহারাজ মহা পণ্ডিত গম্ভীর।
> সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থিব ॥"

এইভাবে প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর রামানন্দ চৈতন্যদেবকে দিন-কয়েক বিদ্যানগরে অবস্থান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাহাতে সম্মত হইলে তাঁহার 'আসনের' জন্য মনোরম একান্ত স্থান ও অন্যান্য সুব্যবস্থা হইল। রায়ের সঙ্গী জনৈক ব্রাহ্মণ অতি বিনীতভাবে সন্ন্যাসীকে

তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুসারে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণগৃহে গেলেন, রায়ও প্রণামানন্তর বিদায় লইয়া স্বীয় আবাসে চলিলেন।

রায়ের অবসর বড় কম, দৈনন্দিন রাজকার্যেই সমস্তদিন কাটিয়া যায়। ভক্তিমান ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদেব স্বীয় আসনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে কর্তব্যকর্ম হইতে অবসর লইয়া রায় তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সার্বভৌমের নিকট প্রশংসা শুনিয়া চৈতন্যদেবের মনে রামানন্দের নিকট হইতে ভক্তির উচ্চতত্ত্ব ও ভজন-প্রণালী জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ছিল; এখন রায়কে নিভৃতে নিকটে পাইয়া সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রায় অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু, আমি গৃহস্থাধম বিষয়ী; আমিই আপনার নিকট ভগবানের কথা শুনিতে চাই। কৃপা করিয়া আমাকে ভবসাগর পার হইবার রাস্তা প্রদর্শন করুন।"

"প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্বভৌম সনে মোর মন নির্মল হইল।
কৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব কথা তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে, আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা॥
তোমার স্থানে আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিযা॥
সন্ন্যাসী জানিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"

চৈতন্যদেবের বারংবার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া রায় শেষে সম্মত হইলেন। চৈতন্যদেব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং রায় শাস্ত্রপ্রমাণ সহ ভক্তি ও ভগবদ্‌তত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে উভয়ের কথোপকথন অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। উহা হইতে চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিমার্গের সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষরূপে জানা যায়। রামানন্দের নিকট প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ স্বীয় অনুভব ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত মিলিতেছে দেখিয়া চৈতন্যদেব পরে উহা তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও তৎপ্রদর্শিত মার্গের প্রধান প্রচারক শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখানে রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল ঃ

"প্রভু কহে, পড় শ্লোক, সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥
প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার ॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্যসার ॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, দাস্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার ॥
প্রভু কহে, এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার ॥
প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার ॥
প্রভু কহে, এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, কান্তভাব সর্ব সাধ্যসার ॥"

.. ..

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥"

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ভক্তিমার্গের আরম্ভ হইতে সর্বোচ্চ সাধনার কথা বলা হইয়াছে। প্রথমে স্বধর্মাচরণ, স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্তব্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে সুসম্পন্ন করিলে ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মে। তৎপরে ঐ সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ভগবানে অনুরাগ বাড়িতে থাকে। তাঁহাতে অনুরাগ জন্মিলে ঐ সকল কর্ম অর্থাৎ বর্ণ-আশ্রমোচিত ধর্মত্যাগ হইয়া একমাত্র তাঁহার প্রতিই মন ধাবিত হয়। ইহার পরের অবস্থায় সাধক ভক্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভগবানেরই ভজনে তৎপর হন, উহাই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। আরও অগ্রসর হইলে, যতই মনে অনুরাগ বাড়ে, ততই বিচার-বিধি কমিয়া যায়, ইহার নাম (জ্ঞানশূন্যা) শুদ্ধাভক্তি। তৎপরে অনুরক্ত ভক্তের অন্তরে ভগবানের প্রতি মমত্ববোধ জন্মে, তখন তিনি ভগবানকে

অতিশয় আপনার জন বলিয়া বোধ করেন; ইহার নাম শান্তপ্রেমাভক্তি। ভক্তের অন্তরের ভাব অনুসারে প্রেমাভক্তিতে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর পঞ্চবিধ রসের বিকাশ হয়। পর পর ভাবে রস-মাধুর্যের বিকাশ অধিকতর হয়। প্রেমের সর্বোচ্চ প্রকাশ গোপীপ্রেমে—কান্তাভাবে ভজনে। তন্মধ্যে আবার রাধাপ্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট। এই সকল তত্ত্ব রামানন্দ রায় শাস্ত্রপ্রমাণসহ চৈতন্য-দেবের নিকট বিবৃত করেন। স্বধর্মাচরণ হইতে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি-বিধিবাদীয় উপাসনা পর্যন্ত ভজন-ভক্তির বাহ্যাবরণ—বহিরঙ্গ। এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া গেলে প্রেমাভক্তির সন্ধান মিলে। শুদ্ধাভক্তির ফলে ঐশ্বর্যবোধ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভগবানের মাধুর্য-স্বরূপের অনুভব হয়।

ইহার পরে, চৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিলে রামানন্দ শাস্ত্রপ্রমাণ সহকারে তাহা বিবৃত করেন।

চৈতন্যদেব—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কি?

রায়—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণঃ ॥"

—ব্রহ্মসংহিতা

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, সর্বজগতের আশ্রয় (মূলসত্তা) পরমাত্মা পরব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দমূর্তি, যিনি সকলের আদি, কিন্তু যাঁহার আদি অন্য কিছু নাই, সর্বপ্রপঞ্চের কারণীভূতা মায়ারও কারণ যিনি, সেই গোবিন্দই শ্রীকৃষ্ণ।

চৈতন্যদেব—শ্রীশ্রীরাধার স্বরূপ বর্ণনা করুন।

রায়—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"

—বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র

নিখিল সৌন্দর্য নিখিল ঐশ্বর্যের আধারভূতা, ত্রৈলোক্য বিমোহিনী, সর্বাতীতা, সর্বপালিকা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্না, তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই দেবী রাধিকা বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিতা।

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনী সার অংশ ধরে প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥"

... ...

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধবে দুই রূপ ॥"

চৈতন্যদেব—বিভিন্ন ভাবের মধ্যে উপলব্ধির তারতম্য আছে কি?

রায়—"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ আছয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যাঁর যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥"

চৈতন্যদেব—কোন ভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক মাধুর্যের আস্বাদ হয়?

রায়—কান্তাভাবে, মধুররসের ভজনাতেই সর্বাপেক্ষা মাধুর্য বেশী।

চৈতন্যদেব—কান্তাভাবে উপাসনার প্রণালী কি?

রায়—শ্রীমতী রাধারাণীর কোন সখীর ভাব আশ্রয় করিয়া সাধনা করিলে ঐ তত্ত্ব স্ফুরিত হয়।

"সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাহা যেই করে গতাগতি ॥
'রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা' সাধ্য যেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

চৈতন্যদেব—আপনি বলিলেন—কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে রাধারাণীই শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁহার ভাব গ্রহণ না করিয়া তাঁহার সখীগণের ভাব আশ্রয়ের কারণ কি?

রায়—প্রেমিক ভক্ত নিজ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় প্রেমময় ভগবানের ভজন করেন না। কেবলমাত্র প্রেমাস্পদের অধিকতর সুখ-বাঞ্ছাতেই নিষ্কাম প্রেমের পরিচয়। রাধারাণীর প্রেমে কৃষ্ণের অধিক উল্লাস জানিয়া সখীগণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের মিলন ও যুগলমূর্তির সেবা। সখীগণের এই নিষ্কাম ভজনই ভক্ত সাধকের আদর্শ। গোপী-প্রেম কামগন্ধহীন।

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পলতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতারে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥"

চৈতন্যদেব—কাম-প্রেমে কি তফাৎ? (গোপীপ্রেম কামগন্ধহীন কিরূপে?)

রায়— "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

. ..

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাল ক্রীড়া শাম্যে তারে কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য গোপীভাব বর্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নহে গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

প্রেমভক্তির সাধনায় সিদ্ধ সাধকের এই দেহেতে আর আত্মবুদ্ধি থাকে না, ভাবানুযায়ী প্রাপ্ত চিন্ময় দেহে ভগবানের আনন্দ সম্ভোগ করেন।

"দেহ স্মৃতি নাহি যাঁর, কাম কূপ কাহা তাঁর?"

ঈশ্বরেচ্ছায় জীবনধারণের নিমিত্ত তাঁহাদের শারীরিক ব্যবহার আহার নিদ্রাদি কুম্ভকার-চক্রের ন্যায় পূর্বাভ্যাসে চলে।

চৈতন্যদেব—এইরূপে ভাবে তন্ময় হইয়া ভজন করিলে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে আর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম উপাসনাদি করা ত সম্ভব হইবে না মনে হয়।

রায়—"সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তিবিগলিত চিত্তে গদগদস্বরে প্রেমিক-শিরোমণি রায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও তাহার উপলব্ধির উপায় বর্ণনা করিলে, শুনিতে শুনিতে চৈতন্যদেবের অন্তরের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল, মন অন্তর্মুখী হইল এবং দেহে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার ঐসকল অদ্ভুত ভাব দেখিয়া রায় অতীব

বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া চৈতন্যদেব আরও উচ্চ-তত্ত্ব--গভীরতমভাব শুনিবার আশায় বলিলেন, "এহো হয়, আগে কহ আর।"

ইহার উপরেও শুনিতে ইচ্ছুক কেহ থাকিতে পারে? রায় এতদিন সেই-রূপ অধিকারী দেখেন নাই; কাজেই চৈতন্যদেবের প্রশ্নে চমৎকৃত হইয়া—

"রায় কহে আর বুদ্ধি গতি নাহিক আমার!
যেবা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত এক হয়।
তাহা জানি তোমার সুখ হয় কিনা হয় ॥"

এই কথা বলিয়া রায় 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' ভাব বুঝাইবার জন্য স্বকৃত একটি পদ শুনাইতে আরম্ভ করিলেন,—

"এত কহি আপন কৃত গীত গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁহার মুখ আচ্ছাদিল ॥
প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥"

এই 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার ঐ অবস্থা বুঝাইবার জন্য, প্রেমাভক্তির লক্ষণ পরিচায়ক অলংকারশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ, 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই শ্লোকটির ভাব বাধা-কৃষ্ণ উভয়ের চিত্ত প্রেমে বিগলিত হইয়া মিশিয়া গিয়া একীভূত অপরূপ আকার ধারণ করতঃ অপূর্ব শোভায় ত্রিভুবন চমৎকৃত ও মোহিত করিয়াছে।[১] রামানন্দ স্বকৃত যে পদ শুনাইয়াছিলেন উহাতে আছে,—

"ন সো রমণ, ন হাম রমণী।
দুঁহো মন মনোভাব পেষল জানি ॥"

—ইহার অর্থ, প্রেমের চরম অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ দেহাত্মবুদ্ধির অভাব, ভেদ-বুদ্ধির বিলোপ। বিবর্ত শব্দের অর্থ, এক বস্তুর অন্য প্রকারে প্রতীতি। যেমন রজ্জুর সর্পাকারে কিংবা শুক্তির রজতাকারে প্রতীয়মান হওয়া। এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' এই কথায় বুঝা যায়—কান্তাভাবের—মধুর রসের, ভজনের 'আগে'র কথা, প্রেমাস্পদের সঙ্গে পূর্ণ মিলনে পুং-স্ত্রী বুদ্ধির লয়,—

১ "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্যোদরে,
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারু কৃতী।"
—উজ্জ্বলনীলমণি

অভেদ উপলব্ধি। এই অদ্বয় অনুভবই ভক্তি মার্গের চরম। ইহা সাধ্যবস্তুর অবধি হইলেও প্রথম অবস্থায় প্রবর্তকের পক্ষে উপাস্য-উপাসক ভাবের অনুকূল নহে বলিয়া উহার আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ, কারণ উহা ভক্তিভজনের প্রতিকূল হইতে পারে। উহা অতি গোপনীয় বস্তু, সম্ভবতঃ সেইজন্যই চৈতন্যদেব শুনিতে ইচ্ছা করেন নাই; অথবা এই অবস্থা বাক্যমনের অতীত, উপলব্ধিগম্য, অতএব আলোচ্য নহে। 'নানা মুনি' আরও নানাভাবে 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' ব্যাখ্যা করিলও পূজ্যপাদ 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-কারের ব্যাখ্যাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য। প্রথমতঃ এই প্রসঙ্গ—চৈতন্যদেব ও রামানন্দ রায়ের তত্ত্বালোচনার বিবরণ 'চরিতামৃত'কারের দ্বারা প্রদত্ত। দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্যদেবের প্রধান অন্তরঙ্গ মর্ম-সঙ্গী দামোদর স্বরূপ। স্বরূপ দামোদরের আশ্রিত রঘুনাথ দাস এবং রঘু-নাথের আশ্রিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রঘুনাথ স্বয়ং চৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং স্বরূপ দামোদরের মুখে বিশেষরূপে শুনিয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী, এই রঘুনাথের নিকট হইতেই তাঁহার গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, কৃষ্ণদাস স্বয়ং মহা-পণ্ডিত, দার্শনিক-শিরোমণি, ভজনশীল অনুভব-সম্পন্ন ব্যক্তি।

এই সম্বন্ধে আমাদের এত বেশী আলোচনা করিবার প্রয়োজন এই যে, চৈতন্যদেব তাঁহার শ্রীমুখে বারংবার বলিয়াছেন, "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ", কাজেই ইহা নিশ্চিত যে সর্বোচ্চ অনুভব, সকলের 'আগে'র তত্ত্ব, 'সাধ্যবস্তু-শিরোমণি' এই 'অভেদ' উপলব্ধি। তথাপি, এই 'অভেদ' 'অদ্বয়' শব্দ শুনিলেই অনেকের বিস্ময় জন্মে, মনে শঙ্কা উপস্থিত হয়। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের এই অংশ নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিবেন।

সমুদ্র মাপিতে গিয়া নুনের পুতুলের সমুদ্রের সঙ্গে 'তদাকারাকারিত' হওয়ার ন্যায়, ভজনশীল ভক্তও ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে, 'অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ববস্তু' উপলব্ধি করিয়া একীভূত হন। কিন্তু ভক্তের নিকট এই অবস্থার আলোচনা আদরণীয় নহে। ভক্ত সেব্য-সেবক ভাবে তাঁহাকে পৃথক জানিয়া সেবা করিতেই ভালবাসেন। এই সেবার আনন্দে মাধুর্যেই তাঁহার চিত্ত ভরপুর। ভক্তের ভাব, 'চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।' এমনকি ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ আচার্য শঙ্কর পর্যন্ত এই ভাবেরই প্রেরণায় গাহিয়াছিলেন,—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"

হে নাথ! তোমাতে আমাতে (চরমে) অভেদ হইলেও 'তোমার'ই আমি, 'আমার' তুমি কখনই নও, কেননা (সমুদ্র-তরঙ্গ অভেদ হইলেও) সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র কখনই হইতে পারে না। সম্ভবতঃ সেইজন্যই ভক্তি-গ্রন্থে উহার অধিক আলোচনা দেখা যায় না। সুমধুর তত্ত্বরসে মগ্ন হইয়া রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেব উভয়েই দেশ-কাল বিস্মৃত হইলেন—দীর্ঘ রাত্রি নিমেষের ন্যায় কাটিয়া গেল। ভোর হইলে তাঁহাদের চমক ভাঙিল। রায় প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন—চৈতন্যদেব প্রেমালিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।

রায়ের অত্যধিক আগ্রহে চৈতন্যদেব বিদ্যানগরে দশ দিন অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন। রায় সমস্ত দিন স্বীয় কর্তব্য রাজকর্ম সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যার পরে চৈতন্যদেবেব সঙ্গে মিলিত হইতেন; আর তখনই ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়া ভক্তিশাস্ত্রের ও ভজনমার্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা এবং রস-মাধুর্যের বিস্তারে রাত্রি কাটিয়া যাইত; তাঁহারা বুঝিতেও পারিতেন না। রায়ের মুখে চৈতন্যদেব যে সকল তত্ত্ব কথা শুনিলেন, উহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে, কারণ তিনি পূর্বেই এই সকল ভাব নিজ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও এখন রায়ের মুখে শাস্ত্রপ্রমাণসহ ঐ সকল তত্ত্ব সম্প্রদায়ক্রমে প্রাচীন আচার্য-পরম্পরা উপদিষ্ট দার্শনিক প্রণালীতে সুবিন্যস্তরূপে পাইয়া এবং নিজের অনুভবের সহিত মিলাইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। রায়ও বুঝিতে পারিলেন, এই সন্ন্যাসী বয়সে নবীন হইলেও ভক্তি ও জ্ঞানে প্রবীণ। বিশেষতঃ ভগবৎপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের দেহে অদ্ভুত ভাবাবেশ ও সাত্ত্বিক বিকারসমূহের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া তাঁহার চিত্তে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। এরূপ উচ্চ অবস্থার প্রকাশ ইতঃপূর্বে তিনি কখনও কোন মনুষ্যশরীরে দেখেন নাই। রামানন্দ শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন, প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে শাস্ত্রে যে সকল লক্ষণের বর্ণনা আছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তিতে শাস্ত্রে যে সকল লক্ষণ বিরাজিত, সেই 'মহাভাব-রসরাজ'[১] এই সন্ন্যাসী মূর্তিতে বিরাজমান। প্রেমে পুলকিত হইয়া রায় বারংবার সন্ন্যাসীর পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিলেন এবং ভক্তিগদগদস্বরে স্বীয় অনুভব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! তোমাকে দেখিয়া প্রথমে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মনে করিয়াছিলাম; এখন বুঝিয়াছি জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছ। আমাদের ভুলাইবার জন্য কালো বরণকে গৌর বরণে ঢাকিয়া আসিয়াছ।"

---

১ ভক্তিশাস্ত্রোক্ত দার্শনিক পরিভাষা ঃ শ্রীশ্রীরাধা—মহাভাব, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—রসরাজ।

'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ়কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
অনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার ॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥
প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে অন্যজন ॥"

চৈতন্যদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহানুভবের পক্ষে এইরূপ উপলব্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ শাস্ত্রে আছে তত্ত্বদৃষ্টিপরায়ণ উত্তম ভক্তগণ সর্বত্রই ভাগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

"প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফূরণ ॥
স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥"

দেখিতে দেখিতে দশ দিন অতীত হইয়া গেল, চৈতন্যদেব বিদায় চাহিলেন। কিন্তু রায়ের প্রাণ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। চৈতন্যদেব রায়কে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি রামেশ্বর প্রভৃতি দক্ষিণদেশের তীর্থ ও মঠমন্দির-সমূহ দর্শন করিতে বাহির হইয়াছি; যাত্রা সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নীলাচলেই বাস করিবার ইচ্ছা আছে। আপনি সেই সময় পুরীতে গেলে, পরমানন্দে একসঙ্গে বাস করা যাইবে।" রায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে চরণে পতিত হইলেন; চৈতন্যদেব তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

বিদ্যানগর হইতে বাহির হইয়া সেবকসঙ্গে চৈতন্যদেব প্রসিদ্ধ তীর্থ, মঠ-মন্দিরসমূহ দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী সর্বত্রই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত, পণ্ডিত, সাধু, গৃহস্থ ও সজ্জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিয়া সকলের ভিতর ভগবদ্‌ভক্তি উদ্বোধিত করেন। তাঁহার প্রভাবে সর্বত্রই বহু লোকের জীবনধারা পরিবর্তিত হইল। আচার্য শঙ্করের প্রভাবে জৈন-বৌদ্ধগণ সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তখন পর্যন্ত দেশের নানা স্থানে অনেক বৌদ্ধমঠ বর্তমান ছিল। ঐ সকল মঠে ত্যাগ-তপস্যার ভাব বিশেষ প্রবল না থাকিলেও বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ কূটতর্ক সহায়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। বিদ্যানগর হইতে অগ্রসর হইয়া অন্ধ্রদেশের তীর্থ ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিবার কালে, এক সময়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে এই প্রকার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সুদীর্ঘ বিচার হয় এবং বিচারে পরাস্ত হইয়া বৌদ্ধগণ তাঁহার মত স্বীকার করেন। ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধগণের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়াতে, তাঁহারা কালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া হিন্দুসমাজে একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন। এখন আর তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই।

অনেক লোকের ধারণা, দশনামী সন্ন্যাসীরা শিবভক্ত এবং বিষ্ণুদ্বেষী ; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। সনাতন ধর্মে সূর্য, গণেশ, শিব, শক্তি, নারায়ণের উপাসনা আবহমানকাল প্রচারিত। আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষকে বৌদ্ধপ্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া আবার সেই প্রাচীন শ্রৌত-স্মার্ত ধর্মেরই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবর্তী সন্ন্যাসীরা সেই মতই অনুসরণ করেন। তাঁহার পরবর্তীকালেই অপর সাম্প্রদায়িক আচার্যগণের দ্বারা শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ মার্গ (পন্থানুগ ধর্ম) ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্বেষবিহীন ঐ সকল আচার্যের প্রবল ইষ্টনিষ্ঠাই ঐরূপ পৃথক প্রণালী প্রবর্তনের হেতু হইলেও, কালদোষে উহা ক্রমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম ইত্যাদি নামে পরিচিত হইয়াছে। আবার কালে কালে, ঐ সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই কত অবান্তর ভেদ দেখা দিতেছে। যদিও উহারা সকলেই শ্রুতি-স্মৃতির দোহাই দিয়া আপনাদিগকে 'সনাতনী' প্রতিপন্ন করেন, তথাপি উঁহাদের সাম্প্রদায়িকতা

বেদানুমোদিত নহে। আচার্য শঙ্করের উদার অন্তরের পরিচয় তাঁহার রচিত বিভিন্ন স্তোত্রাবলীতে, তীর্থ সকলের উদ্ধারে এবং নানা দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। সন্ন্যাসি-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর অন্তরের ভাবও স্বীয় সম্প্রদায়-গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল। প্রেম-ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। সেই 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দনেরই' বিভিন্নরূপে সর্বত্র প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইতেন এবং সমুদয় বিগ্রহকেই সমানভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে দর্শন-পূজা-প্রদক্ষিণাদি করিতেন। তাঁহার যাত্রাকালে দেখা যায়, রাস্তায় চলিতে চলিতে ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমভরে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছেন, "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।" আবার শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, "কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।" মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে পূজা করিতেছেন।

"মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর
টলমল করে প্রভু নাহি রহে স্থির ॥"

—চৈতন্যভাগবত

"নিজহাতে বিল্বদল তুলি প্রভু মোর।
অঞ্জলি দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর ॥"

সেইভাবেই, জগজ্জননীর মূর্তি দর্শন করিয়া, ভাবে বিহ্বল হইয়া স্তুতি করিতেছেন।

"পদ্মকোটে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী।
সেইখানে গিয়া প্রভু করিলা প্রণতি ॥
বহু স্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়।
দেখিতে তাঁহারে শত শত লোক ধায় ॥"

—গোবিন্দ দাসের কড়চা

এইরূপে নানাস্থানে ভগবানের নানা মূর্তি দর্শন করিয়া ক্রমে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ মল্লিকার্জুনে (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম) উপস্থিত হইলেন। মহেশ দর্শন করিয়া মনে অতিশয় আনন্দের সঞ্চার হইল। তথা হইতে অহোবল নামক স্থানে নৃসিংহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবটে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত এক ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহেই রাত্রিবাস করিলেন। পরম ভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে সমস্ত রাত্রি খুবই আনন্দে অতিবাহিত হইল। সেখান হইতে স্কন্দ ক্ষেত্রে গিয়া ভগবান স্কন্দকে দর্শনান্তর ত্রিমঠ নামক স্থানে ত্রিবিক্রম (বিষ্ণু)

দর্শনে গমন করিলেন। ত্রিবিক্রম দর্শনান্তে ফিরিয়া পুনরায় সিদ্ধবটে আসিয়া সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহেই বিশ্রাম করিলেন; কারণ সিদ্ধবট হইয়াই মূল গন্তব্য পথ চলিয়াছে। পূর্বে যখন ভক্ত-ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়া ভগবানের অন্য কোন নাম গ্রহণ করেন না। এবার তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতে পাইয়া বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভাবপরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তিমান ব্রাহ্মণ বিনয়নম্রভাবে মধুর বচনে বলিলেন,

"'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥"

—পদ্মপুরাণ

অনন্তসচ্চিদানন্দ পরমাত্মাতে যোগীরা রমণ (ক্রীড়া) করেন, এইজন্য 'রাম' শব্দে পরব্রহ্মই উক্ত হন। সেইরূপ,

'কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥'

—শ্রীমদ্ভাগবত

ভূবাচক 'কৃষ্' ধাতু সর্ব আকর্ষক সত্তা এবং 'ণ' শব্দ দ্বারা সর্বোপরমরূপ পরমানন্দ বুঝা যায়। এই উভয়ের যোগে নিষ্পন্ন 'কৃষ্ণ' পদ দ্বারাও সর্বজগতের মূল সত্তা, সর্বাকর্ষক পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন। অতএব 'রাম' 'কৃষ্ণ' এই দুই নাম সমভাবেই পরব্রহ্মকে বুঝায় সত্য; তথাপি

'ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাইয়া সেই নাম নিরন্তর গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল।
তাঁহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥'

তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের অন্তরের পরিচয় পাইয়া চৈতন্যদেবের খুবই আনন্দ হইল এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হওয়াতে সেখানে দুই-চারি দিন থাকিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিলেন।

"তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধ কাশী আসি কৈলা শিব দরশনে ॥"

এইরূপে তীর্থস্থানাদি দর্শন ও ভগবদ্ভক্তির প্রচার করতঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সমস্ত অন্ধ্রদেশ পরিভ্রমণ করিলেন। ঐ সকল অঞ্চলে কত তীর্থ ও মন্দির আছে তাহার সীমা নাই। পদব্রজে চলিয়া ইচ্ছানুরূপ তিনি এই

সমস্তই একে একে দেখিলেন। চৈতন্যদেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে তাহার সমস্তই এখনও বর্তমান। কোন কোন স্থানে নামের অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়, সম্ভবতঃ সেগুলি দেশ-কালভেদে উচ্চারণবৈষম্যের দরুণ। তৎপরে,—

"মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপতি ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্তি দেখি বেঙ্কট-অঞ্চলে ॥
ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥"

ত্রিপতি বা তিরুপতি (বালাজী) ভারতের এক প্রধান তীর্থ। পর্বতের উপর অতি নিভৃত রম্যস্থানে সুবৃহৎ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর অতি মনোরম মূর্তি বিরাজিত। যে পর্বতের উপর মন্দির, সেই পর্বতের নাম বেংকটাচলম্। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সহরের নাম তিরুপতি। সেখানে সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীসীতারামের অতি সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ভারতের সর্বপ্রদেশের লোকই 'বালাজী' দর্শনে যায়। চৈতন্যদেব তিরুপতি ও তিরুমল্লেশ্বর দর্শনান্তে, পরে নরসিংহ দর্শন করিয়া সপ্তমোক্ষ ক্ষেত্রের অন্যতম কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চী সনাতন ধর্মের, হিন্দু শিক্ষা-সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র। তিনি শিব-কাঞ্চীতে (একাম্বরনাথ) মহাদেব ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী কামাক্ষী দেবীকে দর্শন করিলেন। তাহার পর বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজকে দর্শনান্তে নিকটবর্তী আরও বহু তীর্থে[১] দেববিগ্রহাদি দর্শনব্যপদেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বলিয়াছেন, তিনি এই ভ্রমণবৃত্তান্ত অপরের নিকট 'শুনা কথা' হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কাজেই ইহাতে পূর্বাপর সঙ্গতি ঠিকমত রক্ষিত হয় নাই। আগে-পরে লিখার ব্যতিক্রম হইলেও ঐসকল স্থান তিনি দর্শন করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত। নতুবা এই সকল নাম যাহা বর্তমান সময়েও বাঙালী লেখকের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন, 'চরিতামৃত'কারের পক্ষে পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব ছিল। আর আমরা যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, এই অঞ্চলের বৃত্তান্তে পৌর্বাপর্য ব্যতিক্রম অতি অল্পই হইয়াছে। যাহা হউক, চৈতন্যদেব ক্রমে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলেন।

"কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
পাপ নাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র তবে করিল গমন ॥

১ এই স্থান হইতে আট-নয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীরামানুজাচার্যের জন্মস্থান ভূতপুরী—বর্তমান নাম শ্রীপেরম্বদুর।

কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিলা কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্তন।
দেখি চমৎকার হইল সব লোকের মন॥”

এতদিন পরে চৈতন্যদেব ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেবালয় শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছেন। উহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। আচার্য রামানুজ এই স্থানেই জীবনের অধিকাংশকাল এবং শেষভাগ অতিবাহিত করেন। তাঁহার পূর্বেও বহু ভক্তিমার্গী আচার্য এই স্থানে বাস ও তপস্যাদি করিয়া ইহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কাবেরীতে স্নান করতঃ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরঙ্গনাথকে দর্শনান্তে ভক্তিভরে প্রণতঃ হইলেন। তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় সাষ্টাঙ্গ হইয়া স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভাবের আবেশ বৃদ্ধি পাওয়াতে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। মনঃপ্রাণ রঙ্গনাথে তন্ময় হওয়ায় দেহে অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখা দিল। তাঁহার অপূর্ব প্রেম ও ভাববিহ্বলতা দেখিয়া পূজারী সেবক ও দর্শকগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভাব উপশম হইলে পর সকলেই এই অসাধারণ সন্ন্যাসীকে সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীরঙ্গমে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভক্তেব বাস। শ্রী-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বেংকটভট্ট নামক জনৈক ভক্তিমান ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন এবং সাগ্রহে গৃহে লইয়া গিয়া খুব শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ভিক্ষা করাইলেন। বেংকটভট্টের স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন সকলেই ভগবদ্‌ভক্ত। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহাদের সকলের অন্তরেই প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল।

ভট্ট ও তাঁহার পরিবারবর্গের আগ্রহাতিশয়ে তিনি তাঁহাদের গৃহেই 'আসন' করিয়া অবস্থান করিলেন এবং বর্ষাকাল নিকটবর্তী হওয়ায়, ভট্ট ও তথাকার ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীরঙ্গম্ ক্ষেত্রেই তাঁহার চাতুর্মাস্য[১] করা সাব্যস্ত হইল। প্রত্যহ প্রাতে কাবেরীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিতে যাইতেন। দর্শন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা, জপধ্যানে বহুক্ষণ অতীত হইয়া যাইত। আবার কখন কখনও প্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্যগীত কীর্তনাদি করিতেন, তখন তাঁহার সেই দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া লোকের মনে বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র, ভাবভক্তি দেখিয়া সেখান-

১ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই চারিমাস, পরিব্রাজকগণ পরিভ্রমণ না করিয়া কোন অনুকূলস্থানে বাস করিয়া ভগবদ্‌ভজন করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্তিক-পূর্ণিমা পর্যন্ত চারি মাস গণনা করা হয়।

কার বহু লোক আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গমে রামানুজী সম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বৈষ্ণবগণের নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বাস। চৈতন্যদেব সেখানকার প্রবীণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে অবসরমত শাস্ত্রালাপ তত্ত্বালোচনাদি করিতেন; এই-রূপে ক্রমশঃ বহু লোকের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। বেঙ্কটভট্ট সপরিবারে তাঁহার বিশেষ অনুগত হইয়া সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও কঠোর সন্ন্যাসী একই গৃহে নিত্য ভিক্ষা লইতে সম্মত হইলেন না। চৈতন্যদেব রঙ্গক্ষেত্রে এক এক দিন এক এক ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ নিত্য প্রাতে অতিশয় ভক্তিভাবে গীতাপাঠ করিতেন। তাঁহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া লোকে নানাপ্রকার উপহাস করিত, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভক্তিতে গদগদস্বরে আপনার ভাবে পাঠ করিয়া যাইতেন। পাঠের সময় তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে দেখিয়া,—

"মহাপ্রভু জিজ্ঞাসিলা, শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়?
বিপ্র কহে, মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি ॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছে তাহা যেন শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জুনেরে কহিতেছে হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥"

ব্রাহ্মণের উত্তর শুনিয়া চৈতন্যদেবের খুব আনন্দ হইল।

"প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ গীতার এই অর্থ সার।"

শ্রীরঙ্গমের শ্রীবৈষ্ণবগণ একমাত্র শ্রীমন্নারায়ণ বিগ্রহের প্রতিই আকৃষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণরূপ-মাধুর্য ও মধুরভাবের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করেন। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন—

"এক ঈশ্বরে ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥"[১]

---

১ মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥
—নারদ পঞ্চরাত্র

চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে বেঙ্কটভট্ট ক্রমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও প্রেমভক্তির সন্ধান পাইয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল নামে বেঙ্কটভট্টের এক কুমার-বয়স্ক পুত্র ছিলেন। বিদ্বান বুদ্ধিমান গোপাল চৈতন্যদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং প্রাণপণ যত্নে সেবাদি করিতেন। চৈতন্যদেবও গোপালকে খুব ভালবাসিতেন এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝিয়া তাঁহাকে বিশেষ কৃপাও করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসর্গে গোপাল ক্রমশঃ উচ্চাঙ্গের প্রেমভক্তি ও সাধনভজন প্রণালী অবগত হন। গোপাল চৈতন্যদেবের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে চাতুর্মাস্য অন্তে তিনি যখন শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালও গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইতে উদ্যত হইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শুনাইয়া শান্ত করিলেন এবং প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "যতদিন পিতামাতা জীবিত আছেন, গৃহে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা কর এবং ভগবদ্‌ভজন কর, পরে সংসার ত্যাগ করিও।" গোপালভট্ট চৈতন্যদেবের উপদেশানুযায়ী নিজ জীবন পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং জনকজননীর স্বর্গগমনের পর সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে একত্রে বাস করতঃ চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান আচার্য 'ছয় গোস্বামী'র মধ্যে শ্রীগোপালভট্ট অন্যতম। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবক গোস্বামিগণ গোপালভট্টের বংশধর। কাশী দর্শনকালে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার মিলনের কথা পরে জানা যাইবে।

পরমানন্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য কাটাইয়া এবং ভট্টের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে প্রণামানন্তর চৈতন্যদেব সেবকসহ পুনরায় চলিতে চলিতে ক্রমে ঋষভ পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া জানিতে পারিলেন, শ্রীমৎ পরমানন্দ পুরী মহারাজ তথায় জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে চাতুর্মাস্য উপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর গুরুভ্রাতা পরমানন্দ মহারাজের দিব্য চরিত্র, ত্যাগতপস্যা ও জ্ঞানভক্তির কথা চৈতন্যদেব পূর্বেও শুনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহের অনুসন্ধান লইয়া সেখানে গিয়া পরমানন্দ স্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া চৈতন্যদেবের মনে খুব আনন্দ হইল। পরমানন্দজীও চৈতন্যদেবের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেব ঐ ব্রাহ্মণের গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র ও অলৌকিক ভাবভক্তির পরিচয় পাইয়া পরমানন্দ স্বামীর মন বিশেষ আকৃষ্ট হইল। তিনি চৈতন্যদেবের প্রতি খুব স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরমানন্দজী খুব উচ্চকোটির

মহাত্মা। তাঁহার ধ্যানধারণা ও উচ্চ অনুভব দেখিয়া, তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করিবার জন্য চৈতন্যদেবের অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল। তাঁহাকে অতিশয় অনুনয় করিয়া বলিলেন,—

"তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥"

চৈতন্যদেবের আগ্রহ দেখিয়া পুরীজী বলিলেন, তিনি শীঘ্রই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন; চৈতন্যদেব দক্ষিণের তীর্থ দর্শন করিয়া পুরী প্রত্যাবর্তন করিলে তিনিও বঙ্গদেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিবেন এবং উভয়ে একত্রে বাস করিবেন। পুরীজীর স্নেহ-আদরে চৈতন্য-দেবের খুবই আনন্দ হইল। তিন রাত্রি একসঙ্গে বাস করিয়া পুরীজী নীলা-চলের দিকে রওয়ানা হইলেন; চৈতন্যদেব শ্রীশৈলের দিকে চলিলেন।

"শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণেব বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥"

শ্রীশৈলে শিবদুর্গা দর্শন করিয়া, কামকোষ্ঠীপুরে (কণ্ডুকোণম) কামাক্ষী দেবীকে দর্শন ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণানন্তর দক্ষিণ মথুরাতে (মাদুরা) মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে আসিলেন। মীনাক্ষী দেবীর মন্দির অতিশয় সমৃদ্ধি-পূর্ণ ও কারুকার্যে খচিত। দেবীকে দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণের পর মন্দিরে অবস্থানকালে জনৈক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইল,। ব্রাহ্মণ খুব ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া চৈতন্যদেবকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহর হইলেও ব্রাহ্মণের গৃহে রন্ধনের কোন উদ্যোগ নাই দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়?"

"বিপ্র কহে, প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥"

ভাবুক ভক্তের অন্তরের ভাব ও উপাসনাপ্রণালী বুঝিয়া চৈতন্যদেবের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া খুব যত্নের সহিত চৈতন্যদেবকে ভিক্ষা দিলেন। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। চৈতন্যদেবের ভোজন হইয়া গেল; কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুই গ্রহণ করিলেন না, অতিশয় বিষণ্ণভাবে আবার বসিয়া রহিলেন। বিস্মিত হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভাবুক ব্রাহ্মণ জানাইলেন, "জগন্মাতা সীতাদেবীকে রাবণ হরণ করিয়া

লইয়া গেল। এই দুঃখে আমার আর জীবন ধারণে ইচ্ছা নাই, অনাহারে দেহ-ত্যাগ করিব ঠিক করিয়াছি।” চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—

“ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাই শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া করিল হরণ॥”

অনেক বলা-কহার পর ব্রাহ্মণের মন আশ্বস্ত হইলে তিনি ভোজন করিলেন।

“তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইল দুর্বসেন॥
দুর্বসেনে রঘুনাথ করি দরশন।
মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বরে দেখি তাহা করিলা বিশ্রাম॥”

ধনুতীর্থ (ধনুষ্কোটী) ভারতের শেষ সীমা। রামেশ্বর হইতে লঙ্কার দিকে পনর ষোল মাইল লম্বা একটি সংকীর্ণ ভূভাগ, সড়কের ন্যায় (যোজকের আকারে) সমুদ্রের ভিতরে লম্বমান রহিয়াছে। উহার একপাশে বঙ্গোপসাগরের গৈরিক জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিতেছে, আর অন্যদিকে ভারতসমুদ্রের সুনীল অম্বুরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ভীষণ গম্ভীর গর্জন করিতেছে। কিন্তু যেখানে উভয়ের মিলন, সেখানে জলরাশি শান্ত ও স্থির। ঐ উচ্চ ভূভাগের এক প্রান্তে অবস্থিত ধনুতীর্থের অপূর্ব দৃশ্য দেখিলে ক্ষণিকের জন্য বিধাতার সৃষ্টিলীলায় চিত্ত বিমোহিত হয়। ইহারও পরে সেই সেতুসম ক্ষীণ দ্বীপ সমুদ্রের ভিতরে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র যে সেতু নির্মাণ করিয়া ভারতের সঙ্গে লঙ্কার সংযোজন করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সাক্ষ্য।

সেতুবন্ধে ধনুতীর্থ দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব রামেশ্বরে কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। সমুদ্রস্নান, হরপার্বতী দর্শন, পূজাপাঠ, স্তবস্তুতি, প্রদক্ষিণ প্রণাম ও নৃত্যগীতে দিবাভাগ, আবার ধ্যানধারণাতে রাত্রিকাল কাটাইয়া পরমানন্দে রামেশ্বরে বাস করিতে থাকিলেন। বহু লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল, অনেকেই আবার তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া বিশেষ অনুগত ভক্ত হইলেন। ভারতের সর্বত্রই তীর্থস্থানে দেবমন্দিরে নিত্য শাস্ত্রাদি পাঠ-ব্যাখ্যা ধর্মপ্রসঙ্গ, আলাপ-আলোচনার রীতি দেখা যায়। রামেশ্বরে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব,—

"বিপ্রসভায় শুনে তাহা কূর্মপুরাণ।
তাঁর মধ্যে আইল পতিব্রতা উপাখ্যান ॥
'মায়াসীতা' নিল রাবণ শুনিলা ব্যাখানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥"

কূর্মপুরাণের সিদ্ধান্ত শুনিয়া চৈতন্যদেব পাঠকের সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং পুস্তকের ঐ অংশটুকু নূতন করিয়া লিখাইয়া পুস্তকে রাখিয়া পুরাতন পত্র কয়েকখানি চাহিয়া নিলেন। অতঃপর রামেশ্বর হইতে ফিরিবার পথে দক্ষিণ মথুরাতে সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে উহা দিলেন। প্রাচীন পুস্তকের পত্র দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ রহিল না। মাতা জানকীর পবিত্র দেহ রাবণ স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে মায়াসীতা হরণ করিয়াছিল জানিয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইল।

"সেই রাত্রে তাঁহা রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি ॥
তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে।
ময়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে॥
চিয়ড়তালাতীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি ॥
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥
মলয়পর্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যা কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥"

মলয় পবনের দেশ মালাবার, পাণ্ড্যদেশ নামে পূর্বে পরিচিত ছিল। পুণ্যক্ষেত্র ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তভূমি অন্তরীপের আকারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন জননী ভারতভূমি সমুদ্রের কোল হইতে উঠিয়াছেন, এবং ধীরে ধীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উত্তরাভিমুখে কৈলাসের দিকে চলিয়াছেন। মায়ের প্রথমাবির্ভাবের জন্য কি সেখানে তাঁহার কুমারী মূর্তি? সেই পবিত্র স্থানের নাম কুমারিকা অন্তরীপ। যেমন স্থানের সৌন্দর্য, তেমনই মায়ের ভুবনমোহন অপরূপ রূপরাশি। পঞ্চমবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী বালিকার ক্রীড়াচঞ্চল হাস্যময় মূর্তি একবার দেখিলে জীবনে আর ভুলিবার উপায় থাকে না। মন্দিরের পাদদেশে সমুদ্রগর্ভে, স্থলভাগের শেষ সীমায় এক সুবৃহৎ শিলাখণ্ড অর্ধনিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে,—ভগবতীর পাদক্ষেপের

পীঠরূপে। তাহার উপর আহত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গমালা, শুভ্র ফেনরাশি বিস্তার করিয়া চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। দেখিলেই মনে হয় দেবী কুমারিকা কলহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া দিবানিশি সমুদ্রের সঙ্গে খেলায় মত্ত রহিয়াছেন, আর তাঁহার শুভ্র বস্ত্রাঞ্চল চারিদিকে লুটাইয়া পড়িতেছে। সেই স্থানের নিকটেই পূজা-অর্চনার জন্য একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ আছে, ভোরবেলা সেখান হইতে বসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্রগর্ভ রঞ্জিত করিয়া বালার্ক কিরণছটা প্রকাশিত হইতেছে। আবার সন্ধ্যাবেলা দেখা যায় অস্তগামী সূর্যের লোহিতাভায় চারিদিক ঝক্‌মক্ করিতেছে। ঋতুবিশেষে সেই শোভা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। জগজ্জননীর কুমারী মূর্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করিয়া চৈতন্যদেবের মনে অতিশয় আনন্দ জন্মিল।

পুরী হইতে বাহির হইয়া তিনি এপর্যন্ত উপকূলপথে চলিয়া এবং পুণ্যভূমি ভারতকে দক্ষিণে রাখিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতের শেষসীমা কন্যাকুমারী হইতে তিনি এখন পশ্চিম উপকূল ধরিয়া ভারতভূমিকে দক্ষিণে রাখিয়াই ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে চলিলেন। কন্যাকুমারী হইতে চলিয়া—

"আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারী ॥
তমাল কার্তিক দেখি আইলা বাতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥"

ভট্টমারীরা স্ত্রীলোক ও ধনের প্রলোভনে মোহিত করিয়া চৈতন্যদেবের সেবকটিকে আটকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি অতিকষ্টে তাঁহাদের হাত হইতে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া তাড়াতাড়ি সেই অঞ্চল ছাড়িয়া গেলেন। ভট্টমারী বামাচারী বলিয়া সকলে অনুমান করেন। সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া,

"সেইদিন চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে।
স্নান করি গেলা আদি কেশব মন্দিরে ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইল।
নতি, স্তুতি, নৃত্যগীত বহুত করিল ॥"

সেইখানের ভক্ত পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতে, 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক ভক্তিশাস্ত্রের এক সিদ্ধান্তগ্রন্থের সন্ধান পাইয়া চৈতন্যদেব উহার এক খণ্ড প্রতিলিপি লিখাইয়া সঙ্গে লইলেন। 'ব্রহ্মসংহিতার' একটি মাত্র অধ্যায় (পঞ্চম) তিনি আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ এবং উহাই বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

"বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরসিত হঞা ॥

দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইল শ্রীজনার্দন ॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্তন নর্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥
সিংহারীমঠ আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥"

সিংহারী বা শৃঙ্গেরী মঠ সন্ন্যাসিগণের অতিশয় প্রিয় পুণ্যস্থান। নির্জন পার্বত্য প্রদেশে, তুঙ্গভদ্রাতীরে, ধ্যানধারণাব অতি অনুকূল স্থানে শঙ্করাচার্য স্বীয় আরাধ্যা ভগবতী সরস্বতী দেবীর মন্দির ও মঠ স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই মঠকে কেন্দ্র করিয়া একদিন বেদান্তধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সেইজন্যই, সন্ন্যাসিগণ কেন, সনাতন-ধর্মাবলম্বীমাত্রের চক্ষেই এই স্থান অতি পবিত্র। পীঠাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীব সাক্ষাৎকারে এবং আচার্য শঙ্করের পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত এই তীর্থদর্শনে চৈতন্যদেবের হৃদয়ে যে আনন্দের হিল্লোল খেলিয়াছিল এবং সেখানকার বিদ্বান-বিদগ্ধ তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদের সঙ্গে তাঁহার যে সকল আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ধ্যান-ধারণার অতি অনুকূল, বিশেষতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্রে, এত দূরদেশ হইতে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া গিয়া চৈতন্যদেব যে চুপচাপ চলিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে ঐ স্থানেব সন্ন্যাসিগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ আদর-অভ্যর্থনা করেন নাই, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজী সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র দর্শন করিয়াছেন; শৃঙ্গেরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণের প্রধান কেন্দ্রও দর্শন করিলেন। এবার তিনি দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র উড়ুপীতে চলিলেন। ধর্মরাজ্যে দর্শনশাস্ত্রে, জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ে এই তিন মতবাদই মুখ্য, বাকী অন্য মত ইহাদেরই অবান্তর ভেদমাত্র। উড়ুপী শৃঙ্গেরী হইতে খুব দূরে নহে, পাঁচ-সাত দিনের রাস্তা। শৃঙ্গেরী মঠ[১] বর্তমানে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। উড়ুপী দক্ষিণ কানাড়ায় সমুদ্রের নিকটবর্তী। শৃঙ্গেরী হইতে চলিয়া,—

"মধ্বাচার্য স্থানে আইলা যাহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপ কৃষ্ণ দেখি হইলা প্রেমোন্মাদী ॥

---

১ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির তপস্যাস্থান বর্তমান শৃঙ্গেরী হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে পর্বতের উপর। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব আজও বর্তমান।

নর্তক গোপাল কৃষ্ণ পরম মোহনে।
মধ্বাচার্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥
গোপীচন্দন[১] ভিতরে আছিলা ডিংগাতে।
মধ্বাচার্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোনমতে ॥
মধ্বাচার্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥"

মধ্বাচার্য শঙ্করের সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন; কিন্তু অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস না হওয়াতে নিজ অনুভবানুযায়ী দ্বৈতবাদ প্রচার ও দ্বৈতমতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করায় স্বীয় সম্প্রদায়ের সংগে বিরোধ হইতে থাকে। তখন স্বতন্ত্র হইয়া, মাধ্ব-সম্প্রদায় স্থাপন ও দ্বৈতমত প্রতিপাদন পূর্বক, প্রস্থানত্রয়ের ও অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থের ভাষ্যাদি লিখেন। উঁহারা দ্বৈতবাদী হইলেও সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত প্রণালী অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মাধ্বগণ অদ্বৈতবাদী দশনামী সন্ন্যাসিগণের ঘোর বিরোধী। অদ্বৈতবাদিগণকে নাস্তিক মনে করিয়া ইহারা অত্যন্ত বিদ্বেষভাব পোষণ করেন।

"তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥"

মাধ্বগণের সংগে চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গ ও সাধ্যসাধন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও বিচার হইয়াছিল। চৈতন্যদেব তাঁহাদের সাধ্যসাধন জানিতে চাহিলে,—

"আচার্য কহে, বর্ণাশ্রমধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥
পঞ্চবিধ[২] মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥"

---

১ প্রবাদ, কোন বণিক দ্বারকা হইতে নৌকাযোগে গোপীচন্দন লইয়া যাওয়ার সময় উডুপীর নিকটে সেই নৌকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় এবং এদিকে মধ্বাচার্য স্বপ্ন দেখেন যে, সেই নৌকার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। মধ্বাচার্য স্বপ্নানুযায়ী অনুসন্ধান করিয়া এই মূর্তি প্রাপ্ত হন, এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন।

২ (১) সার্ষ্টি—ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য। (২) সালোক্য—সমান লোক। (৩) সামীপ্য—সমীপে গমন। (৪) সারূপ্য—সমানরূপ প্রাপ্তি (৫) সাযুজ্য—যুক্ত হওয়া (ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির ন্যায় ?)।

মাধ্বগণের সিদ্ধান্ত শুনিয়া চৈতন্যদেবের অন্তরে আশ্চর্য বোধ হইল। তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,

"কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥"

তৎপরে মাধ্বগণকে ভক্তিমার্গে শ্রেষ্ঠ সাধ্যসাধন নিষ্কাম প্রেমভক্তির স্বরূপ ও উপাসনার কথা শুনাইয়া চমৎকৃত করিলেন। সন্ন্যাসীর মুখে ভক্তিমার্গের অতি উচ্চ তত্ত্বকথা শুনিয়া মাধ্বগণের লজ্জা উপস্থিত হইল। তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া,—

"প্রভু কহে কর্মী[১] জ্ঞানী[২] দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহে নিশ্চয ॥"

এইখানে পাঠক একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, মাধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের মতের অনৈক্য। পরবর্তীকালে তাঁহার প্রবর্তিত ভক্তিমার্গ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে কেহ কেহ উক্ত মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে হয়। এক সময়ে চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর গুরু, ভক্তিপ্রচারক আচার্য শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর নামের সহিত কেহ কেহ মাধ্ব নামের মিলন ঘটাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে ভ্রমে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিতেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদে আছে।

"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর।
ভক্তিকল্পতরুর তিহোঁ প্রথম অংকুর ॥
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অংকুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্দ উপজিল ॥"

পাঠক এই কথার দ্বারা নিঃসংশয়ে বুঝিবেন, চৈতন্যদেব কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দশনামী সন্ন্যাসীরা স্বীয় সন্ন্যাসগুরুর সম্প্রদায় অনুসারে গিরি, পুরী, ভারতী ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। সেই হিসাবে, চৈতন্যদেব (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য) ভারতী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও, তিনি যে ভক্তিমার্গের প্রচার

১ কর্মী—মীমাংসক—স্বর্গসুখলাভের জন্য সকাম যজ্ঞাদি কর্মকারী।

২ জ্ঞানী—সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী তত্ত্ববিচারক সম্প্রদায়, যাহারা ভগবদ্-উপাসনার বিরোধী। শঙ্করাচার্য ও তৎপ্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে ভগবদুপাসনা অবশ্য কর্তব্য মনে করেন।

করেন, উহার প্রবর্তক ছিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরুর গুরু শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরী। কাজেই শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর নামেই চৈতন্যদেবের অনুগামী সম্প্রদায় পরিচিত হওয়া সম্ভব।[১] কেহ কেহ অনুমানও করেন যে, কালক্রমে চৈতন্যদেবের অনুবর্তীদিগের অনেকের ভিতরে তৎপ্রচারিত ত্যাগ-তপস্যার হ্রাস হইলে, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় হইতে নিজদিগকে সম্পূর্ণভাবে দূরে রাখিবার জন্য এবং ব্রজবাসী অন্যান্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে নিজেদের মান-প্রতিষ্ঠা ও গৌরব-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, কোন মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক দেখান আবশ্যক হয়। তখন তাঁহারা দ্বৈতবাদী আচার্য মধ্বের অনুগামী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, কেহ কেহ এইরূপ অনুমানও করেন। যাহা হউক, আমরা শ্রীচৈতন্যের তীর্থপর্যটনে ফিরিয়া আসি। তিনি মালাবার হইতে সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে কর্ণাট-মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া পাণ্ডুপুরে (পাণ্ডারপুর) উপস্থিত হইলেন।

বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত পাণ্ডারপুর অতিশয় প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। যেখানে ভগবানের বিগ্রহ বিঠ্‌ঠল নামে পরিচিত। কথিত আছে, পিতৃ-সেবাপরায়ণ জনৈক ভক্ত ভগবানের অপার করুণায় তাঁহার বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। একদিন তিনি যখন পিতৃসেবায় নিযুক্ত, তখন ভগবান তাঁহাকে দর্শন দেন। কিন্তু পিতৃসেবা-নিরত পুত্র আপনার কর্তব্য শেষ না হওয়ায়, উঠিয়া আসিয়া ভগবানকে অভ্যর্থনা করিলেন না; নিকটে, হাতের কাছে একখানা ইট দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি তাহাই একহাতে আগাইয়া দিলেন এবং প্রেমভরে বলিলেন, 'বৈঠো', একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি। ভগবান ভক্তের অন্তরের ভালবাসা ও তাঁহার পিতৃসেবায় প্রীত হইয়া ইটের উপর ত্রিভঙ্গ বাঁকা মোহনরূপে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতৃসেবা সম্পূর্ণ হইলে, ভক্ত আসিয়া প্রভুর পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন এবং প্রেমাশ্রুতে চরণকমল অভিষিক্ত করিয়া বারংবার স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান ভক্তকে সান্ত্বনা দিয়া ও তাঁহার পিতৃসেবার প্রশংসা করিয়া বর দিতে চাহিলেন। তাঁহার মৃদুমধুর হাস্যে ভক্তের হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি করজোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন, "দাসের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তোমার এই ভক্তানুগ্রহকারী ভুবনমোহন মূর্তিতে চিরকাল এই স্থানে বিরাজিত থাক, এই প্রার্থনা।" ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল; ইটের উপর রহিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রভুর নাম হইল বৈঠ্‌ঠল (বিঠ্‌ঠল)-দেব।

---

১ চৈতন্যদেবের মতানুগমনকারীরা নিজদিগকে 'গৌড়ীয় মাধ্ব' বলিয়া পরিচয় দেন। 'গৌড়ীয়' বিশেষণের প্রয়োগ অবশ্যই দক্ষিণী মাধ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বুঝাইবার জন্য, সন্দেহ নাই।

ভীমরথী (ভীমা) নদীতে স্নান করিয়া চৈতন্যদেব বিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করিলেন,—

"প্রেমাবেশে কৈল প্রভু নর্তন কীর্তন।
প্রভুপ্রেম দেখি সবার চমৎকার মন॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্তা পাইল॥
মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র গৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড পরণাম।
পুলকাশ্রু, কম্প, সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥"

স্বীয় গুরুর গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ রঙ্গপুরী স্বামিজীর কথা চৈতন্যদেবের জানা ছিল, সেইজন্যই এখানে আসিয়া দৈববশে তাঁহার সন্ধান ও দর্শন পাইয়া অতিশয় ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রঙ্গপুরীজীও তেজোদৃপ্ত যুবক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং ভাবে প্রেমে বুঝিলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই মদীয় গুরুদেব শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীজীর সম্পর্কযুক্ত, তাহা না হইলে এই অপূর্ব ভক্তিপ্রেম কোথা হইতে আসিল?' সেইজন্য রঙ্গপুরী বলিলেন, –

"শ্রীপাদ ধরহ আমার গোসাইর সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি প্রেমার গন্ধ॥"

পুরীজী চৈতন্যদেবকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন এবং দুজনে আলাপ-পরিচয় হইবার পর তাঁহার সঙ্গেই চৈতন্যদেব পরমানন্দে কয়েকদিন পাণ্ডারপুরে অবস্থিতি করিলেন। উভয় উভয়কে পাইয়া পরমানন্দে ভগবৎপ্রসঙ্গে, ভজনে ও কীর্তনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন অবসরকালে কথাপ্রসঙ্গে রঙ্গপুরীজী জানিতে পারিলেন চৈতন্যদেবের পূর্বাশ্রম নবদ্বীপ। নবদ্বীপের নাম শুনিয়া রঙ্গপুরীজী হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, তিনি শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। সেখানে জগন্নাথ মিশ্র নামক জনৈক সদ্‌ব্রাহ্মণের গৃহে, পরম তৃপ্তির সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একটি অতি অপূর্ব উপাদেয় জিনিস খাইয়াছিলেন,—মোচার ঘণ্ট।

"জগন্নাথ মিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহাই খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা॥

রন্ধনে নিপুণা নাহি তৎসম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিল সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্ত হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥
প্রভু কহে, পূর্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্বাশ্রমে পিতা॥"

চৈতন্যদেবের পূর্বাশ্রমের পরিচয় পাইয়া রঙ্গপুরীজীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পূর্বের স্মৃতিতে আত্মীয়তা ও স্নেহ-ভালবাসা খুব বর্ধিত হইল। তীর্থ-যাত্রাকালে অগ্রজের অনুসন্ধানেব জন্য চৈতন্যদেবের অন্তরে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল এতদিনে তাহা নিবৃত্ত হইল। বুঝিলেন, বিশ্বরূপ তাঁহার জীবনের ব্রত সফল করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ-জগতে আর তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে না। দেখিতে দেখিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল, রঙ্গপুরীজী বিদায় লইয়া দ্বারকা দর্শনে চলিলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পরেও ভক্ত ব্রাহ্মণের বিশেষ আগ্রহে চৈতন্যদেব তথায় দিন চারি অবস্থান করিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ভীমরথীতে স্নান করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলকে দর্শন করিতেন, এবং প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব-প্রার্থনা ও ভজনকীর্তন করিয়া অন্তরে পরমানন্দ পাইতেন। কখনও কখনও ভাবাবেশে দেহে সাত্ত্বিক বিকারসকলের প্রকাশ পাইত এবং তাহা দেখিয়া সমাগত লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। পান্ডারপুরে বহু লোক তাঁহার অনুগত ও ভক্ত হইয়াছিলেন। তুকারাম[১], নামদেব প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রে ভক্তিভাব ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চৈতন্য-দেবের প্রচারিত ভক্তিভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পান্ডারপুর এখনও মহারাষ্ট্রের ভিতর ভক্তিভাব-প্রেরণার প্রধান কেন্দ্র। অনেকে ঐ স্থানকে বঙ্গদেশের নবদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করেন। কারণ নবদ্বীপের ন্যায় এখানেও ভগবানের নামকীর্তন ও ভক্তিভাব প্রধান; এবং সাধারণ লোক, এমনকি সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরও উহাতে অধিকার আছে দেখা যায়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে প্রতিবৎসর পান্ডারপুরে এক বিরাট মেলা জমে; তাহাতে পুরীর রথযাত্রা অপেক্ষাও অধিক লোকসমাগম হয়। সেই সময়ে, শত সহস্র লোকের কীর্তন ও গীতবাদ্যের শব্দে, বাস্তবিকই 'কানে লাগে তালি'। অতি নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরাও উহাতে যোগ দিয়া আনন্দ করে, ভগবানের নাম-কীর্তনে

১ তুকারাম রচিত সঙ্গীতে চৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে বলিয়া শোনা যায়।

মত্ত হয়। সেই দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলা ও নাম-কীর্তনের স্মৃতি মনে পড়ে। নবভাবের বীজ প্রোথিত করিয়া চৈতন্যদেব পাণ্ডারপুর ছাড়িয়া চলিলেন।

"তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্নাতীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'॥
'কর্ণামৃত' শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লিখাইয়া নিল॥"

শ্রীমৎ লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্যদেবের অন্তরে পরম আনন্দের সঞ্চার হইল। শ্রীকৃষ্ণলীলার সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের বর্ণনা এই পুস্তকের ন্যায় অন্যত্র দুর্লভ। 'ব্রহ্মসংহিতা'র ন্যায় এই গ্রন্থেরও প্রতিলিপি করাইয়া চৈতন্যদেব সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সেখান হইতে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া,—

"তাপ্তী স্নান করি আইলা মাহীষ্মতী পুরে।
নানা তীর্থ দেখে তাহা নর্মদার তীরে॥
ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমূক পর্বত আইলা দণ্ডক অরণ্যে॥"

এই সকল স্থানের নাম ও বর্ণনা 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার যেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ঠিক ক্রমানুসারে হয় নাই; ইহা তিনি নিজেও বলিয়াছেন। তবে মাদ্রাজ প্রদেশের বিবরণ যতটা বিস্তৃত পাওয়া যায়, বোম্বাই অঞ্চলের বিবরণ তদপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় যে চৈতন্যদেবের দ্বারকা প্রভাসাদি তীর্থদর্শনের উল্লেখ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নাই। এতদূর গিয়াও যে তিনি ঐ সকল মহাতীর্থ দর্শন না করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহা ত মনে হয় না। বিশেষতঃ, সেই সময়ে, দ্বারকা দর্শনের কোন প্রবল বাধা ছিল না নিশ্চয়; নতুবা তাঁহার পাণ্ডারপুরের সঙ্গী শ্রীরঙ্গপুরীজী দ্বারকা যাত্রা করিলেন কিরূপে? আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁহার পুরী প্রত্যাবর্তনের বিবরণও ভালভাবে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' লিপিবদ্ধ হয় নাই। এজন্য আমরা মনে করি তাঁহার ভ্রমণের শেষদিকের বৃত্তান্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ভাল করিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দণ্ডক অরণ্য দর্শনের পরই 'চরিতামৃত'কার লিখিয়াছেন,

"প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাহা করিলা বিশ্রাম॥

নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্ম গিরি।
কুশাবর্তে আইলা যাহা জন্মিলা গোদাবরী॥
সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥"[১]

গোবিন্দ দাসের 'কড়চা' নামক একখানি গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দক্ষিণ-পশ্চিম ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়; উহাতে দ্বারকাদি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ বিশদরূপে লিখিত আছে। কিন্তু গোবিন্দ দাসের 'কড়চা'কে অনেকেই প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন না। ইহার প্রধান কারণ, এপর্যন্ত বহু অনুসন্ধানেও উক্ত পুস্তকের (হস্তলিখিত) প্রাচীন মূলগ্রন্থ মিলে নাই। উক্ত পুস্তক আমরা খুব ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি। বর্ণনাদি অতি চমৎকার হইলেও ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

আমাদের মনে হয় গোবিন্দ দাসের গ্রন্থ সুপ্রাচীন না হইলেও প্রাচীনগণের মধ্যে প্রচলিত চৈতন্যদেবের পরিব্রাজক জীবনের ঘটনা সংগ্রহ করিয়াই কোন লেখক পরবর্তীকালে উহা রচনা করিয়াছেন। আমরা এপর্যন্ত যাহা লিখিয়াছি প্রায় সমস্তই 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে গৃহীত। এখন গোবিন্দ দাসের 'কড়চা' হইতে দ্বারকা ভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি; সত্যাসত্য বিচারের ভার পাঠকের উপর।

মহারাষ্ট্র দেশ হইতে পশ্চিমে চলিয়া চৈতন্যদেব সৌরাষ্ট্রে পৌঁছিলেন ও সেখানকার সমস্ত তীর্থস্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির, যাহার অতুল ধনরত্নরাশি মুসলমানগণ লুঠিয়া লইয়াছে, সৌরাষ্ট্রের প্রধান দর্শনীয় স্থান ছিল। বর্তমানে প্রভাস-যাত্রীরা সমুদ্রোপকূলে সেই বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসেন।[২] চৈতন্যদেবের প্রভাস দর্শনের পূর্বেই সেই মন্দির লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তিনিও সোমনাথের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব সমুদ্রোপকূলে চলিয়া একে একে গির্ণার, প্রভাস, সুদামাপুরী (পোরবন্দর) ও দ্বারকা দর্শন করিলেন। গির্ণারের রাস্তা অতীব কঠিন। দুর্গম সুদীর্ঘ

---

১ শ্রীমদ্ভাগবতে বলরামের তীর্থযাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অনেক সাদৃশ্য আছে। পৌরাণিক প্রাচীন তীর্থস্থান পরবর্তীযুগেও অনুরূপ রহিয়াছে,—খুবই আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

২ সাম্প্রতিক কালে ভারতে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এই মন্দিরের যথোপযুক্ত সংস্কারাদি সাধিত হইয়াছে।

চড়াই অতিক্রম করিয়া অতি উচ্চ পর্বতের উপরে অবস্থিত মা কালীর মন্দির, দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুকা ও গোরক্ষনাথের সাধনস্থান দর্শন করিতে হয়। এই দুর্গম পথে একজন রুগ্ন সাধুকে অসহায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া চৈতন্যদেব নিজ সেবকের সহায়তায় তাঁহার সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিলেন এবং নিজের জানা একটি ঔষধ খাইতে দিলেন। যত্ন-শুশ্রূষায় সাধুর দেহ শীঘ্রই নিরাময় হয় এবং তিনি কিয়দ্দূর পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করেন।

দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। গোমতী-স্নান ও ভগবানের দর্শনাদি করিয়া তিনি ভজনকীর্তনে মাতিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। তাঁহার অপূর্ব রূপলাবণ্য ও অলৌকিক ভাবভক্তিতে বহু লোক আকৃষ্ট ও ভক্ত হইল। তিনি সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া লোকের ভিতর ধর্মভাব ও ভগবদ্ভক্তি প্রচার করিলেন। একদিন দ্বারকানাথের মন্দিরে আনন্দোৎসবে সমাগত ব্যক্তিরা প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া, কতকগুলি গরীব ভিখারী, অন্ধ, আতুর, কাণা খোঁড়া লোক প্রসাদ পাইবার আশায় একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দীনদুঃখীদের দেখিতে পাইয়া চৈতন্যদেবের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে পরম সমাদরে বসাইলেন, এবং স্বয়ং ভাল ভাল প্রসাদ আনিয়া পরম পরিতোষসহকারে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন।

"পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরা গুণমণি।
প্রসাদ বণ্টন প্রভু করেন আপনি ॥"

দ্বারকা দর্শনান্তে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি প্রত্যা-বর্তনের পথ ধরিয়া পূর্ব দিকে চলিতে লাগিলেন এবং গুজরাট ছাড়াইয়া আবার মহারাষ্ট্রের তীর্থসমূহ দর্শন করিতে করিতে (প্রাচীন খাণ্ডব বন) খাণ্ডোবার মন্দিরে (বর্তমান ভোঁসিয়ালের নিকট) উপস্থিত হইলেন। খাণ্ডোবাকে দর্শন করিয়া মনে অতীব আনন্দ জন্মিল এবং প্রেমে বিভোর হইয়া স্তবস্তুতি নৃত্য-গীত কীর্তন করিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই লোক আকৃষ্ট হইত। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। খাণ্ডোবার মন্দিরে বহু 'দেবদাসী' বাস করিত; তাহাদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। উহাদের অধিকাংশই নামে 'দেব-দাসী' হইলেও কাজে অন্যরূপ। চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে চারিদিক হইতে লোক আসিতেছে দেখিয়া সেই সকল 'দেবদাসী'রাও দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইল, কিন্তু নিকটে যাইতে সাহসে কুলাইল না। চৈতন্যদেব তাহাদের পরিচয় পাইয়া ও বিমর্ষভাব দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন এবং কোন প্রকার ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া স্নেহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিবার ও তাঁহার নাম লইবার জন্য

উপদেশ দিলেন। এইভাবে তাহাদের জীবনের স্রোত ও মতিগতি পরিবর্তিত হইল।

সেই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে অগ্রসর হইয়া পম্পা সরোবরে (কিষ্কিন্ধ্যা) স্নান করতঃ সেই অঞ্চলের তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া বর্তমান নিজামরাজ্য[১] ও মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়া চলিয়া স্থানীয় তীর্থসমূহ দর্শন করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরির পাশ দিয়া পূর্বমুখে আসিয়া পুনরায় বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন। বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশের রাস্তা বড়ই দুর্গম। মধ্যে মধ্যে ভীষণ জঙ্গল, লোকালয় নাই। আবার স্থানে স্থানে অসভ্য বন্য লোকের বাস। তিনি একস্থানে ঐরূপ অসভ্য ভীল-দস্যুর কবলে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত তাঁহার অপূর্ব প্রেম-ভাবে মোহিত হইল। তিনি দস্যুপতিকে আপনার ভাবে ভাবিত করিয়া চির-কালের জন্য তাহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রভাবে ভীল ভগবদ্‌ভক্ত হইল। তাহাদের সামাজিক জীবনযাপন-প্রণালীর উন্নতিকল্পে চৈতন্যদেব ভীলগণের মধ্যে ভগবানের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

দুর্গম পথে জঙ্গলের ভিতর লোকালয় না থাকায় ভিক্ষার বড়ই অসুবিধা হইয়াছিল। একবার দুই দিন উপবাসের পর তৃতীয় দিনে সেবক কিছু আটা যোগাড় করিলেন। সেই আটা দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন, এমন সময় এক দুঃখিনী ভিখারিণী আসিয়া হাত বাড়াইল। চৈতন্যদেব অতীব আনন্দের সহিত আপনার ভৈক্ষ্য দ্রব্য তাহাকে দিয়া স্বয়ং উপবাসী রহিলেন। যাওয়ার পথে আর এক স্থানেও, তাঁহার সেবার জন্য গ্রামের লোক প্রচুর দ্রব্যসম্ভার উপস্থিত করিলে, তিনি সম্মুখে বৃক্ষতলে এক বৃদ্ধা দুঃখিনী ভিখারিণীকে দেখিতে পাইয়া সমস্ত জিনিস তাহাকে দিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

"বৃক্ষতলে এই যে দুঃখিনী বসি আছে।
এই সব অন্নবস্ত্র দেহ তার কাছে॥
দয়া দেখে সব লোক আশ্চর্য হইল।
কেহ বলে বৃদ্ধা লাগি ভিক্ষা মাগি নিল।"

আমরা গোবিন্দদাসের কড়চা হইতে অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিলাম। কাহারও বিশেষ জানিবার আগ্রহ থাকিলে উক্ত পুস্তক দেখিবেন।

বিদ্যানগরে ফিরিয়া চৈতন্যদেব আবার রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং পূর্বের মতই ভগবৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। দক্ষিণদেশ ঘুরিয়া আসিতে চৈতন্যদেবের প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। রায় ইতিমধ্যে রাজকর্ম

---

১ নিজাম রাজ্য বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত।

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুরীতে বাস করিবার জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অনুমতি পাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের নিকট রায় অতিশয় হৃষ্টচিত্তে সেই সুসংবাদ প্রকাশ করিলে তিনিও অতীব আনন্দিত হইলেন এবং দিনকয়েক অপেক্ষা করিয়া রায়কে লইয়া একসঙ্গেই পুরী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রামানন্দ করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "স্বামিন্! আপনি ত্যাগী সন্ন্যাসী, অতিশয় আড়ম্বর জাঁক-জমক, লোকজনেব কোলাহল হট্টগোল, হৈচৈ আপনার ভাল লাগিবে না।"

"রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল॥
দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥"

অতএব চৈতন্যদেব বিদ্যানগর হইতে চলিয়া পূর্বের পথে, পরিচিত স্থান পরিচিত লোকজন ও ভক্তগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া, আবার আলালনাথে আসিয়া পেঁীছিলেন এবং পুরীতে খবর দেওয়ার জন্য সঙ্গীসেবককে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অতীব আনন্দের সঞ্চার হইল। প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, মুকুন্দ, জগদানন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ দ্রুত চলিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রসাদী মালা, চন্দন ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। বহুদিন পরে এই মিলনে সকলের হৃদয়েই প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিল, তাঁহারা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া পবস্পর প্রেমালিঙ্গন করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদী মাল্যচন্দন ও মহাপ্রসাদ চৈতন্যদেব অতিশয় ভক্তিসহকারে ধারণ করিয়া বারংবার শ্রীশ্রীজগন্নাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার কৃপাতেই এই সুদীর্ঘ কঠিন যাত্রা পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরস্পর কুশল-সমাচার বিনিময় ও প্রেম-ভালবাসা আদানপ্রদানের পর, সকলে একত্রে ভগবানের নাম ও গুণগান করিয়া পুরী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরী পেঁীছিয়াই চৈতন্যদেব মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শন ও বারংবার ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। দুই বৎসরের পর আবাব প্রাণের আরাধ্য দেবতার দর্শনে অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের ফলে চৈতন্যদেব দেশের ও সমাজের দুরবস্থা এবং ধর্ম ও ধার্মিক সম্প্রদায়ের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। আচার্যগণের জন্মভূমি এবং সম্প্রদায়সমূহের প্রধান কেন্দ্রসকল দেখিয়া বুঝিলেন অনেকেই পূর্বাচার্যগণের প্রদর্শিত মার্গ ছাড়িয়া সাম্প্রদায়িক

স্বার্থের পশ্চাতে ছুটিতেছে। শ্রুতি-স্মৃতি বহির্ভূত আচার-অনুষ্ঠানে সমাজ কলুষিত। জ্ঞানমার্গীরা নির্গুণ ব্রহ্মবাদের দোহাই দিয়া ঘোর নাস্তিক, আবার ভক্তিমার্গীরা সগুণ ব্রহ্মোপাসনার নামে ঘোর পৌত্তলিক। ভক্তিপ্রধান দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, ভারতের অন্য প্রদেশের ন্যায় সেখানেও অধিকাংশ লোকই স্বীয় মানবজন্মের চরম সার্থকতার কথা ভাবে না; স্বীয় স্বার্থসাধন ও সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্যই ব্যস্ত। ফলে অসংখ্য মন্দির, বিগ্রহ, ভোগরাগ সেবা-পূজার বাহ্য আড়ম্বর বাড়িয়াছে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠান সমস্তই প্রাণহীন। সারবস্তুর খোঁজখবর নাই, শুধু খোসা লইয়া টানাটানি; সঙ্গে সঙ্গে নিজের ও সম্প্রদায়ের ঘোর অধঃপতন। ধর্মের এই গ্লানি দূর করিবার জন্যই চৈতন্যদেব দেশের সর্বত্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানমূলক সহজ সরল অনাড়ম্বর উপাসনা-প্রণালী এবং ভগবানের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। তাঁহার সংস্থাপিত ঐশ্বর্যলেশহীন মাধুর্য-পরিপূর্ণ, উপাসনা-মন্দির ত্যাগ ও তপস্যার উপাদানে সুগঠিত, এবং বিবেক ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সুদৃঢ় প্রস্তরভিত্তির উপব সুপ্রতিষ্ঠিত![১]

---

১ "সূর্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমঃ নাশ করি করে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান॥"

[দুই ভাই—চৈতন্য-নিত্যানন্দ]

সপ্তম অধ্যায়

পুরী প্রত্যাবর্তন--অন্তরঙ্গগণের আগমন
রথযাত্রা--প্রতাপরুদ্র-মিলন
গৌড়ীয় ভক্তসঙ্গে আনন্দ

দক্ষিণদেশে-যাত্রার পূর্বে চৈতন্যদেব যখন পুরীতে ছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে বিজয়নগরে বাস করিতেছিলেন। ফিরিয়া আসিলে লোকের মুখে নবীন সন্ন্যাসীর রূপগুণ ও মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহার অতীব বিস্ময় জন্মিল। সন্ন্যাসীকে পুরীতে না দেখিয়া রাজা দুঃখিত হইলেন এবং সার্বভৌমকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "এরূপ মহাত্মাকে কেন আদরযত্ন করিয়া পুরীতেই রাখিলেন না, তাঁহাকে যাইতে দিলেন কেন?" সার্বভৌম সহাস্যে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ, কঠোর ত্যাগী, বাহ্যিক সুখ সুবিধার অপেক্ষা রাখেন না। কোন প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে আটকান সম্ভব নহে। তবে তাঁহাকে পুরীতেই রাখিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এবং করজোড়ে গলবস্ত্রে বারংবার প্রার্থনা করিয়াছি। তিনিও আমাদের ভরসা দিয়া গিয়াছেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে পুরীতেই আসিয়া থাকিবেন।" সার্বভৌমের বাক্যে রাজার আনন্দ হইল এবং উভয়ে যুক্তি করিয়া তাঁহার উপযুক্ত বাসস্থান নির্বাচন করিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে কাশী মিশ্র নামক শ্রীশ্রীজগন্নাথের জনৈক সেবক ভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীর এক পার্শ্বে বাগিচার মধ্যে অতি নির্জন মনোরম স্থানে, একটি সুন্দর কুটীর ঠিক করিয়া রাখা হইল।

প্রায় দুই বৎসর পরে, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে চৈতন্যদেব পুরী আসিয়া সেই কুটীরেই 'আসন' করিলেন। সৌভাগ্যবান কাশী মিশ্র নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবায় তৎপর হইলেন, এবং সার্বভৌমাদি অন্যান্য সকলেই এদিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শচীদেবী, অদ্বৈতাচার্য ও ভক্তগণকে তাঁহার শুভাগমনের সংবাদ দেওয়ার জন্য লোক প্রেরিত হইল। চৈতন্যদেব মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন, এবং আচার্য ও অন্যান্য ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে 'নমো নারায়ণায়' জানাইয়া বলিয়া দিলেন--"আগামী রথযাত্রার সময় সকলে যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিতে পুরীতে আসেন।"

সার্বভৌম চৈতন্যদেবের সঙ্গে পুরীর ভক্তিমান বিশিষ্ট সজ্জনগণের একে একে আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও মধুর স্বভাব দেখিয়া এবং সহজ-সরল ভাষায় গভীর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইল। বিশেষতঃ তাঁহার অলৌকিক ভাব-ভক্তি দেখিয়া সকলের অন্তরে গভীর শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গের সেবক জনার্দন, স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখন-অধিকারী শিখি মাইতি ও তাঁহার ভ্রাতা মুরারি মাইতি, প্রধান পাচক প্রদ্যুম্ন মিশ্র, প্রধান পূজারী প্রহরাজ মহাপাত্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং আরও অনেকে তাঁহার খুব অনুগত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা শ্রীযুত ভবানন্দ রায়-পট্টনায়ক মহাশয় পুরীতেই বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপর চারিপুত্রসহ একদিন আসিয়া চৈতন্যদেবের চরণবন্দনা পূর্বক আত্মসমর্পণ করতঃ সেবার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া এবং তাঁহার পুত্রগণের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

"দিন পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥"

ভবানন্দ রায়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাণীনাথ চৈতন্যদেবের সেবার অধিকার পাইলেন। তদবধি বাণীনাথ সদাসর্বদা তাহার নিকটে থাকিয়া প্রয়োজনমত সেবা করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যদেবের প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণের প্রাণ উল্লসিত হইল। বিশেষতঃ রথযাত্রার নিমন্ত্রণ পাইয়া গৌড়ের ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। শান্তিপুরে আচার্যগৃহে সকলে সমবেত হইয়া যুক্তি-পরামর্শ করিয়া সব স্থির করিলেন; পরে নির্ধারিত সময়ে শচীদেবীকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভক্তগণের হৃদয়ে পরম আনন্দের সঞ্চার হওয়ায় তাঁহারা খোল-করতালাদি সহ হরি-সংকীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। পথে আরও ভক্তগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া যোগ দেওয়াতে, ক্রমে উহা এক বিরাট সংকীর্তনের দলে পরিণত হইল।

ইহার কিছুদিন পূর্বে শ্রীমৎ পরমানন্দ পুরী নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি একদিন মিশ্রগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শচীদেবীর নিকট চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখাসাক্ষাতের কথা বলেন। তাঁহার মুখে চৈতন্যদেবের খবর পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণের খুব আনন্দ হইয়াছিল। তাঁহারা বিশেষ সম্মানপূর্বক আদর-যত্ন সহকারে তাঁহাকে কিছুকাল নবদ্বীপে রাখিয়া-

ছিলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবের পুরী প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেঁছিলে, পুরীজী আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি পুরী চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া এবং তাঁহার মুখে শচীদেবী ও ভক্তগণের সংবাদ জানিতে পারিয়া চৈতন্য-দেবের মনে অতীব হর্ষের সঞ্চার হইল। ধ্যানসিদ্ধ পুরীজীকে চৈতন্যদেব গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। তাই বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাসস্থানের নিকটেই এক নির্জন কুটীরে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার সেবার জন্য একজন সেবকও নিযুক্ত হইল। ধ্যানধারণাশীল তপস্বী, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানপ্রবীণ পুরীজীর সঙ্গলাভ করিয়া চৈতন্যদেব বিশেষ উল্লসিত হইলেন।

পরমানন্দজী উপস্থিত হইবার কিছুকাল পরে শ্রীমৎ দামোদর স্বরূপ নামক আর একজন মহাত্যাগী তত্ত্বদর্শি-প্রেমিক দশনামী ব্রহ্মচারী আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া চৈতন্যদেবের আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইল। দামোদর স্বরূপের পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য, জন্মস্থান নবদ্বীপ। চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়স একটু বেশী হইলেও বাল্যকালেই খুব সৌহার্দ ছিল। পুরুষোত্তম আচার্য অতিশয় সুকণ্ঠ ও উচ্চশ্রেণীর কীর্তনীয়া ছিলেন। ভক্তি-শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। নবদ্বীপে তাঁহার সহিত চৈতন্যদেব সর্বদা গভীর ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া রস আস্বাদন করিতেন।

"সংগীতে গন্ধর্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥"

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম আচার্যও সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী গমন করেন। শিখা-সূত্র ত্যাগ করতঃ যোগপট্ট গ্রহণ পূর্বক চতুর্থাশ্রমী না হইয়া তিনি গৈরিক ধারণ পূর্বক দশনামী মঠে 'ব্রহ্মচারী' রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।[১]

"সন্ন্যাস করিলা শিখাসূত্র ত্যাগ রূপ।
যোগপট্ট না লইয়া হইলা স্বরূপ॥"

তাঁহার স্বরূপ উপাধি দেখিয়া মনে হয়, তিনি শারদা মঠের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মচারী ছিলেন। কারণ শারদা মঠের ব্রহ্মচারীদিগের স্বরূপ উপাধি। মঠস্থ ব্রহ্মচারীরা বিরজা-হোম করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইলেও তাঁহাদের সংসারাশ্রমের সঙ্গে

১ মঠভেদে ব্রহ্মচারিগণের উপাধি পৃথক—আনন্দ, স্বরূপ, চৈতন্য, প্রকাশ ইত্যাদি।

কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁহারা সন্ন্যাসীদিগের মত গৈরিক ধারণপূর্বক ত্যাগ তপস্যাময় জীবন ও ভিক্ষান্নে উদর পালন করেন।

দামোদর স্বরূপ ঐরূপে কাশীতে বাস করিয়া দশনামী কোন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে চৈতন্য-দেবের পূত সঙ্গ ও তাঁহার ভাব-ভক্তির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল; তাই এখন চৈতন্যদেব পুরীতে আছেন শুনিয়া তিনিও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া চৈতন্যদেব অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং বিশেষ সমাদরে নিজের নিকটেই আসনের ব্যবস্থা করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণতার জন্য চৈতন্যদেব দামোদরের পরামর্শ সর্বদা লইতেন। দামোদর স্বরূপ ও পরমানন্দ পুরীজী এই দুইজন যেন তাঁহার দুই বাহু। ধ্যান-ধারণাদি বিষয়ক আলোচনায় পুরীজী তাঁহার সহায় হইতেন এবং রসতত্ত্বাদি বিষয়ে ও সুমিষ্ট কীর্তনে দামোদর স্বরূপ ছিলেন তাঁহার সুহৃদ্।

"পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন।
ন্যাসীরূপে ন্যাসীদেহে বাহু দুইজন॥"

… … …

"নীলাচলে প্রভুর সঙ্গী যত ভক্তগণ।
সবার অধিক প্রভুর মর্মী দুইজন॥

… … …

পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর॥"

ইতিমধ্যে রায় রামানন্দও পুরীতে আসিয়া পুনরায় মিলিত হইলেন। রায় বলিলেন রাজা তাঁহাকে বিষয়কর্ম হইতে মুক্তি দিয়া পুরীতে নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বরাবর বাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন। রায়কে পাইয়া এবং তাঁহার উপর রাজার অনুগ্রহের কথা জানিয়া অতীব উল্লসিত চৈতন্যদেব সকলের সঙ্গে রায়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার মহিমার কথা সকলেই পূর্বে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে সাক্ষাতে উপলব্ধি করিয়া সুখী হইলেন। রায় ও দামোদর স্বরূপ, এই দুইজন চৈতন্যদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ; কারণ ভগবৎতত্ত্ব ও রসশাস্ত্রে তাঁহাদের অসীম অধিকার এবং উভয়েই সমভাবের ভাবুক ছিলেন। এখন হইতে চৈতন্যদেবের বাকী জীবনের সঙ্গে ইঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজধানী কটকেই অধিকাংশ সময় বাস করিলেও, রথযাত্রাদি পর্বোপলক্ষে এবং মধ্যে মধ্যে অন্যান্য সময়েও পরিবার-

পরিজনসহ পুরীতে আসিতেন। সেইজন্য পুরীতেও তাঁহার রাজভবন ছিল। চৈতন্যদেবের পুরী প্রত্যাবর্তনের খবর পাইয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সার্বভৌমকে পত্র দিয়া জানাইলেন যে তিনি চৈতন্য-দেবকে দর্শন করিবার জন্য শীঘ্রই পুরীতে আসিবেন। এই সুসংবাদ লইয়া সার্বভৌম চৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

"সার্বভৌম কহে, এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হইয়া তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু, স্মরে নারায়ণ।
সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত৹ আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥

... .

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা হেথা না দেখিবে॥"

সার্বভৌম ভীত ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং রাজাকে জানাইলেন, "মহাত্যাগী সন্ন্যাসী রাজদর্শনে অনিচ্ছুক।" খবর শুনিয়া রাজার চিত্তও বিষণ্ণ হইল, কিন্তু তিনি ভরসা না ছাড়িয়া সার্বভৌমকে অনুরোধ করিলেন, বিশেষভাবে পুনরায় চেষ্টা করিবার জন্য। সার্বভৌম মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া প্রভুপাদ নিত্যানন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন, এবং একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা পাড়িলেন। রাজার ভক্তি-বিশ্বাসের কথা, বিশেষতঃ চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠার বিষয় শুনিয়া সকলেরই মনে হর্ষের সঞ্চার হইল। ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। ইহাতেও কোন ফল হইল না। চৈতন্যদেব বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"তোমা সবা এই ইচ্ছা আমারে লইয়া।
রাজারে মিলহ ইহোঁ কটকে যাইয়া॥
পরমার্থ যাউক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥"

অনেক অনুরোধেও যখন তাঁহার মনে রাজদর্শনের ইচ্ছা হইল না তখন নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের অনুমতি লইয়া রাজার প্রীতির জন্য অন্য ব্যবস্থা দিলেন।

তাঁহার ব্যবহৃত এক পুরাতন গৈরিক বহির্বাস সেবকের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া কটকে রাজার নিকট প্রেরিত হইল। প্রসাদী বস্ত্র পাইয়া রাজার অন্তরে অতিশয় আনন্দের সঞ্চার হইল। ঐ সময়ে রামানন্দ অন্যত্র ছিলেন। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি পুরী আসিবার পথে কটকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রথযাত্রা নিকটবর্তী হওয়াতে রাজাও রায়ের সহিত পুরী আসিলেন। পুরী আসিবার পর রাজার সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের সমস্ত কথাবার্তা রায়ের কর্ণগোচর হইল, এবং রায়ের সঙ্গে চৈতন্যদেবের গভীর প্রণয় দেখিয়া সার্বভৌম তাঁহাকেই ধরিয়া বসিলেন, কোনপ্রকারে চৈতন্যদেবকে সম্মত করিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য।

রাজার একান্ত অনুগত কর্মচারী রামানন্দও রাজার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বভাবতই সচেষ্ট হইলেন।

"রাজ-মন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহার নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় প্রভুর মন ॥"

বিচক্ষণ রাজনীতিক রায় রামানন্দ কথাপ্রসঙ্গে রাজার ভগবদ্‌ভক্তি, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, সেবাসৎকার, দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া, দান-পরোপকার ও প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও মহত্ত্বের কথা চৈতন্যদেবের নিকট বলেন; এবং তিনি যে তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছেন ইহাও রাজার অনুগ্রহেই,—এ কথাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। এইরূপে সদাসর্বদা রায়ের মুখে রাজার অন্তরের পরিচয় পাইয়া ক্রমে ক্রমে চৈতন্যদেবের মন তাঁহার প্রতি স্নেহপ্রবণ হইল। রায় যখন বুঝিলেন, চৈতন্যদেবের মন নরম হইয়াছে তখন,—

"রামানন্দ প্রভুপদে কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে, রামানন্দ, দেখ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহু লোকে করে উপহাস ॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥
প্রভু কহে, 'আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু, যৈছে না লুকায়॥

রায় কহে, কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক, তোমার ভক্ত গজপতি ॥
প্রভু কহে, পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজ নাম ॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্র এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥"

রামানন্দ সার্বভৌমকে সকল কথা জানাইলেন। ভবসা পাইয়া উভয়ের মনে খুব আনন্দের সঞ্চার হইল এবং একদিন যুবরাজকে লইয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করাইলেন। কিশোর রাজপুত্রেব সুবিনীত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে চৈতন্যদেবের খুব আনন্দ হইল; এবং তাঁহাব স্নেহ-মধুর উপদেশবাক্যে বালকেবও মনঃপ্রাণ মোহিত হইল।

পুত্রের মুখে নবীন সন্ন্যাসীব অতিশয় উজ্জ্বল দিব্যকান্তি, এবং কারুণ্য-পূর্ণ ব্যবহারের পবিচয় পাইয়া রাজার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রাজা সার্বভৌমকে জানাইলেন, "চৈতন্য-দেব যদি রাজা বলিয়া দেখা করিতে অসম্মত হন, তবে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিবেন।" রাজার মনোভাব বুঝিয়া সার্বভৌম এবং রামানন্দ উভয়েরই খুব চিন্তা হইল। দেশের অবস্থা তখন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল।

গৌড়ের মুসলমান অধিপতি হুশেনশাহ দিল্লীর বাদশাহের সহায়তায় বলীয়ান হইয়া উড়িষ্যা দখল করিবার জন্য বারবার আক্রমণ করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র বীরেন্দ্রকেশরী প্রতাপরুদ্রের প্রতাপেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই আছে। এমন সঙ্কট-সময়ে প্রতাপরুদ্র সিংহাসন ত্যাগ করিলে দেশের দুরবস্থাব সীমা থাকিবে না।

বুদ্ধিমান রামানন্দ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন রথযাত্রার সময়ে যে-রূপেই হোক চৈতন্যদেবের সঙ্গে রাজার মিলন ঘটাইবেন। সার্বভৌম ও রামানন্দ দুইজন মিলিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন; তাঁহাদের বাক্যে রাজার মন ধৈর্য ধরিল।

চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরী মহারাজের গোবিন্দ ও কাশীশ্বর নামে দুইজন অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক ছিলেন। দেহত্যাগের

পূর্বে পুরীজী মহারাজ সেবকদ্বয়কে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহারা উভয়ে যেন চৈতন্যদেবের সেবা করেন। চৈতন্যদেবের পুরী প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে গোবিন্দ আসিয়া পুরীজীর দেহত্যাগের খবর দিলেন, এবং তাঁহার শেষ অভিপ্রায় জানাইয়া সেবাধিকার প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন কাশীশ্বরও তীর্থদর্শনান্তে কিছুকাল পরে আসিয়া মিলিত হইবেন। দীক্ষাগুরুর অদর্শনের কথা শুনিয়া চৈতন্যদেবের অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে গোবিন্দকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন, এবং নিজের প্রতি গুরুদেবের অসীম কৃপার বিষয় উল্লেখ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বারংবার তাঁহাব উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে গোবিন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার গুরুদেবের সেবক, অতএব আমার পরমপূজ্য, আপনাকেই আমার সেবা করা কর্তব্য। আপনার সেবা আমি কিরূপে গ্রহণ করিব?" গোবিন্দ নিরস্ত হইলেন না, তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীজীর আদেশ জানাইয়া ব্যাকুল ভাবে অনুনয় করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের আন্তরিকতা দেখিয়া সকলেরই চিত্ত দ্রব হইল। বিশিষ্ট ভক্তগণের অনুরোধে এবং গুরুর আজ্ঞা সর্বথা পালনীয় বলিয়া অবশেষে চৈতন্যদেব গোবিন্দকে কাছে রাখিতে সম্মত হইলেন। তদবধি গোবিন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার নিকটে থাকিয়া ও প্রাণপণে সেবা করিয়া নিজ জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। সার্বভৌম গোবিন্দকে শূদ্রজাতীয় দেখিয়া চৈতন্যদেবকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুরীজী মহারাজ শূদ্র সেবক রাখিয়াছিলেন কিরূপে?" তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া চৈতন্যদেব হাসিতে হাসিতে উত্তর দিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহ-লেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার।
স্নেহ বশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥"

কামকাঞ্চনাসক্তি লোভমোহ ক্রোধ-দম্ভ দর্প-অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু ভগবান লাভের পথে প্রবল অন্তরায়, এই সকল ত্যাগই চৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর পরম গৌরব। বাহ্যিক ত্যাগের আড়ম্বর, লোক-দেখান বৈরাগ্য তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। অন্তরের নিষ্ঠা ও অনাসক্তিকেই তিনি প্রশংসা করিতেন। সেই সময়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী পুরীতে বাস করিতেছিলেন। লোকমুখে চৈতন্যদেবের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল মৃগচর্ম। ভারতীজী অন্তরের ত্যাগ-তপস্যাকে মুখ্য মনে না করিয়া বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদে ত্যাগের আড়ম্বর প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া চৈতন্য-

দেবের মনে দুঃখ হইল। ভারতী মহারাজের পরিচয় প্রদান করিতে চাহিলে, মুকুন্দ দত্তকে বিস্মিত ভাবে চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ভারতী মহারাজ?" মুকুন্দ ভারতীজীকে দেখাইয়া দিলে অধিকতর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "ইনি? কখনই হইতে পারে না। জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতী মহারাজ চর্ম পরিধান করিবেন কেন?"

"ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়া ত ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথা ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে তিঁহো নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥"

ভারতীর লজ্জা উপস্থিত হইল, তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চর্ম ছাড়িয়া গৈরিক ধারণ করিলেন। চৈতন্যদেব তখন অতিশয় সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাবার্তায় চৈতন্যদেবের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মানন্দজীর চিত্ত মুগ্ধ হইল, তদবধি বাকী জীবন তিনি তাঁহারই সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। ভারতী মহা-রাজের প্রতি চৈতন্যদেবের অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি, গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়া অচল॥"

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা উপস্থিত হইল। চৈতন্যদেব ভক্তগণসহ স্নানযাত্রা উৎসবে যোগদান করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। স্নানযাত্রার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথের অঙ্গরাগ হয় বলিয়া মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ থাকে, দর্শন মিলে না। চৈতন্যদেব সেই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথের অদর্শনে দুঃখী হইয়া আলালনাথে বাস করিবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন খবর পেঁৗছিল গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীর নিকটবর্তী হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন।

নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া আচার্য, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণ খোল করতাল শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া সংকীর্তন করিতে করিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বহুদিনের পর পুরীর প্রবেশদ্বার আঠারনালার নিকটবর্তী

হইলেন। খবর পাইয়া চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য মহাপ্রসাদ ও মালাচন্দন সহ দামোদর স্বরূপ ও গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তখন পুরীতে উপস্থিত। গোপীনাথ আচার্যের মুখে রাজা শুনিলেন, চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ প্রায় দুইশত বিশিষ্ট ভক্ত রথযাত্রা দর্শন করিবার জন্য গৌড়দেশ হইতে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে পুরীতে আসিতেছেন। এই খবরে রাজা অতীব বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন, এবং একজন কর্মচারীর উপর তাঁহাদের আদর-অভ্যর্থনা এবং আহার-বাসস্থানের সুব্যবস্থার ভার অর্পণ করিলেন।

ভাববিহ্বল গৌড়ীয় ভক্তগণ হরিনাম-জয়ধ্বনিতে ধরণী-গগন কম্পিত করিয়া বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় পুরী প্রবেশ করিলেন। সংকীর্তনের গম্ভীর সুমধুর ধ্বনি পুরীবাসীর শ্রুতিগোচর হইবামাত্র চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল।

"কীর্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি নীলাচলবাসী শুনি দেখিবারে ধায় আগে-পাছে ॥"

—প্রেমদাসের পদ

অগণন ভক্তসমাবেশ এবং এমন ভাবগম্ভীর কীর্তন, নৃত্য ও মুহুর্মুহুঃ ভাবাবেশ দেখিয়া সমাগত জনমণ্ডলী উল্লসিত হৃদয়ে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্ত বারিধির গুরুগর্জনের সহিত সেই ধ্বনি মিলিয়া দারুব্রহ্মের পুরীকে শব্দব্রহ্মের পুরী করিয়া তুলিল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপীনাথ আচার্যকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার উপর হইতে ভক্তগণের এই অদ্ভুত সংকীর্তন দেখিতে লাগিলেন। ভক্তগণকে দেখিয়া এবং সুমধুর কীর্তন শুনিয়া মুগ্ধচিত্ত রাজা আচার্যকে বলিলেন,—

"কোটি সূর্যসম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥
ভট্টাচার্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সংকীর্তন ॥"

ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চৈতন্যদেব স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিলেন। আচার্য, শ্রীবাস, মুরারি, শ্রীধর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে অনেকদিন পর তাঁহার দেখা, তাই অন্তরে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ভক্তগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া এবং প্রেমালিঙ্গন দিয়া আপ্যায়িত করিলেন, এবং

অবশেষে সাদরে স্বীয় বাসস্থানে লইয়া গেলেন। বাণীনাথ পূর্বেই মহাপ্রসাদ ও মালাচন্দন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব স্বহস্তে তাহা বিতরণ করিলে উহা ধারণ করিয়া ভক্তগণের চিত্ত অতিশয় উৎফুল্ল হইল। বিশ্রামের পর ভক্তগণ চৈতন্যদেবের সঙ্গে কুশলবার্তা ও আলাপ-আলোচনায় রত হইলেন। ইতিমধ্যে কাশী মিশ্রকে সঙ্গে লইয়া রাজকর্মচারী আসিয়া জানাইলেন, ভক্তগণের অবস্থানের জন্য বাসস্থান ঠিক করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব গোপীনাথকে পাঠাইয়া সেইসব বাসার তদারক ও সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর করাইলেন, এবং ভক্তগণকে বলিয়া দিলেন যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ বাসা ঠিক করিয়া এবং সমুদ্রস্নানান্তে মন্দির-চূড়ার চক্র[১] দর্শন করিয়া পুনরায় সেখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ধারণ করেন।

সমাগত ভক্তগণের মধ্যে হরিদাসকে না দেখিয়া চৈতন্যদেবের মনে অতিশয় চিন্তা হইল। পরে খবর লইয়া জানিলেন, হরিদাস পুরীতে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিকটে না আসিয়া দূরে রাজপথের পাশে একান্তে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। চৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু,-

"হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥"

চৈতন্যদেবের আদেশ অনুযায়ী ভক্তগণ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে হরিদাস জানাইলেন,—

"নিভৃতে টোটা[২] মধ্যে স্থান যদি পাই।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একেলা কাল গোয়াই॥"

হরিদাসের আন্তরিক অভিপ্রায় জানিয়া চৈতন্যদেব কাশী মিশ্রকে বলিয়া নিজ বাসস্থানের নিকটেই অতি নির্জন একটি কুটির ঠিক করিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। হরিদাসকে দেখিয়াই তাঁহার অন্তরের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল, এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইলে সন্ত্রস্তভাবে পিছনে গিয়া,—

"হরিদাস কহে প্রভু! না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥"

---

১ সেই সময় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকায় চূড়া দর্শন করিতে বলিলেন। বিগ্রহের দর্শন না মিলিলে চূড়া দর্শন করিয়াই জগন্নাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করার নিয়ম।

২ টোটা—বাগিচা। সিদ্ধ বকুল নামে ঐ স্থান বর্তমানে পরিচিত। কাশী মিশ্রের ভবন—রাধাকান্ত মঠের সন্নিকটেই উক্ত স্থান।

চৈতন্যদেব ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপ, দান ॥
নিরন্তর চারিবেদ কর অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরমপাবন ॥"

চৈতন্যদেব হরিদাসকে লইয়া গিয়া পূর্বনির্দিষ্ট কুটির দেখাইয়া বলিলেন,

"এই স্থানে রহি কর নাম সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঁই আসিবে তোমার প্রসাদান্ন ॥"

হরিদাসের খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া চৈতন্যদেবের মনে খুব আনন্দ হইল, অতঃপর নিশ্চিন্তচিত্তে সমুদ্রস্নান করিয়া আসিলেন। ভক্তগণও তাঁহার আদেশ অনুযায়ী সমুদ্রস্নান ও শ্রীমন্দিরের চূড়ার চক্র দর্শনান্তে আসিয়া মিলিত হইলেন। পাতা দেওয়া হইল, ভক্তগণকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া তিনি স্বয়ং পরিবেশন আরম্ভ করিলেন।

"সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥
অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন একের পাতে ॥"

সকলেরই পাতে প্রসাদ পড়িল, কিন্তু ভক্তগণ হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন, মুখে দিলেন না। স্বরূপ দামোদর ভক্তগণের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তিনি না বসিলে কেহ আহার করিবেন না।

"তোমা সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন।
গোপীনাথাচার্য সবে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥
আচার্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লইয়া।
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া ॥
নিত্যানন্দ লইয়া ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥"

সকলের আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে শ্রীমৎ

নিত্যানন্দ প্রভু, পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া একটু দূরে ভক্তগণের সম্মুখে পৃথক পংক্তিতে ভিক্ষা করিতে বসিলেন। গোপীনাথ আচার্য আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণকে পরিবেশনের ভার লইয়াছিলেন স্বরূপ দামোদর ও জগদানন্দ। চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহারা ভক্তগণকে প্রচুর প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, তাঁহারা চৈতন্যদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং তিনি ভিক্ষান্ন মুখে দিলে পর জয়ধ্বনি করিতে করিতে পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করতঃ ভক্তগণের সমস্ত ক্লান্তি ও পথশ্রম দূর হইয়া গেল।

এখানে দ্রষ্টব্য,—(ক) চৈতন্যদেব ভক্তগণের সঙ্গে এক পংক্তিতে না বসিয়া কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে পৃথক পংক্তিতে বসিলেন। (খ) ভক্তগণকে যাহা পরিবেশন করা হইল, তাঁহারা সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের পৃথক ভিক্ষার ব্যবস্থা হইল। (গ) হরিদাসকে ভক্তগণের সঙ্গে না বসাইয়া, তাঁহার কুঠিয়াতেই প্রসাদ পাঠান হইল। (ঘ) ভক্তগণকেও ইচ্ছানুরূপ বসিতে না দিয়া বিচার-বিবেচনা পূর্বক যথাযোগ্য ক্রমে বসান হইল। পাঠকের মনে এই সকল বিষয়ে সংশয় হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যিনি স্বপ্রচারিত পরম উদার ধর্মমতে মনুষ্য মাত্রেরই সমান অধিকার ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এইসকল ভেদবুদ্ধি শোভা পায় না।

বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার মনে কোনপ্রকার ভেদবুদ্ধি ছিল না,—ইহা তাঁহার জীবনে, কাজে ও কথায় সর্বত্র দেখা যায়। তথাপি পারমার্থিক সত্য, জ্ঞান ও ভক্তি যেমন অধিকারীভেদে তারতম্যে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ লৌকিক ব্যবহারেও উচ্চনীচ ভালমন্দের তারতম্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। ধর্মপ্রচারকগণ এইসকল লোকব্যবহারকে দেশকালোপযোগী করিয়া গঠন করেন সত্য, কিন্তু উহাকে অকস্মাৎ একেবারে ভাঙ্গিয়াচুরিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন না। তাঁহারা সমাজে যে ভাবের প্রেরণা আনয়ন করেন, তাহারই স্বাভাবিক ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে নতুন বিধান গড়িয়া উঠে। সেইজন্য আমরা দেখি চৈতন্যদেব তখনকার সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা যথাসম্ভব পালন করিয়া চলিতেছেন।

(ক) শাস্ত্র গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদিগের আচার-ব্যবহার পৃথক করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি নিজের নিজের আচার ঠিক রাখার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, এবং স্বয়ংই সন্ন্যাসীদিগের সহিত গৃহস্থ ভক্ত হইতে পৃথক বসিলেন। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতাচার্যাদি গৃহস্থ ভক্তগণকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিলেও, গৃহস্থ ভক্তগণের সঙ্গে না থাকিয়া সন্ন্যাসিগণের সঙ্গেই বাস করিতেন।

(খ) সন্ন্যাসীদের ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করার বিধি সন্ন্যাসী হওয়ার পর হইতে চৈতন্যদেব বরাবর পালন করিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি ভক্তগণের জন্য আনীত প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া গোপীনাথাচার্য-প্রদত্ত ভিক্ষান্নই গ্রহণ করিলেন। গোপীনাথ পূর্বাহ্নেই সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন।

(গ) তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও কঠোরতার বিষয় অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, যবন হরিদাসকে লইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিলে তাঁহার ও গৃহস্থ ভক্তগণের পক্ষে পুরীতে বাস, এমনকি সমাজে থাকাই অসম্ভব হইত। জোর করিয়া প্রাচীন নিয়মকে হঠাৎ ভাঙ্গিতে গেলে সমাজের সর্বত্র ভয়ানক বিপ্লব বাধে, তাহাতে সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হয়। আধ্যাত্মিকতা-জ্ঞান-ভক্তি-অনুভূতি একান্তই অন্তরের বস্তু, উহা অন্তরেই গোপন রাখিয়া যতদূর সম্ভব সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার মানিয়া চলিলে জীবনযাত্রা সহজ হয় এবং ভগবদ্ভজনেরও সুবিধা হয়।

(ঘ) বয়স যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা বিচার-বিবেচনা করিয়াই 'যথা-যোগ্যক্রমে' আসন-উপবেশনের নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত। চৈতন্যদেব সেইজন্যই 'যোগ্যক্রম' পংক্তি করিয়া বসাইলেন। তিনি যতদূর সম্ভব সমস্ত জীবন এই সকল রীতিনীতি মানিয়া চলিয়াছেন। অতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকিত, এইজন্যই এখানে আমরা ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। তাঁহার যখন ভাবাবস্থায় দৃষ্টি বাহিরে থাকিত না তখন নিজের দেহের পর্যন্ত বিস্মৃতি হইত, নতুবা সাধারণ অবস্থায় সকল বিষয়েই নজর রাখিতেন এবং লোকব্যবহারে অতি নিপুণ ছিলেন।

সন্ধ্যাসমাগমে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণসহ মন্দিরে গিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ সকলের গলায় প্রসাদীমালা ও কপালে চন্দনের টিপ পরাইয়া দেওয়ায় ভক্তগণের অন্তরে অধিকতর উল্লাসের সঞ্চার হইল।

বহুদিন পরে চৈতন্যদেবকে পাইয়া ভক্তগণের এবং ভক্তগণকে পাইয়া চৈতন্য-দেবের আনন্দের পরিসীমা নাই। বহুকাল পরে আজ আবার একত্রে মিলিয়া সংকীর্তন। তাহাতে আবার শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া সংকীর্তন আরম্ভ হইল; সঙ্গে অষ্ট মৃদঙ্গ ও বত্রিশ করতাল। ভাবে বিভোর চৈতন্যদেব সেই সংকীর্তনের মধ্যস্থলে মনোহর নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার সেই ভাবাবিষ্ট উজ্জ্বল দেবমূর্তি, মনোমোহন অঙ্গ-ভঙ্গিমা, ভক্তি-ভাবোদ্দীপক ললিত নৃত্য দেখিয়া সকলের মন ভাবাবিষ্ট হইতেছে। ক্রমে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্তন চলিতে লাগিল, এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও বক্রেশ্বর—এই চারিজন চারি সম্প্রদায়ের পুরোভাগে নৃত্য করিয়া কীর্তন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সংকীর্তনের সুমধুর ধ্বনিতে চারিদিক হইতে

লোক ছুটিয়া আসিল, এমনকি অনেকে সেই অদ্ভুত কীর্তন দেখিবার জন্য অট্টালিকার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৌড়ীয়দের মধুর কীর্তন নৃত্যগীত ও ভাবাবেশ দেখিয়া উড়িষ্যাবাসীরা আনন্দে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা বাঙালীর ভক্তিভাবের এবং শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করিল। কীর্তন শেষ হইলে সেবকগণ প্রসাদ আনিয়া দিলেন, উহা ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে বিদায় লইয়া রাত্রির মত সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন।

আবাল্য সঙ্গী অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া চৈতন্যদেব এইভাবে পুরীতে প্রেমানন্দের মেলা বসাইলেন। ক্রমে রথযাত্রা নিকটবর্তী হইতেছে। দেহরথে বামনরূপী পরমাত্মার প্রতীকরূপে পুরীর রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শনের আশায় সকলের মন উৎফুল্ল। বিশেষতঃ চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় ভক্তগণের উল্লাসের অবধি নাই। রথে চড়িয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব 'গুণ্ডিচাবাড়ী' নামক স্থানে গমন করেন এবং পুনর্যাত্রা পর্যন্ত সেইখানেই থাকেন। রথযাত্রার পূর্বে চৈতন্যদেব একদিন গৌড়ীয় ভক্তগণকে লইয়া 'গুণ্ডিচাবাড়ী'তে গেলেন এবং ভক্তগণসহ সমস্ত বাড়ীঘর, দরজা, সিংহাসন-বেদী, সিঁড়ি, রাস্তা প্রভৃতি সমুদয় স্থান স্বহস্তে সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া পরে শত শত কলসী জল ঢালিয়া ধুইয়া মুছিয়া নির্মল করিতে লাগিলেন। একে একে জগমোহন (মূলমন্দির), ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, পাকশালা, উঠান ও সমস্তই পরিষ্কার হইল। মন্দির ও সিংহাসন-বেদী স্বয়ং বিশেষভাবে ঝাড়িয়া ধুইয়া, শেষে স্বীয় বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া নিজের মনের মত করিয়া নির্মল করিলেন। ভক্তগণের কাজে প্রেরণা যোগাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্বক জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। আবার প্রত্যেকের কাছে গিয়া কাজের খুঁটিনাটি দেখাইয়া দিয়া সকলের উৎসাহ বর্ধন করিলেন। ঝাঁট দেওয়ার সময় বলিলেন, "সকলের কাজের পরীক্ষা হইবে, প্রত্যেকে ঝাঁট দিয়া আবর্জনা পৃথক পৃথক রাখ।" পরীক্ষায় দেখা গেল সর্ব-কর্মপটু ক্ষিপ্রহস্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার সংগৃহীত আবর্জনার পরিমাণই সকলের চেয়ে বেশী হইয়াছে। জল আনা খুব পরিশ্রমের কাজ, সেই জন্য বয়স এবং মর্যাদা বিবেচনা করিয়া অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, পরমানন্দ পুরীজী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও দামোদর স্বরূপ, এই পাঁচ-জনকে জল আনিতে দিলেন না।

অপরে জল ভরিয়া আনিল, তাঁহারা সেই জল দ্বারা মার্জনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কাজ করিয়া ভক্তগণের উল্লাসের সীমা নাই, কে কাহাকে রাখিয়া আগে জল আনিবে, ঠেলাঠেলি ও ঠেকাঠেকিতে কত কলসীই ভাঙ্গিয়া গেল। রাজভাণ্ডার হইতে শত শত ঝাড়ু ও শত শত কলসী আসিয়াছিল, কাজেই কোন অভাব হইল না।

"শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥
নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দির।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহির॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লয়ে যায় আর শতজন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহাঁ বিনা আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥
জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ-হরিধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যে যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হৈলা তাহে সঙ্কেত সর্ব কামে॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥
শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥"

মন্দির মার্জনা শেষ হইলে পর সকলের হৃদয়ে বিশেষ উল্লাসের সঞ্চার হওয়াতে কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিকটস্থ নরেন্দ্র সরোবরে সকলে একত্রে পরমানন্দে স্নান করিলেন। স্নানের সময় খুব জল-ক্রীড়া হইল। সর্ববিদ্যাবিশারদ সর্বাগ্রণী চৈতন্যদেবের অদ্ভুত জল-ক্রীড়া,—সন্তরণ, ডুব দেওয়া, জলে ভাসা ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে পারদর্শিতা দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পূর্বের ব্যবস্থা অনুসারে বাণীনাথ ও মন্দিরের প্রধান কর্মচারী তুলসী পড়িছা প্রচুর প্রসাদ আনিয়া রাখিয়াছিলেন. স্নানান্তে ভক্তগণসহ চৈতন্যদেব পরম আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

রথযাত্রার ঠিক পূর্বদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব। স্নানযাত্রার পর হইতে 'বেশ' পরিবর্তনের জন্য মন্দির বন্ধ থাকে, তখন বিগ্রহের দর্শন পাওয়া

পুরীতে নরেন্দ্র-সরোবরতীরে সপরিকর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন এই ঐতিহাসিক চিত্রটি উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের প্রকটকালেই কোন শিল্পীকে দিয়া অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের দেহাবসানের পর বিরহাকুল শ্রীনিবাস আচার্যকে পরে এই চিত্র উপহৃত হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর উক্ত চিত্রখানি তদীয় শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারকে উপহার দেন। তদবধি এই চিত্র মুর্শিদাবাদে নন্দকুমারের প্রাসাদ—কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

যায় না। নেত্রোৎসবের দিন দরজা খোলে, সেইদিন দেবদর্শনের জন্য মন্দিরে খুব ভিড় হয়। কয়েকদিনের অদর্শনে উৎকণ্ঠিত চৈতন্যদেব অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের আশায় অতীব উৎফুল্ল। ভক্তগণসহ ত্বরায় মন্দিরে গমন করিলেন এবং ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া নিকটে ভোগমণ্ডপে গিয়া তৃষিত চাতকের মেঘ-দর্শনের ন্যায় নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

"আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইয়া॥
পাছে আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুইজন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা সবে জগন্নাথের ভবন॥
দরশন লোভেতে করি মর্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন॥
তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমরযুগল।
গাঢ় তৃষ্ণা পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল॥"

রথযাত্রার দিন রাত্রি থাকিতেই স্নান-কৃত্য সম্পাদন করিয়া চৈতন্যদেব ভক্তগণসহ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে রাজপথে বিশালকায় অতি মনোহর সুসজ্জিত রথ তিনখানি শোভা পাইতেছে। বলরাম ও সুভদ্রাসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইবার জন্য পাণ্ডাগণ মন্দিরের বাহিরে আনয়ন করিলেন।

"তবে প্রতাপরুদ্র করে স্বহস্তে সেবন।
সুবর্ণ মার্জনী লৈয়া করে পথ সম্মার্জন॥
চন্দনজলেতে করে পথ নিসিঞ্চন।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ সিংহাসন॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥"

রাজার ভক্তিপূর্ণ সেবা দেখিয়া চৈতন্যদেবের মন অতিশয় প্রসন্ন হইল। শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্যন্ত প্রায় অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ অতি সুন্দর সরল রাজপথ। সেই রাজপথে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথারোহণ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। ভক্তগণসহ চৈতন্যদেব জনতার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলে উল্লসিত জনসমুদ্রে যেন তুফান ছুটিল, লক্ষ-কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। নানাপ্রকার বাদ্য, ভক্তগণের প্রার্থনা,

স্তবস্তুতি ও আনন্দধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। রথরজ্জু ধারণ করিয়া ভক্তগণ টানিতে লাগিলেন; ধীরে ধীরে রথ চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ রথে চড়িলে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণসহ কীর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সংকীর্তনের সাত সম্প্রদায় হইল। সম্মুখে চারি সম্প্রদায়, দুই পাশে দুই, এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্তন করিতে লাগিলেন। এক এক সম্প্রদায়ে দুই দুই করিয়া মোট চৌদ্দটি মাদল বাজিতে লাগিল। চৈতন্যদেব প্রথম চারি-সম্প্রদায়ে স্বরূপদামোদর, শ্রীবাস মুকুন্দ ও গোবিন্দ এই চারিজনকে প্রধান গায়ক করিয়া দিয়া তাঁহাদের এক এক জনের সঙ্গে আবার বাছিয়া বাছিয়া পাঁচজন করিয়া ভাল গায়ককে ('পালি গায়েন) জুড়িদার করিয়া দিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারিজনকে উক্ত চারি সম্প্রদায়েব প্রধান নর্তকরূপে নৃত্য পরিচালক করিলেন। অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দের পরিচালনায় শান্তিপুরেব এক দল, রামানন্দ ও সত্যরাজ খানের নেতৃত্বে কুলীনগ্রামের এক দল, এবং নরহরি ও রঘুনন্দনের অধীনে শ্রীখণ্ডের এক দল,—এইরূপে মোট সাত সম্প্রদায় গঠিত হইল। চৈতন্যদেব ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই মিলিত হইয়া সকলের উৎসাহবর্ধন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব সংকীর্তন, ভক্তগণের ভাব-ভক্তি-উল্লাস আর মনোহর নৃত্যগীত-বাদ্যে সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণসহ চৈতন্যদেবের সৃষ্ট মহাসংকীর্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

কিছুক্ষণ চলিবার পর রথ এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অমনি চৈতন্যদেব সাত সম্প্রদায়কে একত্রে মিলাইয়া স্বয়ং কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কয়েকজন নির্বাচিত প্রধান গায়ককে সঙ্গে লইয়া দামোদর হইলেন সঙ্গের 'পালি গায়েন'।

> "দণ্ডবৎ করি প্রভু জুড়ি দুই হাত।
> ঊর্ধ্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।"

ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবের তেজোময় দেহকান্তি, অপূর্ব নর্তন-কীর্তন দর্শন করিবার জন্য চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ ভিড় করিল। জনতাকে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য ভক্তগণ হাতে হাত ধরিয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন। এইরূপে—

> "লোক নিবারিতে হইল তিন মণ্ডল।
> প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥
> কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
> হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়া বরণ॥

বাহিরে প্রতাপরুদ্র লইয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ॥"

মণ্ডলের মধ্যস্থলে প্রশস্ত গোল জায়গায় ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে সলিলসঞ্চারী মৎস্যের ন্যায় অবলীলাক্রমে নৃত্য-গীত ও কীর্তন করিতেছেন। তাঁহার ভাবময় পবিত্র দেহে যাহাতে অন্যলোকেব স্পর্শে পীড়া না জন্মে, কিংবা 'আবেশে অবশ তনু' ভূলুণ্ঠিত না হয়, সেজন্য নিত্যানন্দ দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া পিছনে পিছনে ফিরিতেছেন; কিন্তু সব সময়ে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। মধ্যে মধ্যে সেই 'সোনার প্রতিমা ধুলায় গড়াগড়ি' যাইতেছে।

"আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ-পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে দুই পাশে ধাইয়া॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস হরিবোল, বলে বার বার॥"

অলৌকিক সেই ভাব দেখিয়া জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। রাজ্যের প্রধান অমাত্য (পাত্র) হরিচন্দনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র অপলক দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময়ে আচার্য শ্রীনিবাস আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীনিবাসের দ্বারা দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় রাজা ভালরূপে দেখিতে পাইতে-ছিলেন না, তাই সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য হরিচন্দন শ্রীনিবাসের গা ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস কীর্তনের ভাবে বিভোর, কাজেই রাজাকে লক্ষ্য করেন নাই এবং হরিচন্দনের ঠেলাঠেলির কারণও বুঝিতে পারেন নাই। হরিচন্দন পুনঃপুনঃ ঠেলাঠেলি করাতে বিরক্ত হইয়া শ্রীনিবাস অবশেষে তাঁহাকে এক চাপড় মারিয়া এরূপভাবে উত্ত্যক্ত করিতে নিষেধ করিলেন। হরিচন্দন উত্তেজিত হইয়া শ্রীনিবাসকে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজার প্রবোধবাক্যে তাঁহার মন শান্ত হইল। ভক্তিমান রাজা হরিচন্দনকে বলিলেন, "তোমার মহা-ভাগ্য, সেইজন্যই এইরূপ মহাত্মার স্পর্শে কৃতার্থ হইলে।"

"ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিলা তাঁরে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি—তুমি কৃতার্থ হইলা॥"

ভাবের আবেশে চৈতন্যদেবের দেহে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তিত হইয়া নূতন কলেবরে নূতন মানুষরূপে দেখা যাইতেছে। সেই অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে তখন আর গৌড়ীয় ভক্তগণ 'নদের নিমাই', কিংবা পুরীর ভক্তগণ 'শ্রীমৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীজী মহারাজ' মনে করিতে পারিতেছিলেন না।

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাব হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে আবৃত॥
একেক দন্ডের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ'-'জজ গগ' গদগদ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ কান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম॥
কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাস হীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ হীন॥
কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥"

কিছুক্ষণ পরে দিব্য আবেশের উপশম হইলে চৈতন্যদেব কীর্তন ক্ষান্ত করিলেন। রথ আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তগণ কীর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দামোদর স্বরূপ চৈতন্যদেবের অন্তরের ভাব বুঝিয়া সময়োপযোগী পদ ধরিলেন।

"সেই ত পরাণনাথে পাইলুঁ।
যাহা লাগে মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ॥"

দামোদর চৈতন্যদেবের অন্তরের ভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। সেই জন্য তাঁহার মুখে সময়োপযোগী গান, কবিতা, পদ, শ্লোক ইত্যাদি শুনিয়া চৈতন্যদেবের আনন্দ শতগুণে বৃদ্ধি পাইত।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথের উপর দর্শন করিয়া চৈতন্যদেবের অন্তরে ব্রজগোপীগণের ভাবের উদয় হইয়াছে।' প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করায়, গোপীগণ তাঁহার বিরহে ব্যাকুল হইয়া কতকাল হইতে তাঁহার আগমন আশায় পথ-পানে তৃষিত নেত্রে চাহিয়া আছেন। বহুকাল পরে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে স্নান করিবার জন্য গোপিকারাও গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও রথে চড়িয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে অধীরা গোপীগণ ছুটিয়া গিয়া রথ ধরিলেন। স্বয়ং রথের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া চলিয়াছেন, দেরি সহ্য হইতেছে না, তাড়াতাড়ি লইয়া যাইবার জন্য কখনও জোরে টানিতেছেন, কখনও বা মাথা দিয়া ঠেলিতেছেন। আবার হাস্য-পরিহাস, কখনও বা মান-অভিমান, আবার কখনও বা আনন্দে নৃত্যগীত। বহুদিনের পর 'পরাণনাথ'কে পাইয়া গোপীগণের সেই অপার আনন্দ ও মাধুর্যের আস্বাদ আজ স্বীয় অন্তরে অনুভব করতঃ চৈতন্যদেব রথোপরি উপবিষ্ট তাঁহার 'পরাণনাথ' শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতেছেন। মনোভাব বুঝিয়া স্বরূপ যেই পদ ধরিলেন, 'সেই ত পরাণনাথে পাইনু, যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু', অমনি তাঁহার ভাব-সমুদ্র আরও উথলিযা উঠিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথের মুখের দিকে চাহিয়া কখন নৃত্য, কখন গীত, কখনও সুমধুর পদ বা শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। আবার মধ্যে মধ্যে রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতেছেন, অধীর হইয়া কখনও বা রথ-চক্র মাথা দিয়া ঠেলিতেছেন। অনিমেষ লোচনে 'পরাণনাথের' মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনঃপ্রাণ তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ায়, মধ্যে মধ্যে দেহ সংজ্ঞাশূন্য হইতেছিল। নিত্যানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, অতি সাবধানে কাছে কাছে থাকিয়া দেহরক্ষা করিতেছিলেন। একবার তাঁহারা সামলাইতে না পারায়, সেই ভাব-বিহ্বল 'সোনার তনু' ধূলায় লুটাইবার উপক্রম হইল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিকটে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া শ্রীঅঙ্গ ধরিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ভাবের উপশম হওয়ায় চৈতন্যদেব ফিরিয়া তাকাইলেন।

"রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার।"

ভক্তগণকে এজন্য অনুযোগ দিয়া চৈতন্যদেব ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথাবার্তা কর্ণগোচর হওয়ায় রাজার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল। সার্ব-ভৌম তখন রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—

"তোমার উপরে মহাপ্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ গণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥"

রথ ধীরে ধীরে গুণ্ডিচাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া 'বলগণ্ডি' নামক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এইস্থলে ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথকে ফলমিষ্টি (নিমকড়ি) ভোগ নিবেদন করেন। ভোগের সময় ভয়ানক ভিড় দেখিয়া চৈতন্যদেব পার্শ্ববর্তী বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেহ ক্লান্ত থাকায় ভূমিতেই শয়ন করিলেন, এবং মনে মনে আপনার ভাবে ভাগবতের গোপীগীতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। একটু পরেই পরিশ্রান্ত দেহে তন্দ্রাবেশ হইল। রামানন্দ ও সার্বভৌম অবসর বুঝিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে ছদ্মবেশে তথায় আনিলেন। তাঁহাদের ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনিও চৈতন্যদেবের পদসেবায় অগ্রসর হইলেন।

"সার্বভৌমের উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একেলা বৈষ্ণব বেশে আইলা সেই দেশ ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈয়া জোড়হাত হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥
আঁখি বুজি প্রভুপ্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসংবাহন ॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
'জয়তিতেঽধিকং' অধ্যায় করয়ে পঠন ॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বার বার ॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যেমতি পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥
'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাই, দিনু আলিঙ্গন ॥'
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গকম্পন নেত্রে জলধার ॥"

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

—ভাগবত

'হে প্রিয়তম! তাপিত ব্যক্তিগণের জীবনসুশীতলকারী, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ-সংস্তুত, কলুষহারী, শ্রবণমঙ্গল, সর্বত্র সর্বকল্যাণহেতু, অমৃতময়ী তোমার কথা যাঁহারা জগতে প্রচার করেন তাঁহাদিগকে দানবীর বলিতে হইবে।' ভাগবতের সুমধুর শ্লোকে চৈতন্যদেব হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। শ্লোকপাঠককে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া,—

"প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥"

এতদিনে আজ রাজার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে; চৈতন্যদেবকে বার বার প্রণাম করিয়া তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন, তদনন্তর ভক্তগণকে বন্দনা করিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় লইলেন। পরে সমস্ত ঘটনা চৈতন্যদেবের গোচরীভূত হইয়াছিল। তদবধি রাজা প্রতাপরুদ্র বিশিষ্ট ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

সার্বভৌম ও রামানন্দের সঙ্গে যুক্তি করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বাণীনাথের দ্বারা 'বলগণ্ডি' ভোগের প্রসাদ, প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, মিষ্টান্ন, পানীয় ইত্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। বাগানের মধ্যে ভক্তগণ-সঙ্গে আনন্দ করিতে করিতে চৈতন্যদেব সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভিক্ষার সময়ে কতকগুলি গরীব লোক প্রসাদের আশায় বাগানের পাশে দাঁড়াইলে, তাহাদিগকে দেখিয়া চৈতন্যদেবের হৃদয় বিগলিত হইল। স্বয়ং পরমাদরে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন এবং পরিতোষ সহকারে ঐ সকল গরীব-দুঃখীকে ভোজন করাইবার জন্য গোবিন্দকে আদেশ করিলেন।

"প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করায় ভোজনে॥
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখি গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি॥
হরি হরি বলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করেন গোর রায়॥"

ধীরে ধীরে চলিয়া রথ অবশেষে গুণ্ডিচাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলরাম সুভদ্রা সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, প্রাঙ্গণে ভক্তগণকে লইয়া চৈতন্যদেব কীর্তন জুড়িয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান, ভোগ, আরতি শেষ হইল। আরতি-দর্শনান্তে চৈতন্য-দেব 'আই টোটা' নামক বাগানে গিয়া অবস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ যে কয়দিন গুণ্ডিচাবাড়ী অবস্থান করেন, সেই সময়ে পুরীবাসী সাধু সন্ন্যাসী ত্যাগী মহাত্মারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া গুণ্ডিচাবাড়ীর আশেপাশে তাঁহার সন্নিকটে বাস করেন। ধনী সজ্জন ব্যক্তিগণ সেখানে তাঁহাদের খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। চৈতন্যদেবও তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া এই কয়দিন (পুনর্যাত্রা পর্যন্ত) 'জগন্নাথ বল্লভ' নামক নিকটবর্তী

বাগানে অবস্থান পূর্বক নিত্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন, নরেন্দ্র সরোবরে স্নান, ভজন-কীর্তন ও ধ্যানধারণাতে কাটাইলেন।

পুষ্যানক্ষত্র-সংযুক্ত দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা, তৎপরবর্তী (হোরা) পঞ্চমী দিনে লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব। রথযাত্রার দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব লক্ষ্মী-দেবীকে নীলাচলে রাখিয়া সুন্দরাঞ্চলে (গুণ্ডিচাবাড়ী) চলিয়া গেলে লক্ষ্মীদেবী ক্রুদ্ধ হইযা পঞ্চমী দিনে তাঁহাব দাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া সাজসজ্জা করিয়া পালকি চড়িযা বাহিবে আসিযা সিংহদ্বারের কাছে উপবিষ্ট হন এবং দাসী-গণকে হুকুম করেন। তাহারা তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবক ভৃত্যগণকে ধরিয়া বাঁধিযা লইয়া আসে। দাসীগণ সেবকদিগকে গালাগালি করিয়া শেষে বেদম প্রহার কবিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চার-পাঁচ দিনের মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়া আসার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তিলাভ করে। মন্দিরের পাণ্ডা-সেবকগণ এইরূপে প্রতি বৎসর অভিনয় সহকারে লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব পালন করিয়া থাকেন। এই বৎসর চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় ভক্তগণের আনন্দবর্ধনের জন্য রাজার অভিপ্রায় অনুসারে খুব ঘটা করিয়া উৎসবের আয়োজন হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র উৎসব খুব জাঁকজমক করার জন্য কাশীমিশ্রকে বলিলেন।

"কালি হোরা পঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুব যৈছে হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র বস্ত্র ছত্র আর কিঙ্কিনী চামরে॥
ধ্বজপতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডন।
নানা বাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজন॥"

পঞ্চমী তিথিতে প্রভাতকালে চৈতন্যদেব ভক্তগণসহ গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর উৎসব দর্শনের জন্য মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মীদেবীর অতুল ঐশ্বয, দাসীগণসহ সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে আগমন, শ্রীশ্রীজগন্নাথের অনুসন্ধান, ক্রোধ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবকগণকে দাসীগণের ধরিয়া আনয়ন, প্রহার, কটূক্তি, উভয়পক্ষের বাদানুবাদ, রঙ্গরস দেখিয়া সকলেরই খুব আনন্দ হইল। চৈতন্যদেব ভক্তগণসহ সেই আনন্দোৎসব বিশেষ ভাবে উপভোগ করিলেন।

চৈতন্যদেব রসতত্ত্ববেত্তা দামোদরের নিকট লক্ষ্মীদেবীর প্রেমভাবের ও ব্রজগোপীগণের প্রেমভাবের মহিমার তুলনামূলক সমালোচনা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় শাস্ত্রজ্ঞ দামোদর উভয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে

লাগিলেন। লক্ষ্মীদেবীর প্রেম ও অভিমান এবং দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সত্যভামার প্রেম ও অভিমানাদি ঐশ্বর্যভাব-সংযুক্ত। কিন্তু ব্রজগোপীগণের প্রেমে ঐশ্বর্যের নামগন্ধ নাই, শুদ্ধমাধুর্য পরিপূর্ণ। সেখানে ভগবানের ঐশ্বর্যলেশহীন মাধুর্যপরিপূর্ণ শুদ্ধ স্বরূপের প্রকাশ। দামোদর ব্রজলীলার মাধুর্য, গোপীগণের অমল অহেতুকী নিষ্কাম প্রেমের বর্ণনা, এবং বিবিধ রসের বিকাশবিস্তার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী গোপীগণের, বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধিকার অতি উচ্চ প্রেমভাবের বর্ণনা শুনিয়া চৈতন্যদেবের অন্তরে সেইসকল ভাবের অনুভব ও রসের স্ফুরণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আনন্দের আতিশয্যে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দামোদর ভাব বুঝিয়া সময়োপযোগী পদ ধরিলেন, ক্রমে অন্যান্য ভক্তগণও যোগ দিলেন,—কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কীর্তন করিবার পর চৈতন্যদেবের ভাবের উপশম হইলে নৃত্যগীত থামাইয়া বিশ্রাম করিলেন। তৃতীয় প্রহরে লক্ষ্মী-দেবীর উৎসব সমাপ্ত হইল। পাণ্ডাগণ প্রচুর প্রসাদ আনিয়া দিলে ভক্তগণকে লইয়া চৈতন্যদেব আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ বাঁটিয়া খাইলেন।

পুনর্যাত্রা (দশমী) দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ আবার রথে চড়িয়া মন্দিরে ফিরিয়া চলিলেন। চৈতন্যদেবও ভক্তগণসহ নৃত্য-গীত-কীর্তন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া রথ দণ্ডায়মান হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রাজবেশ হয়। সুবর্ণনির্মিত অতি সুন্দর হস্তপদ সংযোগে সেই অপূর্ব বেশ ও বিচিত্র সাজ-সজ্জা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

রথযাত্রাদিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ যেভাবে মন্দির হইতে বাহির হইয়া রথে যান এবং পুনর্যাত্রাদিনে যেভাবে নামিয়া মন্দিরে আসেন, তাহার নাম পাণ্ডুবিজয়। পাণ্ডাগণ বিগ্রহকে পট্টডোরীতে বাঁধিয়া, দুই পাশ হইতে সেই ডোরী ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রাখিতে রাখিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। যে-সকল স্থানে বিগ্রহকে ঐরূপে রাখা হয়, সেই সকল স্থানে নূতন 'তুলী' (গদি) বিছান হয়। বিগ্রহের চাপে সেই সকল তুলী ফাটিয়া তুলা উড়িতে থাকে, এবং ডোরীও ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। ইহার প্রতিবিধানকল্পে চৈতন্যদেব কুলীনগ্রাম-নিবাসী জমিদার সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুর সাহায্য লইলেন।

> "পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটিফুটি যায়।
> জগন্নাথ ভারে তুলি উড়িয়া পলায়॥
> কুলীনগ্রামের রামানন্দ সত্যরাজ খান।
> তারে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান॥

এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ॥
এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্ট ডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥
এই পট্ট ডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান॥
ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাইয়া হৈল পরম আনন্দ॥
প্রতি বর্ষে গুণ্ডিচাতে সব ভক্ত সঙ্গে।
পট্ট ডোরী লইয়া আসে অতি বড় রঙ্গে॥"

চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় অনুযায়ী গৌড়ীয় ভক্তগণের বর্ষার চারিমাস পুরী বাস করা স্থির হইল। ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন, সমুদ্রস্নান, মহাপ্রসাদ গ্রহণ, ভগবৎপ্রসঙ্গ, গীত-কীর্তন ও সাধনভজনে এবং সর্বোপরি চৈতন্যদেবের পূত সঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পুরীতে নিত্য আনন্দোৎসব; বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই আছে। ঝুলন উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধি স্থানীয় মদনমোহন বিগ্রহের মনোহর বেশ ও বিচিত্র সাজসজ্জা দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। জন্মাষ্টমীর উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। জন্মাষ্টমীর পরদিন ভক্ত পাণ্ডাগণ নন্দ-গোপ-গোপী সাজিয়া নন্দোৎসবে মত্ত হইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণসহ চৈতন্যদেব তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে উৎসব খুব জাঁকিয়া উঠিল, দেখিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা তুলসী পড়িছা যোগ দিলেন। নৃত্যগীত-রঙ্গ-রস হাসি-তামাশা খুব চলিল।

"ইহা সব লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ॥"

অদ্বৈতাচার্য বঙ্গ করিয়া চৈতন্যদেবকে বলিলেন, "গোয়ালারা বিখ্যাত লাঠিয়াল, লাঠিখেলা দেখাইতে না পারিলে যথার্থ গোয়ালা হওয়া যায় না।" আচার্যের মনোভাব বুঝিয়া চৈতন্য-নিত্যানন্দ উভয়েই লাঠিখেলা দেখাইলেন। তত্ত্বদর্শী ভক্তাগ্রণী প্রেমিক-শিরোমণি ভাবুক বাঙালী সন্ন্যাসীর আশ্চর্য লাঠিখেলা ও নানা রকম কলাকৌশল দেখিয়া উড়িষ্যাবাসীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।[১] সকলেই বুঝিল এই সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক-মানসিক শক্তিতে

১ বাঙালীরা চিরকালই লাঠিচালনাতে সুদক্ষ। সেই সময়ে দেশে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন ব্যাপক ভাবে ছিল। সকলেই আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন করিতেন। বাল্যকালে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়েই লাঠিচালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান।

যেমন, শারীরিক শক্তিতেও তেমন শক্তিমান, অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চালনেও অপটু নহেন।

জন্মাষ্টমীর পর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুকরণে শ্রীশ্রীজগন্নাথের নানা-রূপ বেশ হয়। বেশকারীরা সুকৌশলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পোশাক-পরিচ্ছদ জুড়িয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথকে নানারূপ বেশে সজ্জিত করেন। সেই অপূর্ব লীলা-মূর্তি দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ হয়।

এইরূপে দিনের পর দিন অতীত হইয়া ক্রমে শারদীয়া মহাপূজা সমাগত হইল। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের জীবনকথায় পুরীর নবরাত্রি উৎসব ও বিমলাদেবীর বিশেষ পূজার কথা কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥"

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া নবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ সমারোহে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত মহাশক্তি দুর্গাদেবীর অর্চনা, সপ্তশতীপাঠ, হোম বলি প্রভৃতি অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। হিন্দু রাজারা রাজ্যের অভ্যুদয় ও আপনাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই সময়ে ব্রহ্মশক্তিকে বিশেষ ভাবে আরাধনা করিতেন। এই সময়ে সঙ্গতিশীল ব্যক্তি মাত্রেই যথাসাধ্য মহামায়ার অর্চনা করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেবের সময়েও ইহা বিশেষ প্রচলিত ছিল। কারণ সেই সময়ে বাংলা দেশে প্রত্যেক বড়লোকের বাড়ীতেই চণ্ডীমণ্ডপের কথা[১] তাঁহার জীবনী-গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

পুরীতে শারদীয় উৎসব এখনও যেভাবে ধুমধাম করিয়া সম্পন্ন হয় তাহাতে মনে হয়, ক্ষত্রিয় রাজগণ শক্তিশালী থাকা কালে,—চৈতন্যদেবের সময়ে মহাপ্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বে, পুরীর অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী 'বিমলামায়ী'র অর্চনা না জানি কত সমারোহেই সম্পন্ন হইত! এখনও নবরাত্রি উপলক্ষে শরৎকালে প্রায় পনর দিন ধরিয়া দশমহাবিদ্যার অন্যতম শক্তিমূর্তি-রূপে বিমলাদেবীর বিচিত্র বেশভূষা ও সাড়ম্বর পূজা ভোগরাগ হইয়া থাকে। মহাষ্টমী ও মহানবমীর রাত্রে দুইটি করিয়া মেষ বলি এবং আমিষ ভোগ হয়। এই সময়ে বিমলার মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার এক ক্ষুদ্রাকৃতি বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া দুর্গামাধবরূপে পূজিত হন। দশমীর দিন তাঁহাকেই পালকিতে চড়াইয়া মন্দির হইতে জগন্নাথবল্লভ নামক বাগানে অবস্থিত মণ্ডপে লইয়া গিয়া বিজয়োৎসব (রামের লঙ্কাবিজয়) সম্পন্ন হয়। পুরীবাসী সকলেই বিমলাদেবীর পূজা-উৎসবে যোগ দিয়া আনন্দ করেন, এবং

---

১ নবদ্বীপে এক চণ্ডীমণ্ডপেই নিমাই পণ্ডিতের টোল বসিত।

দুর্গামাধবের বিজয়-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথবল্লভ নামক বাগানে গমন করেন। আমরা ইহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের 'বানর-সৈন্য' হওয়ার কথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' দেখিতে পাই। বাঙালীর ন্যায় উড়িষ্যাবাসীরাও শারদীয়া পূজা উপলক্ষে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করেন। বলির প্রথাও খুব প্রচলিত। পুরীর এই সকল পূজাপদ্ধতি বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবে পরবর্তীকালে রাজবংশ শক্তিহীন হওয়াতে ঐশ্বর্যের ঘটা ও জাঁকজমক কমিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি এখনও যাহা আছে তাহা অতুলনীয়। বহু পূর্ব হইতেই পুরীতে নবরাত্রির পূজা বলি উৎসবাদি প্রচলিত না থাকিলে আধুনিক কালে উহার প্রবর্তন করা অসম্ভব হইত। এজন্য আমরা অনুমান করি, চৈতন্যদেবের সময়েও এই উৎসব সমধিক সমারোহে সুসম্পন্ন হইত এবং বাঙালী ভক্তেরা উহাতে যোগ দিয়া আনন্দ করিতেন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও কেহ কেহ মনে করেন, চৈতন্যদেব শক্তি-আরাধনার (দুর্গাপূজার) বিরোধী; তথাপি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়, সর্বত্রই তিনি বিষ্ণু মন্দিরের ন্যায় শক্তি মন্দির দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতানুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যেও দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। তিনি তাঁহার ধর্মের প্রধান সিদ্ধান্তরূপে যে 'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থ দক্ষিণদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতেও দুর্গামাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে উক্ত হইয়াছে। আমরা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেই মূল 'ব্রহ্মসংহিতা'র শ্লোক এবং উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম প্রধান আচার্য শ্রীমৎ শ্রীজীব গোস্বামীপাদের বাক্য কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা,
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি [১]॥"

—ব্রহ্মসংহিতা, ৫।৪৪

শ্রীমৎ শ্রীজীব গোস্বামীকৃত ব্রহ্মসংহিতা-টীকা-ধৃত গৌতমীয় কল্পবচন—

"যঃ কৃষ্ণ সৈবদুর্গাস্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরদর্শী সংসারান্নোবিমুচ্যতে॥

---

১ যাঁহার, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় সাধনকারিণী একমাত্র শক্তি শ্রীদুর্গা ছায়ার ন্যায় অনুবর্তিনী হইয়া ভুবন সকলকে ধারণ করেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুযায়ী চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শক্তিরূপেণ দুর্গানাম। নিরুক্তিশ্চাত্র—'দুঃখেন গুর্বারাধনাদি প্রয়াসেন গম্যতে জায়তে।' তথা চ—নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসংবাদে,—

'জানাত্যেকা পরাকান্তং (কান্তা) সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেম-সর্বস্বভাবাশ্রীগোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভোজ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
ভক্তির্ভজন সম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মন।
দুর্গেতি গীয়তে সর্বৈরখণ্ডরসবল্লভা॥' "

ব্রজের গোপ-গোপী, রাধা-কৃষ্ণ,—সকলেই শক্তি উপাসক দুর্গাভক্ত। দেবী কাত্যায়নী ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী। দ্বারকাতেও ভদ্রকালী দুর্গাদেবীই পীঠাধিষ্ঠাত্রী। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় ধরাতে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বকালেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বার্থ-সিদ্ধিকর মহাশক্তির আরাধনার বিধান দিতেছেন।

"অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।
নানোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরাভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানা শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

—ভাগবত, ১০।২।১০-১২

দীপান্বিতা অমাবস্যাতেও বিমলার মন্দিরে, বিশেষ সমারোহে শ্যামা মায়ের অর্চনা হইয়া থাকে। নবদ্বীপবাসীর পক্ষে শ্যামার্চনা বিশেষ আদরের, —কারণ নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী শ্যামা। নবদ্বীপে মায়ের স্থান[১] এখনও বিশেষ জাগ্রত। নবদ্বীপবাসীরা সকলেই মায়ের অনুগত, গোস্বামী প্রভুদের গৃহ হইতেও সর্বদা মায়ের ভেট পূজা আসিতেছে দেখা যায়।

কার্তিকমাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দামোদর বেশ ও বিশেষ নিয়মে পূজা ভোগ রাগ হয়। কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসলীলা ভক্তগণের অতীব আনন্দের দিন। ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেব এই সব পর্ব-উৎসব বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়া আনন্দ করিলেন,—

১ পোড়া-মা-তলা—নবদ্বীপের জাগ্রত শক্তিপীঠ সর্বজনমান্য।

"এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী,
উত্থান-দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥"

রাসপূর্ণিমাতে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হইল। নিত্যানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণকে দেশে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আপনারা এখন সকলে ঘরে গিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন ও সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করতঃ ভগবানের নাম করুন, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; এবং প্রতি বৎসর এইরূপে রথযাত্রার সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে আসিলে খুব আনন্দিত হইব।"

যাত্রার দিন স্থির হইলে ভক্তগণ চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বিদায় লইতে আসিলেন। চৈতন্যদেবও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। পুরীর ভক্তগণের নিকট গৌড়ীয় ভক্তগণের মহিমা বর্ণনা করতঃ একে একে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুমিষ্ট বাক্যে বিদায় দিতে লাগিলেন।

"আচার্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে করিহ কৃষ্ণ ভক্তি দান॥"

যিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন সেই অগ্রজতুল্য নিত্যানন্দকেও ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য অনেক বলিয়া কহিয়া গৌড়ে পাঠাইলেন।

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যাহ গৌড় দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর (দাস) আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥"

শ্রীবাস পণ্ডিতের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং মধুর বচনে তুষ্ট করিয়া তাঁহার হাতে জননীর জন্য মহাপ্রসাদ এবং একখানি প্রসাদী বস্ত্র দিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদী এই বস্ত্র জন্মাষ্টমীর পরদিনে নন্দোৎসবের সময় রাজার অভিপ্রায় অনুসারে মন্দিরের প্রধান পূজারী তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

'শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥"

রাঘব পাণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করতঃ ভক্তগণের নিকট বলিলেন,—

"ইঁহার কৃষ্ণ সেবার কথা শুন সর্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একৈক ফলের মূল্য দিয়া চারিপণ।
দশক্রোশ হইতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময়ে পুনঃ ছুলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি॥
... ...
এই মত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্বলোকের জুড়ায় নয়ন॥"

তৎপরে শিবানন্দ সেন যিনি গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী আগমনকালে যাত্রা-পথের সমস্ত বিষয় সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আসেন, সেই মহানহৃদয় কায়স্থ-কুলতিলক জমিদারকে সম্মানপুরঃসর বলিলেন,—

"শিবানন্দ সেনে কহে করিয়ে সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো যেদিন যে আইসে।
সেই দিন ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না হইলে কুটুম্ব ভরণ না হয়॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমার স্থানে।
সরখেল হৈয়া তুমি করহ সমাধানে॥
প্রতি বর্ষে আমার সব ভক্তগণ লৈয়া।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া।"

কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করতঃ বলিলেন—"প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডোরী লঞা॥" কুলীন গ্রামের ভক্তশ্রেষ্ঠ সত্যরাজ খান বিদায় লইবার প্রাক্‌কালে জানিতে চাহিলেন,—

"গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এই কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপক্ষয়।
নানাবিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই ত বৈষ্ণব তাঁর করিহ সম্মান॥"

শ্রীখণ্ডবাসী ভক্ত মুকুন্দদাস, রঘুনন্দন ও নরহরি,—তিনজন-[১] বিদায় লইবার জন্য উপস্থিত হইলে ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের প্রেমভক্তির প্রশংসা করিয়া মুকুন্দের বিশেষ পরিচয় দিলেন, "ইনি রাজবৈদ্য, মুসলমান রাজার চিকিৎসক। একদিন মঞ্চোপরি আসীন সেই মুসলমান ভূপতির নিকটে, উচ্চ আসনে বসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ভৃত্য আসিয়া রাজার মাথার উপর ময়ূরপুচ্ছের পাখা (আড়ানি) দোলাইতে থাকিলেন। অকস্মাৎ ইঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনা হইল। ভাবপ্রেমে বিহ্বল হওয়ায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উচ্চ আসনের উপর হইতে নীচে লুটাইয়া পড়িলেন। শশব্যস্ত হইয়া রাজা সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেহে বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে,—

'রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী॥'"

তিনজনের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা প্রকাশ করিয়া বিদায় দিবার সময়ে—

"মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার যে কার্য ধর্ম-ধন উপার্জন॥

---

১ রঘুনন্দন—মুকুন্দদাস সরকারের পুত্র।
নরহরি—মুকুন্দদাসের কনিষ্ঠ সহোদর।

রঘুনন্দনের কার্য শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার নাহি অন্যমন॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য সদা কর তিনজনে॥"

তারপর—

"সার্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি॥
'দারু' 'জল' রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥
'দারুব্রহ্ম' রূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম' সম॥
সার্বভৌম কর 'দারুব্রহ্ম' আরাধন।
বাচস্পতি কর 'জলব্রহ্মের' সেবন॥"

তৎপরে মুরারি গুপ্তকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া ভক্তগণের নিকট তাঁহার ইষ্ট-নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমি পূর্বে একসময়ে গুপ্তের রামভক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ মাধুর্যের প্রশংসা করতঃ, রামকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ-উপাসনা করিবার জন্য বলিয়াছিলাম,—

'সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥'

শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত গুপ্ত আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, শেষে একদিন স্বীকার করিলেন যে, এখন হইতে কৃষ্ণোপাসনা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু ঘরে গিয়াই রঘুনাথকে ছাড়িবার কথা চিন্তা করিয়া গুপ্তের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না, কাঁদিয়া কাটাইলেন এবং ভোরবেলাই আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

'রঘুনাথ পায়ে মুই বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তবে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইঁহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল॥

সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়॥'"

বাসুদেব দত্তকে বিদায় দিতে গিয়া, প্রেমালিঙ্গন করিয়া শতমুখে তাঁহার ভাবভক্তির প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। নিজ প্রশংসা শুনিয়া বিনয়ী দত্তের বিষম লজ্জা উপস্থিত হইল। বাসুদেব চৈতন্যদেবের চরণে পড়িয়া কাতরভাবে অতিশয় মিনতি করিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লৈয়া মুই করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

বাসুদেবের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। বিগলিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ কণ্ঠে চৈতন্যদেব বাসুদেবের মহৎ হৃদয়ের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার॥"

একে একে সমস্ত ভক্ত বিদায় লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে একত্রে দেশে ফিরিয়া চলিলেন। চৈতন্যদেবের বাল্যবন্ধু প্রাণের দোসর অন্তরঙ্গ গদাধর পণ্ডিত কিন্তু গৌড়ে ফিরিলেন না। গদাধর বালব্রহ্মচারী,—সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভের আশায় পুরীতেই থাকিয়া গেলেন। হরিদাসও আর বঙ্গদেশে ফিরিলেন না।

অষ্টম অধ্যায়

জননী-জন্মভূমি সন্দর্শন

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এবং পুরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, মন্দিরের কর্তৃপক্ষ, পূজারী-সেবাইত, সকলেই চৈতন্যদেবের সেবা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আগ্রহান্বিত। তাঁহার একান্ত আশ্রিত সার্বভৌম ও রায় রামানন্দ দুইজনেই সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, যাহাতে তিনি কোন অসুবিধা বোধ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুরীতে অবস্থান করিয়া এই তীর্থকে মহিমান্বিত করেন। চৈতন্যদেব প্রত্যহ রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া মন্দিরে যাইতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন, প্রণাম, স্তব-প্রার্থনাদি করিয়া কিছুক্ষণ মন্দিরে কাটাইয়া হরিদাসের কুঠিয়ায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। তাহার পরে সমুদ্রস্নানান্তে ভিক্ষা করিতেন। কোন কোন দিন তাঁহার কুঠিয়াতেই ভক্তগণ ভিক্ষা লইয়া আসিতেন আবার কখনও কখনও কোন অনুগত ভক্তের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহে যাইতেন। ভিক্ষান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ শুনিতেন। ভক্তসঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে ও ভজন-কীর্তনে অপরাহ্নকাল কাটিত। সন্ধ্যার পূর্বে খানিকক্ষণ সমুদ্রতীরে উদ্যানে কিংবা মন্দিরাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের আরাত্রিক দর্শনান্তে কুঠিয়ায়[১] ফিরিয়া আসিতেন। রাত্রে আহার ও নিদ্রা খুব অল্পই ছিল,—ভগবদ্ভজনে ধ্যান-ধারণাতেই রাত্রির অধিকাংশ কাটিয়া যাইত।

গৌড়ীয় ভক্তগণ যতদিন পুরীতে ছিলেন, তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে চৈতন্যদেব তাঁহাদের নিকটেই ভিক্ষা লইতেন,—পুরীবাসীদের পক্ষে সেই সৌভাগ্য লাভ কঠিন ছিল। এখন তাঁহারা দেশে চলিয়া গেলে সার্বভৌম আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহার গৃহেই বরাবর ভিক্ষা করিবার জন্য চৈতন্যদেবকে অতিশয় মিনতি জানাইলেন। প্রত্যহ একই ঘরে ভিক্ষা করা সন্ন্যাসীর উচিত নহে বলিয়া তিনি সার্বভৌমের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর, প্রতি মাসে পাঁচ দিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করা সাব্যস্ত হইল। তিনি তাঁহার গৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা লইতে অসম্মত হইলেও, সন্ন্যাসীকে নিত্য ভিক্ষা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সার্বভৌমের অপূর্ণ রহিল না। চৈতন্যদেবের সঙ্গে দশজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহাদের সকলকে মিলাইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া পুরা মাসের ব্যবস্থা স্থির হইল। চৈতন্যদেব পাঁচ দিন, পরমানন্দজী

---

১ পুরীর বর্তমান রাধাকান্ত মঠ (কাশী মিশ্রের ভবন)-এর সংলগ্ন উদ্যানে চৈতন্যদেবের ভজন-কুটীর 'গম্ভীরা'। তথায় এখনও তাঁহার ব্যবহৃত খড়ম ও কমণ্ডলু সংরক্ষিত আছে।

পাঁচ দিন, দামোদর স্বরূপ চারি দিন, বাকী আটজন সন্ন্যাসী ষোল দিন,—মোট ত্রিশ দিন।

এই ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায়, তখনকার দিনে আশ্রম স্থাপন না করিলেও সন্ন্যাসীদিগেব জীবনযাত্রা নির্বাহের কোন অসুবিধা হইত না, সজ্জন গৃহস্থ ভক্তেরাই ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতেন। চৈতন্যদেব নিজে যেমন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেন, তাঁহার সঙ্গীদিগের ব্যবস্থাও ছিল তদনুরূপ। ন্যাসিচূড়ামণি দশজন সন্ন্যাসীর মণ্ডলী লইয়া থাকিলেও অতি কঠোর ত্যাগ অবলম্বনে 'নিত্য ভিক্ষায় তনু রক্ষা' করিয়াছিলেন। এইভাবে সমস্ত জীবন সন্ন্যাসীদের সহিত বাস করিয়া ও ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসের প্রকৃত আদর্শ তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধার জন্য নিজে কোনপ্রকার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত কখনও করেন নাই।

সার্বভৌমের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে চৈতন্যদেব 'নারায়ণো হরি' বলিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। আনন্দে দম্পতির নয়নে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। সার্বভৌম গলবস্ত্রে প্রণতঃ হইয়া সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিলেন; তারপর অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া সুন্দর আসনে বসাইলেন। গৃহিণী সযত্নে নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সার্বভৌম সেই সকল সুসজ্জিত করিয়া জোড় হাতে সন্ন্যাসীকে 'ভিক্ষাগ্রহণের' প্রার্থনা জানাইলেন। অতি উৎকৃষ্ট নানাবিধ দ্রব্য এবং পরিমাণেও অত্যন্ত বেশী দেখিয়া সন্ন্যাসীর মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। তিনি লজ্জিত হইয়া সার্বভৌমকে সেই সকল দ্রব্য সরাইতে এবং সামান্য পরিমাণে 'সাধারণ কিছু' দিতে বলিলেন। কিন্তু ভক্ত ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। অতিশয় কাতর হইয়া বারংবার উহা গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দম্পতির অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ভক্তের মনে কষ্ট না দিবার জন্য সন্ন্যাসী অগত্যা সুসজ্জিত ভোজনপাত্রের সম্মুখে বসিলেন এবং তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সমস্ত দ্রব্যের কিছু কিছু গ্রহণ করিলেন।

সার্বভৌমের জামাতা—একমাত্র দুহিতার স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত। চৈতন্যদেবের উপর অমোঘের মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না, বরং শ্বশুর-শাশুড়ীর অতিশয় ভক্তিপ্রীতির জন্য সন্ন্যাসীর প্রতি অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করিত। সুসজ্জিত অন্নরাশি ও উপাদেয় উপকরণসমূহ দেখিয়া অমোঘ বলিয়া উঠিল, "বাপরে! সন্ন্যাসী এত খায়?" সহসা যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! জামাতার বাক্য বজ্রধ্বনি অপেক্ষা কঠোর ভাবে শ্বশুর-শাশুড়ীর মর্মে আঘাত করিল। ঘরে আনিয়া প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুকে অপমান করা হইল ভাবিয়া লজ্জা, ক্ষোভ ও দুঃখে উভয়ের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সার্বভৌম লাঠি হাতে অমোঘকে তাড়া করিলেন, ব্রাহ্মণী মাথায়

চাপড় মারিয়া হায় হায় করিতে করিতে বলিলেন, "এমন জামাই থাকার চেয়ে ষাটির[১] বিধবা হওয়া ভাল।" অমোঘ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সার্বভৌম অশ্রুপূর্ণলোচনে অতি কাতরভাবে স্বীয় জামাতার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলে, "অমোঘ ছেলেমানুষ, উহার বাক্য ধর্তব্য নহে" বলিয়া চৈতন্যদেব হাসিতে লাগিলেন এবং ভক্ত দম্পতিকে সুখী করিবার জন্য সেদিন তাঁহাদের অভিলাষানুযায়ীই ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

পরদিন তাঁহার নিকট খবর আসিল, অমোঘ বিসূচিকাতে আক্রান্ত হইয়া অন্যত্র পড়িয়া আছে, সংকটজনক অবস্থা, সেবা-শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। সার্বভৌম অমোঘের নামই শুনিতে চান না, তত্ত্বাবধান করা ত দূরের কথা। অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চৈতন্যদেব অমোঘের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মৃদু-মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। সার্বভৌমকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে অনেক বলিয়া-কহিয়া অবোধ বালকের অপরাধ ক্ষালন করাইলেন এবং চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করাইয়া কুঠিয়ায় ফিরিলেন। তাঁহার কৃপায় অমোঘ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল; পরে মতিগতি পরিবর্তিত হইয়া চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুগত ভক্ত হইল।

এইরূপে ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আরও কিছুদিন গত হইলে চৈতন্যদেব কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থ দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ভক্তগণের অন্তরে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। রামানন্দ ও সার্বভৌম শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। শীত গত হইলে দোলযাত্রা দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। দোলের পর আবার উভয়ে অতিশয় বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলেন,—"রথযাত্রা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন রথের সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে সকলেরই পরমানন্দ লাভ হইবে।" ক্রমে রথযাত্রা নিকটবর্তী হইল। পুরী আসিবার জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ আয়োজন উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, খবর পাওয়া গেল।

যথাসময়ে অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভু সহ গৌড়ীয় ভক্তগণ হরিনাম সংকীর্তন করিয়া পুরী রওয়ানা হইলেন। এই বৎসর অনেক গৃহস্থ ভক্ত-পরিবারও আসিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবকে ভিক্ষা দিবার জন্য বাঙালীর প্রিয় নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছেন। রাস্তায় দেখাশুনা, ব্যয় বহন, চুঙ্গী দেওয়া প্রভৃতির ভার শিবানন্দ সেনের উপর। সঙ্গতিপন্ন জমিদার শিবানন্দ পরম আনন্দে অতিশয় দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে প্রতি বর্ষ এই

১ ষাটি—সার্বভৌমের কন্যা।

গুরুভার বহন করিতেন। চৈতন্যদেবের ভিক্ষার জন্য সংগৃহীত দ্রব্য যত্নপূর্বক লইয়া যাইবার জন্য উপযুক্ত তদারককারী ও পৃথক বোঝাওয়ালা নিযুক্ত হইত এবং কোন প্রকারে যাহাতে রাস্তায় ঐসকল দ্রব্য নষ্ট না হয়, সেজন্য ভালরূপে বন্ধ করিয়া স্বহস্তে পেটিকা মোহরাঙ্কিত করিয়া দিতেন। যথাকালে ভক্তগণ পুরী পেঁাছিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হইলেন। পূর্ব বৎসরের ন্যায় সকলের মিলনে, সানন্দে গুণ্ডিচাবাড়ী মার্জন ও রথযাত্রায় নৃত্যগীত-মহা-সংকীর্তন হইল। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, বিজয়া-দশমী, দেওয়ালী, রাসযাত্রায় সকলে আনন্দ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে চাতুর্মাস্য কাটিয়া গেল। তখন নিত্যানন্দের গলা জড়াইয়া, চোখের জলে অঙ্গ ভিজাইয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, "প্রভুপাদ, আপনি কষ্ট করিয়া প্রতি বৎসর এতদূর আসিবেন না, গৌড়ে অবস্থান করিয়া আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ কবিবেন এই আমার প্রার্থনা। সর্বজীবের কৃষ্ণ-ভক্তি হউক ইহাই আমার একমাত্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। আপনি ভিন্ন সেই আকাঙ্ক্ষা আর কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না।" নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য, 'দয়াল নিতাই' আবাব গৌড়ে ফিরিয়া চলিলেন। কুলীনগ্রামের ভক্ত সত্যরাজ খান এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আজ্ঞা কর কর্তব্য আমার সাধন।" তদুত্তরে—

"প্রভু কহে, বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে-ই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রমে করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥"

এইরূপে চৈতন্যদেব ভক্তের উচ্চ, উচ্চতর উচ্চতম অবস্থার পরিচয় শিখাইয়া দিয়া তাঁহাদের পবিত্র সংসর্গ লাভের জন্য সত্যরাজকে উৎসাহিত করিলেন।

গৌড়ের ভক্তগণ সকলেই দেশে ফিরিলেন। একমাত্র দামোদরের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহাদের

সঙ্গে গেলেন না। কিছুকাল চৈতন্যদেবের সঙ্গে বাস করিবার জন্য পুরীতে রহিলেন। ভক্তাগ্রণী বিদ্যানিধির উপর যেমন ভগবানের অপার করুণা তেমনই লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি ছিল। বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধন-ঐশ্বর্যের বাহ্যিক আবরণে আবৃত, তাঁহার আন্তরিক ভাবভক্তির কথা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিত। নবদ্বীপের ভক্তগণও তাঁহাকে বিষয়াসক্ত পণ্ডিত বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট তাঁহার অন্তরের ভাব ধরা পড়িয়াছিল এবং সেইজন্য উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতির সদ্ভাব হয়। গৃহে থাকা কালে, বিদ্যানিধির সঙ্গে ভক্তগণের বিশেষ পরিচয় করাইবার জন্য চৈতন্যদেব একদিন ভক্তগণকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিদ্যানিধি পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আপনার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসাইলেন। বিদ্যানিধির ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ও বেশভূষাতে ভক্তগণের মনে হইল, এই ঘোর বিষয়ীর নিকট প্রভু কেন আসিয়াছেন? চৈতন্যদেব উল্লসিত হৃদয়ে বিদ্যানিধির সহিত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইতেই বিদ্যানিধির ভাবান্তর দেখা গেল, মন অন্তর্মুখী হইল এবং ক্রমে তাঁহার অন্তরের লুক্কায়িত ভাবভক্তি চোখে মুখে যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রেম-ভক্তির অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা আরম্ভ হইলে চৈতন্যদেবের ইঙ্গিতে সুগায়ক মুকুন্দ খুব উচ্চ ভাবের একটি গান ধরিলেন। সুমধুর সঙ্গীতে বিদ্যানিধির ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠিলে নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না,—দেহে অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ভাবে বিহ্বল হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেই মূল্যবান পরিচ্ছদ বেশভূষাদিও ধূলায় গড়াইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই প্রেমময় মূর্তি দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তদবধি নবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

চৈতন্যদেবের বাল্যসখা প্রাণের দোসর গদাধর পণ্ডিত এইরূপে বিদ্যানিধির পরিচয় পাইয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং বিশেষ আগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক নবদ্বীপ ত্যাগ করিলে গদাধরের কোমল প্রাণে বিশেষ আঘাত লাগে এবং ক্রমে তিনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া ইষ্টমন্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেন। কিন্তু সমর্পিত-প্রাণ গদাধরের পক্ষে এই ভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ধীরে ধীরে মন শান্ত হইলে অভিমান ত্যাগ করিয়া আবার ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন এবং পুরী আসিয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাস[১] করতঃ চৈতন্যদেবের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। ইষ্টমন্ত্র ত্যাগের জন্য এখন গদাধরের অন্তরে দুঃসহ অনুশোচনা উপস্থিত

---

১ ক্ষেত্রসন্ন্যাস—যে তীর্থক্ষেত্রে সঙ্কল্প করা হয়, যাবজ্জীবন সেই ক্ষেত্রেই বাস করার নাম ক্ষেত্রসন্ন্যাস।

হইল। অনন্যোপায় হইয়া শেষে চৈতন্যদেবকে ধরিয়া বসিলেন, পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য। এতদূর গর্হিত কার্যের কথা জানিয়া চৈতন্যদেব মর্মাহত হইলেন এবং প্রাণাধিক গদাধরকে এই দুষ্কর্মের জন্য তীব্র তিরস্কার করিলেন; অন্য কাহারও নিকট দীক্ষার চেষ্টা না করিয়া পুনরায় বিদ্যানিধিরই শরণাগত হইবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। এই বৎসর বিদ্যানিধি পুরীতে অবস্থান করায় গদাধরের অভিলাষ পূর্ণ হইল; চৈতন্যদেবের আনুকুল্যে গদাধর আবার বিদ্যানিধির নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র লাভ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন।

অন্তরঙ্গ রামানন্দ রায়ের উপরোধে এই বৎসরও চৈতন্যদেব পুরী হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। যাত্রার কথা তুলিলেই রামানন্দ নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া, কাকুতি-মিনতি করিয়া বাধা দেন। এইভাবে হেমন্ত ও শীত কাটিয়া ক্রমে বসন্তও অতীত হইল। গ্রীষ্মশেষে গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্বে আসিয়া মিলিত হইলেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ভক্তসহ পরমানন্দে গুণ্ডিচা-মার্জন, রথোৎসবে নৃত্যগীত কীর্তনাদি হইল। এবার কিন্তু চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণকে চাতুর্মাস্য পুরীবাস করিতে নিষেধ করিয়া রথযাত্রার পরেই দেশে পাঠাইয়া দিলেন। বিদায়কালে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "উত্তর-পশ্চিমে তীর্থ দর্শনে শীঘ্রই যাত্রা করিবার অভিলাষ। যাত্রাপথে বঙ্গদেশে যাইয়া আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা থাকিল।"

গৌড়ীয় ভক্তগণকে বিদায় দিয়া চৈতন্যদেব স্বীয় সংকল্প প্রকাশ করিলে সার্বভৌম ও রামানন্দ বর্ষা কাটাইয়া যাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এইবার তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের অনুরোধ গত দুই বৎসর রক্ষা করিয়াছি, এবার আমার মন অত্যন্ত উতলা হইয়াছে, বিশেষতঃ

'গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥"

রামানন্দ ও সার্বভৌম আর বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। বর্ষাকালে পথ চলা কষ্টকর হইবে বলিয়া, কোনপ্রকারে বর্ষাটা অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

শারদীয়া উৎসব নবরাত্রি দর্শন করিয়া, বিজয়া-দশমীতে মাতৃভক্ত বীর সন্তান মায়ের জন্য মহাপ্রসাদ মালা চন্দনাদি সঙ্গে লইয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণামানন্তর তাঁহার শুভাশীর্বাদ পাথেয় করিয়া 'জননী ও জাহ্নবী' দর্শনে যাত্রা করিলেন। শ্রীমৎ পরমানন্দজী, দামোদর, সার্বভৌম, বক্রেশ্বর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দ, কাশীশ্বর প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা সঙ্গে

সঙ্গে কটক পর্যন্ত চলিলেন। রাজ-বৈভবে পালিত রামানন্দ রায় এতদূর হাঁটিতে অনভ্যস্ত; কাজেই তিনি পাল্কিতে চড়িয়া পিছনে পিছনে চলিলেন।

প্রিয় সঙ্গীদের সহিত পূর্বপরিদৃষ্ট তীর্থক্ষেত্র ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন এবং বিশ্রাম করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা কটকে উপস্থিত হইলেন। নগরের বাহিরে এক মনোহর উদ্যানে বকুলবৃক্ষের তলায় সন্ন্যাসি-যাত্রীর আসন বিস্তৃত হইল। জনৈক ভক্তিমান ব্রাহ্মণ পরম সমাদরে 'ভিক্ষা' করাইলেন। এদিকে রামানন্দ রাজভবনে গিয়া রাজাকে চৈতন্যদেবের আগমন-সংবাদ দিলে রাজার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ভিক্ষান্তে চৈতন্যদেব সেই নির্জন বাগানে বকুলতলায় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রগণ সহ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভগবদ্‌ভক্ত রাজাকে দেখিয়া চৈতন্যদেব প্রসন্নচিত্তে যথাযোগ্য সমাদরপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। পরস্পর কুশল-বার্তাদির পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ হইল। কিন্তু রাজার আগ্রহ থাকিলেও চৈতন্যদেব অন্য কোথাও আসন সরাইতে সম্মত হইলেন না, সেই বকুলতলাতেই রহিয়া গেলেন। রাজা তাঁহার শুভাশীর্বাদে পরম প্রীতি লাভ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু তাঁহার বঙ্গদেশ গমনের কথা জানিয়া রাজার অন্তরে ভাবনা উপস্থিত হইল। যাত্রাপথের সুব্যবস্থার জন্য রাজা উদ্যোগী হইলেন এবং তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত যে-সকল স্থান হইয়া তিনি গমন করিবেন, সেই সকল স্থানে তাঁহার অবস্থানের জন্য নূতন নূতন গৃহ নির্মাণ এবং খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য স্থানীয় শাসকদিগকে আদেশ করিলেন। আরও জানাইলেন,—

> "আপনি প্রভুকে লইয়া তথা উতরিবা।
> রাত্রিদিন বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥"

তৎপরে রাজা নিজের দুই মহাপাত্র হরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে সঙ্গে যাইবার জন্য আদেশ করিয়া বলিলেন,—

> "এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
> যাঁহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে[১]॥
> তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
> নিত্যস্নান করিব তাঁহা তাঁহা যেন মরি॥"

রাজার অভিপ্রায়মতে নগরের তোরণসমূহ নববস্ত্র, মাল্য, পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল। চৈতন্যদেব সঙ্গীদের সহিত যখন কটক হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পথের দুইপাশে কাতারে কাতারে

---

১ কটকের পার্শ্ববর্তী মহানদী।

লোক সারি দিয়া দাঁড়াইল। এমনকি রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত হাতীর উপরে তাঁবু খাটাইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তায় তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাজার অভিপ্রায়মতে, রামানন্দ, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন—তিনজন সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কটক হইতে পুরীর ভক্তগণকে বিদায় দেওয়া হইল। মুকুন্দ, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ পর্যন্ত যাইবার অনুমতি পাইলেন।

চৈতন্যদেবের প্রিয় সঙ্গী গদাধর ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া পুরীতে বাস করিতে-ছিলেন। ক্ষেত্রসন্ন্যাসের নিয়মানুসারে যে স্থানে থাকার সঙ্কল্প করা হয়, সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন নিষিদ্ধ। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে যাত্রা করিলে গদাধরের মন উতলা হইল; তিনিও তাঁহার সঙ্গে চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিধি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইতে চৈতন্যদেব গদাধরকে কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। গদাধরের মনে খুব দুঃখ হইল, তিনি শেষে তাঁহার সঙ্গে না চলিয়া, একা একা দূরে দূরে চলিয়া কটকে আসিয়া পেঁাছিলেন। চৈতন্যদেব খবর পাইয়া গদাধরকে খোঁজ করিয়া নিজের কাছে আনাইলেন এবং আদরযত্নে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া, অনেক বুঝাইয়া শুনাইয়া সার্বভৌমের সঙ্গে আবার পুরীতেই পাঠাইয়া দিলেন।

কটক ছাড়িয়া, মহানদী পার হইয়া, চৈতন্যদেব পথ চলিতে চলিতে ক্রমে যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় দিলেন এবং রেমুনাতে আসিয়া রামানন্দকেও ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। রামানন্দের সঙ্গ ছাড়িবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁহার বারংবার অনুরোধে অগত্যা বিদায় লইতে হইল। বিদায়কালে চরণে প্রণতঃ হইয়া রামানন্দ সাশ্রুলোচনে প্রার্থনা করিলেন, "শীঘ্রই যেন আবার দর্শন পাই।"

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উড়িষ্যার সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শাসনকর্তা তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া পূর্বনির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং সর্ববিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি জানাইলেন সন্নিকটস্থ নদীর অপরপার হইতে মুসলমান শাসকের অধিকার। তাঁহার সঙ্গে এখন মনোমালিন্য চলিতেছে। কাজেই ঐদিকে যাওয়া বিপদসঙ্কুল। তবে কয়েকদিনের মধ্যে অপর পক্ষের সহিত আলাপ করিয়া সুব্যবস্থা করা যাইবে। ভক্তিমান রাজকর্মচারীর আগ্রহে সেই স্থানে কয়েকদিন অপেক্ষা করা সাব্যস্ত হইল। তাঁহাকে পাইয়া স্থানীয় অধিবাসীরা খুব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে, ভজনে ও কীর্তনে সঙ্গিগণসহ চৈতন্যদেব খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় দলে দলে লোক আসিতে লাগিল এবং সেখানে নিত্যমহোৎসব আরম্ভ হইল।

বিপক্ষ মুসলমান শাসনকর্তার এক হিন্দু গুপ্তচর তখন সেখানে থাকিত। চরের নিকট তাহার মনিব এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর আগমন ও তাঁহার অলৌকিক ভাবভক্তির খবর পাইলেন। মুসলমান হইলেও সেই রাজকর্মচারীর অন্তরে হিন্দুধর্ম ও সাধুসন্ন্যাসীর উপর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। চৈতন্যদেবের খবর পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ হইল যে তিনি উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধির নিকট দূত পাঠাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। উড়িষ্যারাজপ্রতিনিধি চৈতন্যদেবের সঙ্গে এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া দূতের নিকট বলিয়া দিলেন, "যদি তিনি নিরস্ত্র হইয়া পাঁচ-সাতজন মাত্র অনুচরসহ আসেন, তবে কোন আপত্তি নাই।" তাঁহার নির্দেশমত নির্দিষ্ট সময়ে সেই ধার্মিক মুসলমান চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইল। চৈতন্যদেবের মুখে উদার ভাব ও ধর্মের জটিল তত্ত্বসমূহের সহজ সরল মীমাংসা শুনিয়া তাঁহার মন অতিশয় প্রসন্ন হইল। পরে সংকীর্তনে ভগবৎপ্রেমের উচ্চ বিকাশ দেখিয়া তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ভক্তিতে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে খুব হৃদ্যতা জন্মিল. বিদায়কালে উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে মিত্র সম্বোধন করিয়া কোলাকুলি করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য উপহার পাঠাইয়া দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের বঙ্গদেশে গমনের ইচ্ছা ও প্রতিবন্ধকের বিষয় শুনিয়া তিনি বলিয়া গেলেন, স্বীয় সৈন্যসহ নৌকাযোগে যাত্রিগণকে স্বয়ং পার করিয়া দিবেন, এজন্য কোন ভাবনা নাই।

যথাসময়ে তাঁহার প্রেরিত অতি সুন্দর নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল. চৈতন্যদেব ভগবানের নাম লইয়া সঙ্গিগণসহ তাহাতে উঠিলেন এবং সেই ভক্ত মুসলমান স্বয়ং দশ নৌকা সৈন্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া দুর্গম ভয়সংকুল এলাকা মন্ত্রেশ্বর নদ পার করিয়া দিলেন।

চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় অনুযায়ী 'দয়াল নিতাই' সেই সময়ে বঙ্গদেশে আচণ্ডালে ভগবদ্‌ভক্তি ও হরিনাম বিতরণ করিয়া সমস্ত দেশ জুড়িয়া এক প্রবল ধর্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। বাংলা তখন প্রকৃতই সোনার বাংলা--ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গোঁড়ামির ফলে তখন বাংলার বৈশ্যসমাজ শূদ্রেরও অধম বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ইহার ফলে সমাজে সংহতি ছিল না, বিদ্যা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঐশ্বর্যের মিলন ছিল না। সুবর্ণবণিক বলিয়া পরিচিত বৈশ্যগণ আচার-ব্যবহারে সর্বপ্রকারে উন্নত হইয়াও সমাজে পরিত্যক্ত ছিলেন। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার করিবার সময়ে ইহার প্রতিকারের জন্য সমাজের এই সংকীর্ণতার গণ্ডি ক্রমশঃ

ভাঙ্গিতে লাগিলেন। তখন সপ্তগ্রাম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর; অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি বহু সুবর্ণবণিক সপ্তগ্রামের অধিবাসী। নিতাই তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করিয়া আপনার প্রেমের ধর্ম প্রচার করিতেন। উদ্ধারণ দত্ত নামক জনৈক সুবর্ণবণিক-কুলতিলক তাঁহার বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন। অবধূত-শ্রেষ্ঠ ঐ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার গৃহেই অধিকাংশ কাল কাটাইতেন। একবার জনৈক রক্ষণশীল ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্ধারণ-গৃহে কিভাবে ভোজন করেন সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, অবধূত হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন,—

"কভু উদ্ধারণ রাঁধে নিত্যানন্দ খায়।
কভু নিত্যানন্দ রাঁধে উদ্ধারণ খায়॥"

তাঁহার এই বাক্যটি একটি প্রবাদরূপে গণ্য, যেহেতু তখনকার দিনে সমাজে ইহা বড়ই বিস্ময়জনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

নিত্যানন্দের প্রেরণায় সপ্তগ্রামে শ্রেষ্ঠিকুলের বিশেষতঃ সুবর্ণবণিকগণের মধ্যে বিশেষ ধর্মবুদ্ধির সঞ্চার হয়। তাঁহার কৃপায় ইঁহাদের অগাধ ঐশ্বর্য সৎকর্মে ব্যয়িত হইতে লাগিল। নিতাইয়ের প্রেরণায় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহারা স্বীয় ধন-সম্পদ ভগবানের পূজা-অর্চনাতে, সাধুভক্ত-সেবাতে, দীন-দরিদ্রের দুঃখ মোচনে নিয়োজিত করিলেন। দেশে বহু দেবালয়-মন্দির প্রতিষ্ঠা, মঠ-আখড়া স্থাপন, সংকীর্তন মহোৎসব, 'দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাং', চলিতে লাগিল। সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নিত্যানন্দ আপনার ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বঙ্গদেশে এইরূপে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসী নিমাই নদীয়ায় আসিতেছেন শুনিয়া দেশের লোক তাঁহার দর্শনাশায় অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তগণ অধীর হইয়া পথপানে চাহিয়া ছিলেন: প্রভুপাদ নিত্যানন্দের কথা ত বলিবারই নহে। চৈতন্যদেব সঙ্গীদের সহিত উড়িষ্যাপ্রান্ত হইতে বরাবর নৌকাযোগেই পানিহাটী পর্যন্ত আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। দেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহারা জলপথে আসিয়া থাকিবেন। তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া নিত্যানন্দ ও ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইলে, পূর্ববৎ নৃত্য গীত কীর্তন এবং উৎসব ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। বিশিষ্ট ভক্তগণের গৃহে পদার্পণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। যেখানে যান সেখানেই লোকের অসম্ভব ভিড় হয়; তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতবর্ষী বাণী শুনিবার জন্য দূরদূরান্ত হইতে লোক আসিয়া জমা হয়। সে-দিনের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, শ্রীচৈতন্য-পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বিশাল বঙ্গ-সমুদ্র আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীবাস পণ্ডিত তখন কুমারহট্টে বাস করিতেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাস সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী, সঞ্চয়ের ত নামই নাই, তাহার উপর উপার্জন-চেষ্টাতেও উদ্যমহীন। চৈতন্যদেব শ্রীবাসের সংসারে অসচ্ছল অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে বলিলে, শ্রীবাস তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে "এক দুই তিন" বলিয়া তিনবার হাততালি দিলেন। শ্রীবাসের অদ্ভুত ব্যবহারের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে হাততালির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এক, দুই, তিন, উপবাসের পর যদি অন্ন না জুটে, তখন গংগার জল আছে, তাহাতে প্রবেশ করিব; কিন্তু ভগবানের পাদপদ্ম ত্যাগ করিয়া অর্থের চিন্তা করিতে পারিব না। এজন্য আমার কোন ভাবনা নাই।" তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নির্ভরতার কথা শুনিয়া চৈতন্যদেবের মন খুব প্রসন্ন হইল; তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "এরূপ ভক্তের ভার ভগবান নিজেই বহন করেন।"

কুমারহট্ট[১] শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। চৈতন্যদেব গুরুদেবের জন্ম-স্থানকে পবিত্র তীর্থজ্ঞানে ভক্তিভাবে বন্দনাপূর্বক অতিশয় দীনভাব সহিত কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এখানে একটি বিষয় চৈতন্যদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ভগবানাচার্য নামক জনৈক ভক্ত, নিজের যুবতী স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে ফেলিয়া তাহার খাওয়া-থাকার কোন সুব্যবস্থা না করিয়া নিজে পুরীতে থাকিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ ও ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টা করিতেছিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে অবস্থানকালে সেই যুবতীর দুঃখকষ্টের কথা শুনিয়া তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন এবং যথাসময়ে পুরীতে ফিরিবার পর উক্ত ভক্তকে স্বীয় গর্হিত কার্যের জন্য তীব্র তিরস্কার করিয়া দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব কুমারহট্ট হইতে শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে কাঁচরাপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। শিবানন্দ তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় সপরিবারে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহাদের সেই আশা সফল হওয়ায় প্রাণে অসীম আনন্দের উদয় হইল। শিবানন্দ তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে সেবা করিয়া স্বীয় মনুষ্যজীবন ও ধনজন সার্থক করিলেন। শিবানন্দের গৃহে একরাত্রি বাস করিয়া তাঁহার প্রিয় সঙ্গী সুগায়ক মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের জীবের পাপভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই মহানহৃদয় বাসুদেব দত্তকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিলেন। তারপর সেখান হইতে সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। বঙ্গদেশে আসা অবধি সর্বস্থানেই

১ কুমারহট্ট—বর্তমানে ২৪ পরগণা জিলার হালিসহর।

দর্শনাথীর ভিড় জমিতেছিল এবং দিনে দিনে তাহা বাড়িয়া এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বাচস্পতির বাড়ীর লোকের পক্ষে বাড়ীতে থাকা দায় হইয়া উঠিল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ গোপনে চৈতন্যদেবকে কুলিয়া গ্রামে মাধবদাস নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন ভক্তের সুবৃহৎ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সমবেত জনতা চৈতন্যদেবের দর্শন না পাইয়া অতীব চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তিনি বাচস্পতির গৃহের ভিতরে আছেন মনে করিয়া অনেকে তাঁহার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। পরে যখন শোনা গেল, তিনি মাধব দাসের বাড়ীতে কুলিয়ায় গিয়াছেন, জনস্রোত তখন সেই দিকেই ছুটিল।

মাধবদাসের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে বহু লোক সমক্ষে ভক্তগণ-সঙ্গে চৈতন্যদেব পরমানন্দে নৃত্যগীত সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র দর্শনাথীর আগমনে সেখানেও এক মহামেলা বসিয়া গেল।

"কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবল বর্ণিতে পারে সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
খেয়ারীর কত বা হইল উপার্জন।
কত হাট বাজার বসায় কতজন॥
সহস্র সহস্র কীর্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবাই পরমানন্দে গায়॥"

চৈতন্যদেব কুলিয়াতে সাত দিন অবস্থান করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রাণে শান্তির সুশীতল বারি সিঞ্চন করিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া লোকের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল—অপরূপ মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক হইল এবং সুমধুর কীর্তন, নৃত্যগীত ও অপূর্ব ভাবাবেশ দেখিয়া মন মোহিত হইল। নবদ্বীপের সম্মুখে গঙ্গার অপর পারেই কুলিয়া—নবদ্বীপ হইতে দেখা যাইত। নবদ্বীপের সমস্ত লোক কুলিয়াতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন; এমনকি পূর্বে যাঁহারা তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া ফিরিলেন। সন্ন্যাসীর সৌম্য-শান্ত প্রেমময় মূর্তি দেখিয়া নাস্তিকেরও হৃদয় বিগলিত হইল, শত্রু মিত্র হইল, পাষণ্ড ভক্ত হইল। শোনা যায়, কুলিয়াতে দর্শনপ্রার্থী জনতার এমন ভিড় হইয়াছিল যে মাধবদাসকে নিজের বাড়ীঘর রক্ষার জন্য গড় বাঁধিতে হইয়াছিল।

"কুলিয়ানগরে সংঘট্টের অন্ত নাই।
বালবৃদ্ধ নরনারী হৈলা এক ঠাঁই॥

নিশায় মাধবদাস বহুলোক লৈঞা।
বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধি যাঞা॥
প্রাতঃকালে বাঁশগড় সব চূর্ণ হয়।
লোক ঘটা নিবারিতে শক্তি কার নয়॥"

—চৈতন্যভাগবত

চৈতন্যদেবের আগমন-বার্তা শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার কর্ণে পেঁৗছিয়াছিল। তাঁহারা একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়া পারাপারের জন্য বহু লোকের সমাগম ও অপর পারে কুলিয়ার হৈচৈ হুলস্থূল প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।[১] সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যই লোকের এই আগ্রহ একথা বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। পুত্রমুখ দর্শনের আশায় বৃদ্ধার আকুল হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ের অবস্থাও সেইরূপ, তথাপি তিনি কোনপ্রকারে আত্মসংবরণ করিয়া তাড়াতাড়ি বিবশদেহা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। লোকমুখে সন্ন্যাসীর অলৌকিক কাহিনী, মহাসংকীর্তন, নৃত্যগীত ভাবাবেশ, আর লক্ষ লক্ষ লোকসমাগমের কথা শুনিয়া তাঁহারাও বিহ্বলমনা হইতে লাগিলেন। এত নিকটে গঙ্গার অপর পারে তিনি, কিন্তু যাইবার উপায় নাই। তিনি স্বয়ং যাইবার জন্য খবর না দিলে তাঁহারা যাইবেন কিরূপে? এই দুঃখ যখন অসহ্যপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তখন খবর আসিল, আগামী প্রভাতে জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে সন্ন্যাসী আসিতেছেন। আনন্দে উল্লাসে সে রাত্রিতে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুম হইল না, সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে করিতে, তাঁহারই চিন্তায় নানা জল্পনা-কল্পনা করিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল।

সন্ন্যাসিচূড়ামণি নবদ্বীপে আসিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ভক্তের আশ্রমে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং পরদিন প্রভাতকালে গঙ্গাস্নানান্তে, জননী এবং জন্মভূমি সন্দর্শনে আসিয়া মিশ্রভবনের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সকলে না জানি কত কি বলিবে, কত কি করিবে এইরূপ ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মতেজোদ্ভাসিত এই মুখমণ্ডল দেখিয়া কাহারও কোন বাক্যস্ফূর্তি হইল না। স্বভাবতঃ হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হওয়ায় সকলেরই মস্তক অবনত হইল। এ-মূর্তি ত নিমাই পণ্ডিতের নহে,—ত্রিতাপদগ্ধ জীবের হৃদয় সুশীতল করিবার জন্য এ যেন দিব্যধাম হইতে কাহারও আবির্ভাব। যতিরাজ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি এবং শতস্মৃতিবিজড়িত বাসভবন ও গৃহ-

---

১ পথ কেহ নাহি পায় লোকের গহনে।
বন জল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দরশনে॥"

—চৈতন্যভাগবত

সামগ্রীসমূহ নিরীক্ষণ করিলেন। প্রবাসী গৃহস্থের যেসব জিনিসের স্মৃতি-মাত্রেই চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, মায়ামোহকর সেই সকল দ্রব্য নিকটে দেখিয়াও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর চিত্তে বিন্দুমাত্র তরঙ্গ উত্থিত হইল না। প্রশান্ত নির্বিকার চিত্তে পলকের তরেও এই সকলে 'আমার'-বুদ্ধি জন্মিল না। শরতের নির্মল আকাশের ন্যায় তাঁহার সুপ্রশস্ত উজ্জ্বল উন্নত ললাটে বিন্দুমাত্র চিন্তা-মেঘের সঞ্চার হইল না। চারিদিকে অসংখ্য লোক নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছে,—মধ্যস্থলে প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসী। অকস্মাৎ জনৈকা অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার চরণ সমীপে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অতিশয় দীনহীনবেশা, নিরাভরণা, ক্ষীণাঙ্গী, সর্বাঙ্গ-বস্ত্রাবৃতা নারীমূর্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী পশ্চাতে হটিয়া গেলেন,—চিনিতে পারিলেন না। কিরূপেই বা পারিবেন! শুক্লা চতুর্দশীর পূর্ণাবয়বা যে শশীকলার সুষমা-রাশিতে একদিন মিশ্রভবন আলোকিত হইয়াছিল, আজ কৃষ্ণা চতুর্দশীর নিশাশেষে তাহাকে আকাশকোণে লুক্কায়িতা জ্যোতিঃরেখা মাত্র রূপে উঁকি মারিতে দেখিলে না চেনাই ত স্বাভাবিক! পরে পরিচয় পাইয়া সন্ন্যাসী বিনম্র-গম্ভীর অথচ প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—

"তব নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোমারে কহিনু কথা দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥"

—চৈতন্যমঙ্গল

আত্মসংবরণ করিয়া দেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত। সন্ন্যাসীর পদযুগলে দৃষ্টি স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃত-বাসে অধোবদন দেবী দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ যেন মন্দিরদ্বারে ধ্যানমগ্না নিবেদিতপ্রাণা কোন পূজারিনী, অথবা কোন রাজ-রাজেশ্বরের সম্মুখে এক দরিদ্রা ভিখারিনী। "আমি নিঃসম্বল সন্ন্যাসী, দিবার মত আমার কিছুই নাই, —যাহা আছে দিলাম, গ্রহণ কর।" স্নেহস্বরে এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার চরণকমল হইতে কাষ্ঠপাদুকাযুগল বিমুক্ত করিয়া দিলেন। দেবীর কঠোর তপস্যার—সুদীর্ঘ ব্রতের আজ উদ্‌যাপন! জননী বিষ্ণুপ্রিয়া ধৈর্য সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি! নিজ সুখভোগের আশায় ঈষন্মাত্রও চঞ্চল হইয়া হা-হুতাশ কান্নাকাটি করা, কিংবা স্বামীকে কোনপ্রকারে অনুযোগ দেওয়ার ভাব তাঁহার অন্তরে কখনও স্থান পায় নাই। তিনি তাঁহার ধর্মপত্নী, চিরকাল ধর্মপথের সহায়। সন্ন্যাসীর সহধর্মিণী, কাজেই আজীবন সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করা তাঁহারও ব্রত। আজ তাঁহার এ কঠোর পাতিব্রত্যে সিদ্ধিলাভ

হইল। দেবী করকমলদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু গ্রহণ পূর্বক মস্তকে স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন,—প্রেমাশ্রুতে পাদুকার অভিষেক হইল। তাঁহার আরাধ্য দেবতা আজ তাঁহাকে সকলই দিয়াছেন। আনন্দে দেবীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসী অতি ধীর-সন্তর্পণে জননীর চরণ বন্দনা করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সেই পরমারাধ্য পাদুকাযুগল বেদীতে স্থাপনা করিয়া সমস্ত জীবন অতিশয় নিষ্ঠা-ভক্তি সহকারে অর্চনা করিতে লাগিলেন।

শুক্লাম্বরের গৃহে অবস্থান, জন্মভিটা দর্শন ও বিষ্ণুপ্রিয়া-সাক্ষাতের বিবরণ 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখেন নাই, কিন্তু অন্য প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে উহার উল্লেখ থাকায় আমরা সংক্ষেপে উহা প্রকাশ করিলাম। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের সঙ্গে পত্নীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত। দেবী তাঁহার প্রধানা অনুগতা শিষ্যা হইয়া যে আশ্চর্য অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল উৎস। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর দেবী ছিলেন পার্ষদ ভক্তগণের আশ্রয় ও আদর্শ। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিলেও, তাঁহার করুণাকণা প্রাপ্ত হইয়া বহু লোকের জীবন ধন্য হইয়াছিল। পরবর্তী বৈষ্ণব গ্রন্থসকলে তাঁহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। শুধু ইহাই নহে, চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর যিনি তাঁহার ধর্মভাব সর্বত্র প্রচার করিয়া লোকের নিকট তাঁহারই মহিমার বিশেষ প্রকাশ-মূর্তি রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন,—সেই শ্রীনিবাস ঠাকুর মহাশয়কে জননী বিষ্ণুপ্রিয়াই শক্তি সঞ্চার করেন। শ্রীনিবাস ঠাকুরের প্রতি দেবীর কৃপার কথা 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অল্প-বয়স্ক শ্রীনিবাস পরম ভক্ত। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে অন্তরে নিদারুণ আঘাত পাইয়া জীবনে অতিশয় হতাশা আসিলে দেবী তাঁহাকে অহেতুক কৃপা প্রদর্শন ও আশ্রয় দান করেন।

"এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিলা মাথে তুলি॥
শুন শুন ওহে বাপু তুমি ভাগ্যবান।
তোমাতে চৈতন্যশক্তি ইথে নাহি আন॥
তবে শান্তিপুরে যাই খড়দহে যাবে।
আচার্য গোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে॥

খড়দহে যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ।
তোমা পাইয়া জাহ্নবার হইবে আনন্দ॥
বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ্র করি।
অনেক শুনিবে দেখিবে রূপের মাধুরী॥
সর্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন।
সর্ব সিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ॥"

—প্রেমবিলাস

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তপস্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অদ্ভুত চিত্র পাওয়া যায়।

"প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণা চতুর্দশীর শশী প্রায় ক্ষীণ॥
হরি নাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাহাই কিঞ্চিৎমাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন॥"

—ভক্তিরত্নাকর

নবদ্বীপ হইতে আসিয়া চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত ভক্তের সমাগম, আর পূর্বের ন্যায় আনন্দোৎসব, অহোরাত্র সংকীর্তন আরম্ভ হইল। আচার্য সপরিবারে উল্লসিত অন্তঃকরণে সকলের সেবায় ও সম্বর্ধনায় যত্নবান রহিলেন। চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে নবদ্বীপে শিবিকা প্রেরিত হইলে শচীদেবী আসিলেন এবং আসিয়াই পূর্বের ন্যায় স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া সন্ন্যাসী পুত্রকে ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য আজ মায়ের কাছে ঠিক সেই পূর্বের মত মাতৃগতপ্রাণ স্নেহাকাঙ্ক্ষী বালক নিমাই। এইরূপ দশ দিন আচার্যগৃহে আনন্দোৎসবে কাটিয়া গেলে সন্ন্যাসি-পুত্র জননীর চরণে প্রণতি জানাইয়া উত্তর-পশ্চিমের তীর্থরাজি—কাশী, প্রয়াগ, ব্রজমণ্ডল দর্শনের অনুমতি ও আশীর্বাদ চাহিলেন। মায়েব আশিস্ শিরে ধারণ করিয়া তাঁহাকে শিবিকাযোগে নবদ্বীপ পাঠাইয়া দিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া পরিব্রাজক যাত্রীর পুনরায় যাত্রা শুরু হইল।

পথে পথে স্থানে স্থানে বহু ভক্ত সঙ্গী হওয়াতে দল ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, এবং শীঘ্রই উহা এক বিরাট জনতায় পরিণত হইল। ইহারা যখন যেখানে উপস্থিত হন, স্থানীয় ভক্ত সজ্জন ব্যক্তিরাই ভিক্ষার ও বাসস্থানের

সুব্যবস্থা করিয়া দেন। দলবৃদ্ধি হইলেও নিঃসম্বল চৈতন্যদেব একান্তভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গীদেরও সঞ্চয় করিবার উপায় নাই, যখন যেমন জোটে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এইভাবে অগ্রসর হইয়া ক্রমে অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী হইলে একটি ঘটনা চৈতন্যদেবের তীক্ষ্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

একদিন ভিক্ষার পরে মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ ঘোষ নামক জনৈক ত্যাগী তরুণ সেবক গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া একটি হরীতকী লইয়া আসিলেন এবং হরীতকীটি ভাঙ্গিয়া অর্ধেক চৈতন্যদেবের হাতে দিয়া বাকী অর্ধেক নিজের বস্ত্রের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন। পরদিন ভিক্ষার পরে যখন আবার মুখশুদ্ধির প্রয়োজন হইল, সেইটুকু বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি হাতে দেওয়াতে চৈতন্যদেবের মনে সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ আজ এত শীঘ্র হরীতকী কোথায় পাইলে?" তদুত্তরে গোবিন্দ যখন বলিলেন কল্যকার হরীতকীর অর্ধেক তাঁহার কাপড়ে বাঁধা ছিল, তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠিল। গোবিন্দকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, ত্যাগের পথে চলা বড়ই কণ্টকময়। আমার মনে হইতেছে, ভগবানে ষোল আনা নির্ভর না করিয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবার ভাব তোমার অন্তরে এখনও বর্তমান। কাজেই তুমি ত্যাগের পথ ছাড়িয়া সঞ্চয়ের পথে চল,—গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন কর।" গোবিন্দ স্বীয় অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক অতিশয় স্নেহের সহিত বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐকান্তিক শুভাকাঙ্ক্ষী, অহেতুক কৃপাসিন্ধু জগদ্‌গুরুর উপদেশে গোবিন্দের নিকট তাঁহার স্বীয় দুর্বলতা ধরা পড়িল। তিনি অতিশয় কাতরভাবে স্বীয় শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা জানিতে চাহিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মানুযায়ী প্রত্যেক জীবের সংস্কার পৃথক হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর আশ্রয় ও উপদেশ গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ অধিকার অনুসারে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইলেই শ্রেয়োলাভ হয়। স্বীয় অধিকার বিচার না করিয়া স্বেচ্ছায় অথবা অপরের দেখাদেখি যে-কোন পথ আশ্রয় করিলে কোন উন্নতি ত হয়ই না, অধিকন্তু বিড়ম্বনা ঘটে।

চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী গোবিন্দ সংসার করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজ ভোগসুখের জন্য নহে, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে। বাৎসল্যভাবে ভগবানের সেবা করিয়া গোবিন্দ শ্রীভগবানকে চিন্ময় নিত্যপুত্ররূপে লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন। অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ বিগ্রহ

তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। গোপীনাথই পুত্ররূপে তাঁহার পিতৃস্নেহ আস্বাদন করিয়াছিলেন।

আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিতে করিতে এবং গঙ্গার তীরবর্তী তীর্থক্ষেত্রসমূহ দেখিতে দেখিতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যতিরাজ ভক্তমণ্ডলীসহ ক্রমে গৌড় নগরের নিকটবর্তী 'রামকেলি' নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকেলি অতি সুন্দর সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ,—ধনী-বিদ্বান বিশিষ্ট সজ্জনের বাসভূমি। সন্ন্যাসীর দর্শনলাভে গ্রামবাসীর চিত্তে শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। তাঁহারা মণ্ডলীসহ তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আহার-বাসস্থানাদির সুব্যবস্থা করিলেন। রামকেলির অনুগত ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে চৈতন্যদেবের সেইস্থানে কয়েকদিন বিশ্রাম করা সাব্যস্ত হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বহু লোক আসিয়াছিলেন,—এখানে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করাতে ঐ দল দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনিও সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া খুব সংকীর্তন ও হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক প্রবল ধর্মান্দোলন আরম্ভ হইল।

আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের কানে পেঁছিলে তাঁহার মনে অতিশয় উদ্বেগ জন্মিল, পাছে দেশে কোন বিদ্রোহ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। হুসেনশাহ কেশব ছত্রী নামক জনৈক কর্মচারীকে সন্ন্যাসীর ভাবস্বভাব ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে খোঁজ লইবার জন্য ভার দিলেন। ধর্মপ্রাণ সাধুভক্ত কেশব ছত্রী চৈতন্যদেবের অনুসন্ধান লইয়া নবাবকে জানাইলেন, সন্ন্যাসী তীর্থপর্যটক ভিক্ষুক, অতিশয় শান্তশিষ্ট ভালমানুষ ; তাঁহাকে ভয় করিবার কোনই কারণ নাই। হুসেনশাহ কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না ; লোকের মুখে সন্ন্যাসীর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা নানা আকারে কর্ণগোচর হইতে থাকায়, তাঁহাকে খুব চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি চৈতন্যদেবের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিলেন।

চরমুখে নবাবের কর্ণে চৈতন্যদেবের নানা কাহিনী পেঁছিতে লাগিল। তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও লোকের উপর অত্যধিক প্রভাবের বিষয় শুনিয়া তিনি কর্তব্য নির্ধারণের জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী দবীর খাস[১] (একান্ত সচিব)-কে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। দবীর খাস অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি, নবাব সর্বদা তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলেন। তখনকার মুসলমান ভূপতিগণ শুধু ধর্ম না দেখিয়া যোগ্যতা বিচার করিয়াই রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন, এজন্য তাঁহাদের শাসনকালে অনেক উচ্চপদেই বহু সুযোগ্য হিন্দু কর্মচারী

---

১ দবীর—লেখক, সচিব ; খাস—স্বকীয়, একান্ত।

থাকিতেন। হুসেনশাহ দবীর খাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সন্ন্যাসীকে এত লোক কেন অনুসরণ করিতেছে? সন্ন্যাসীর দলবলসহ এখানে আসিবার কারণ কি? আমি বহু চেষ্টা করিয়া নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা দিয়াও লোককে বশে রাখিতে পারিতেছি না, অথচ সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে সহস্র সহস্র লোক ফিরিতেছে, ইহার রহস্য উদঘাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন।" দবীর খাস বাদশাহকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিলেন এবং চৈতন্যদেবের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী বাস্তবিকপক্ষে সাধারণ মনুষ্য নহেন, তাঁহার মধ্যে ঐশী শক্তি রহিয়াছে, তাহা না হইলে কখনও এত লোক মানিত না; তবে তাঁহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই, কারণ তিনি রাজ্য-ধন-সম্পদের প্রার্থী নহেন, এই সকলকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক ভগবান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে তাঁহার মন নাই। আর তাঁহার ধর্মভাব ও চরিত্র অতি উদার এবং মহৎ। তাঁহার নিকট উচ্চনীচ বিচার নাই, হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই, তিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, সমান-ভাবে ভালবাসেন। তিনি সর্বদা ভগবানের নামগুণ কীর্তন করেন। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট ভগবদ্ভক্তি প্রচার ও সকলের চিত্ত ভগবানের অভিমুখী করাই তাঁহার একমাত্র কাজ। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তিনি এই স্থানে আসিয়াছেন, লোকের আগ্রহে কয়েকদিন বিশ্রাম করিতেছেন, শীঘ্রই পশ্চিমে রওয়ানা হইবেন।" নবাবের অন্তর তাঁহার বাক্যে প্রফুল্ল হইয়াছে বুঝিয়া দবীর খাস আরও বলিলেন, "হুজুর, আমি সন্ন্যাসীর কথা বিশেষরূপে অবগত আছি। এইরূপ সাধুপুরুষের দ্বারা আপনার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না, বরং লোকের ভিতর ধর্মভাব বৃদ্ধি পাইলে রাজভক্তি বৃদ্ধি হইবে, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষণ সহজ হইবে।" নবাবের মনে সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব সঞ্চার করিয়া দবীর খাস আরও বলিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার অতিশয় সৌভাগ্য সেইজন্যই আপনার রাজ্যে এমন ধার্মিক মহাপুরুষ স্বয়ং আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। এরূপ সাধুপুরুষকে কোন ভাবে হিংসা করিলে ভগবান রুষ্ট হইবেন, বরং ইঁহার সেবা করিলে আমাদের পরম মঙ্গল হইবে।" বিশ্বস্ত প্রিয় মন্ত্রীর কথায় হুসেন সাহেব নিশ্চিন্ত হইলেন এবং আদেশ দিলেন, "সন্ন্যাসী যতদিন খুশী থাকুন, আর তাঁহার সেবাযত্নের যেন কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়; তোমার উপরই দেখাশুনার ভার দিলাম।"

শাকর মল্লিক[১] (রাজমন্ত্রী) দবীর খাসেরই অনুজ। ইঁহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও শিক্ষা-দীক্ষা চালচলন পোশাক-পরিচ্ছদাদি মুসলমান ঘেঁষা ছিল বলিয়া অথবা অন্য কোন কারণে হউক, গোঁড়া সামাজিক দৃষ্টিতে তাঁহারা

---

১ শাকর মল্লিক (শাকর—শ্রেষ্ঠ; মল্লিক—গৌরবপাত্র)—অতিশয় পদস্থ ব্যক্তি। কাহারও মতে, দবীর খাস— মন্ত্রণা সচিব; শাকর মল্লিক—অর্থ সচিব।

বিধর্মীর ন্যায় পতিত ছিলেন। কিন্তু, এইভাবে বাহ্যিক ভিন্নরূপ মনে হইলেও দুই ভাই-ই অন্তরে অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দেব-দ্বিজ-সেবাপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত।

চৈতন্যদেবের অলৌকিক মহিমা দুই ভাই বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। যদিও এপর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা দুই ভাইয়ের কাহারও হয় নাই, তথাপি পত্র ব্যবহার ছিল। রাজকর্মের দায়িত্বই তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের অন্তরায়। তিনি হুসেনশাহের শত্রুর রাজত্বে বাস করেন, সেখানে তাঁহাদের মত উচ্চ কর্মচারীর যাতায়াত বড়ই সংকটপূর্ণ। সেজন্য দুই ভাই কিছুকাল পূর্বে রাজকর্ম ও সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে পুরীতে গিয়া মিলিত হইবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে অনাসক্তভাবে সংসারের কাজ-কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া অন্তরে ভগবানের চিন্তা করিতে উপদেশ দেন এবং সেই ভাবের পরিপোষক একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান,—

> "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি।
> তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥" [১]
>
> —বাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপশম প্রকরণ, ৭৪।৮৩

দুষ্টা স্ত্রীলোক পতির গৃহে কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্তরে উপপতির সঙ্গসুখের রস আস্বাদন করে; সেইরূপ সংসারের কাজকর্মের ভিতর থাকিয়াই ভগবানের দিকে মন রাখা প্রয়োজন। তাঁহার সেই উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া দুই ভাই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

দবীর খাস গৃহে ফিরিয়া শাকর মল্লিকের নিকট সন্ন্যাসীর প্রতি নবাবের এই মনের ভাব—সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলেন। দুই ভ্রাতায় আলোচনা হইতে লাগিল। যুক্তিপরামর্শ করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন, "চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া রাজার মনোভাব জানাইবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাকে এইস্থান ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন। দিনে দিনে লোকসমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে; বিধর্মী রাজার মনের গতি কখন কিরূপ হয় বলা যায় না।" বাদশাহ সন্ন্যাসীর সেবাযত্ন করিবার অধিকার দেওয়াতে, আজ তাঁহাদের পক্ষে চৈতন্য-দেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের পথ কিছু সুগম; রাত্রিকালে দুই ভাই সন্ন্যাসি-দর্শনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমন-বার্তা শুনিয়া সন্ন্যাসীরও আনন্দের সীমা রহিল না। অতীব উল্লসিত হইয়া তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইলেন

---

১ উক্ত শ্লোকটি পঞ্চদশীতেও (ধ্যানদীপ প্রকরণম্, শ্লোক ৮৪) আছে। রূপ-সনাতনের শিক্ষাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেব পরেও পঞ্চদশীর বাক্য প্রমাণ দিয়াছেন, দেখা যায়। পঞ্চদশী অদ্বৈত-বেদান্তের শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ।

এবং প্রেমালিঙ্গনের জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চলিলেন। যদিও দুই ভাই রাজতুল্য সম্মানিত, তথাপি তাঁহার নিকট অতি দীনহীন ভাবে আসিয়াছেন। চৈতন্যদেবকে এইরূপে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাদের মনে অতিশয় সঙ্কোচ জন্মিল,—ভীত হইয়া অপরাধীর ন্যায় পিছনে হটিয়া গিয়া করজোড়ে বলিলেন, "প্রভো! আমরা আপনার স্পর্শের যোগ্য নাহি।" অশ্রুপূর্ণলোচনে, এই কথা বলিয়াই দুই ভাই দণ্ডবৎ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের নিষেধ না মানিয়া উভয়কেই প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিলেন। তাঁহারা কাতরভাবে বলিলেন,—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
...   ...
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥"

তাঁহাদের দীনতা দেখিয়া চৈতন্যদেবের হৃদয় বিগলিত হইল।

"শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ-দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোহার নাম রূপ-সনাতন[১]।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোব মন॥"

বহুদিবসের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। দুই ভাই অকপটে চৈতন্যদেবকে আপনাদের মর্মব্যথা জানাইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনিও অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

"গৌড় নিকট আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥"

উভয়কে নিত্যানন্দ প্রভু ও বিশিষ্ট ভক্তগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে, দুই ভাইয়ের বিনয়, নম্রতা ও ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া সকলেরই অন্তর পুলকিত হইল। পরে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইলে, চৈতন্যদেবের মুখে অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া দুই ভাই অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

---

১ শ্রীরূপ—শাকর মল্লিক ; শ্রীসনাতন—দবীর খাস।

বিদায় লইবার পূর্বে সনাতন চৈতন্যদেবকে হুসেনশাহের অন্তরের ভাব জানাইয়া বলিয়া গেলেন, "প্রভো! এখানে আর বেশী দিন আপনার থাকা উচিত নহে, বিধর্মী রাজার মতি-গতি কখন কিরূপ হইবে ঠিক নাই।" তাঁহাদের কথার মর্ম বুঝিয়া তিনিও জানাইলেন, শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন; তাঁহাদেরই জন্য এতদিন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে মিলন হইল, এখন আর থাকার প্রয়োজন নাই। দুই ভাই চৈতন্যদেবের নিকট নিজেদের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য ও বিষয়সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতঃ, উহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া একান্তভাবে ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "পূর্বে পত্রে যেরূপ লিখিয়াছি, সেইভাবেই বাহিরে সংসার কর, আর অন্তরে ভগবানের ভজনা করিতে থাক; সময় হইলে তিনিই পথ দেখাইবেন।" তাঁহার পাদপদ্মে বারংবার সাশ্রুনয়নে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উভয় ভ্রাতা বিদায় লইলেন; তিনিও পুলকে পূর্ণ হইয়া প্রেমালিঙ্গন দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। যাইবার সময়ে সনাতন চুপিচুপি চৈতন্যদেবকে বলিলেন, "তীর্থযাত্রাতে একা কিংবা মনোমত একজন সঙ্গী থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

"ইঁহা হইতে চল প্রভু ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবন যাত্রার এ নহে পরিপাটী॥"

দুই-তিন দিন পরেই চৈতন্যদেব রামকেলি ত্যাগ করিয়া চলিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, কানাইর নাটশালা[১] নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। কানাইর নাটশালা অতি প্রসিদ্ধ স্থান। শোনা যায় সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনীর মূর্তি-চিত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সমস্ত দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। পথে পথে সঙ্গীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া চৈতন্যদেবের মনে চিন্তা হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'বিচক্ষণ সনাতন ঠিকই বলিয়াছিলেন,—তাঁহার কথার গভীর তাৎপর্য আছে। এত লোক সঙ্গে থাকিলে তীর্থদর্শনে কোনরূপেই শান্তি হইবে না। একাকী সঙ্গিহীন হইয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া না চলিলে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। আরও মনে পড়িল, শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরী ও অন্যান্য মহাত্মারা নিঃসঙ্গ হইয়া তীর্থাদি ভ্রমণ করিতেন বলিয়াই পরম কারুণিক শ্রীভগবানের

১ কানাইর নাটশালা—রাজমহলের নিকট অবস্থিত।

অশেষ কৃপা প্রতিমুহূর্তে তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইত। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া চৈতন্যদেব উপস্থিত তীর্থযাত্রার সংকল্প ত্যাগ করিলেন, এবং কানাইর নাটশালা হইতে ফিরিয়া পুনরায় শান্তিপুরে আচার্যভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া আচার্য ও ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্যগৃহে পুনরায় আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল এবং নবদ্বীপ হইতেও ভক্তগণ আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে শিবিকা পাঠাইয়া শচীদেবীকেও আবার আনা হইল।

শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস নামক জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্ত এইসময়ে শান্তিপুরে আসিয়া চৈতন্যদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন। রঘুনাথের বাসস্থান সপ্তগ্রাম [১]। বর্তমান কলিকাতা নগরীর ন্যায়, সপ্তগ্রাম তখন বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। সপ্তগ্রামের বণিকেরা তখন দেশে-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেন। সোনার বাংলার সেই প্রাচীন ঐশ্বর্যনগরী সপ্তগ্রামের মহা প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন হিরণ্য ও গোবর্ধন নামক দুই ভ্রাতা। তাঁহাদের একমাত্র বংশধর রঘুনাথ—কনিষ্ঠ গোবর্ধনের সন্তান। হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারির আয় তখনকার দিনে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা,—বর্তমান সময়ের প্রায় এক কোটি টাকার সমান। ধার্মিক, পরোপকারী, সদাশয় হিরণ্য-গোবর্ধন আপনাদের বিপুল ধনরাশি অকাতরে নানাপ্রকার সৎকর্মে ব্যয় করিতেন; নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের বিদ্যার্থীদের জন্য তাঁহাদের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। দেবালয় নির্মাণ, ধার্মিক-সজ্জনের সেবাতেও তাঁহারা আগ্রহান্বিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের মাতামহ জ্যোতির্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্তী মহাশয় এবং অদ্বৈতাচার্য তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

বাল্যকাল হইতেই ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ রঘুনাথ চৈতন্যদেবের মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সন্ন্যাসের পর তিনি যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে রঘুনাথও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আচার্যভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া ও আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি রঘুনাথের এমন প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়াছিল যে, তখনই গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া চিরকাল তাঁহারই নিকট বাস করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন চৈতন্যদেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শুনাইয়া ঘরে থাকিয়া ভগবদ্ভজন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী ঘরে গিয়া ভগবদ্‌ভজনে কাল কাটাইলেও রঘুনাথের মন চৈতন্যদেবের চরণেই পড়িয়া ছিল। দিবারাত্র ভাবিতেন, কখন কিভাবে আবার তাঁহার দর্শন মিলিবে! ইহার কিছুকাল পরে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ

---

১ সপ্তগ্রাম—হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর নিকট অবস্থিত।

যখন চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী ভগবদ্‌ভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌড়দেশে আসিলেন, তখন তাঁহার কৃপালাভ করিয়া রঘুনাথের মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠিকুল ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের আগ্রহে নিত্যানন্দ যখন তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রঘুনাথও তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেন।

এইভাবে কিছুকাল গত হইলে, রঘুনাথের অন্তরের বৈরাগ্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল এবং একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া, চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য নীলাচলের পথে চলিলেন। রঘুনাথের বাপ-জেঠার লোকজনের অভাব নাই; তাঁহারা খোঁজ করিয়া রাস্তা হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনাইলেন। রঘুনাথকে অনেক বুঝানো হইল, তাঁহার মা-বাপ-জেঠা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই দুঃখিত চিত্তে তাঁহাকে নানা কথা বলিলেন, কিন্তু ঐ সকল বাক্যে তাঁহার মনের বৈরাগ্য কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। ধনজন অতুল ঐশ্বর্যের মোহ, সুন্দরী স্ত্রীর ভালবাসা, বাপ-মা জেঠা-জেঠীর অপরিসীম স্নেহ,—তাঁহার সেই প্রবল বৈরাগ্যের নিকট সকলই হার মানিল। মায়ার-বাঁধন তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না, তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বংশের একমাত্র প্রদীপ, কাজেই উপায়ান্তর না দেখিয়া অভিভাবকগণ তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ করিলেন, এবং দিবা-রাত্র পাহারা দিবার জন্য প্রহরী রাখিলেন।

কানাইব নাটশালা হইতে চৈতন্যদেবের ফিরিয়া আসিবার পর, শান্তিপুরে যে আনন্দোৎসব চলিতেছিল, লোকমুখে সেই খবর রঘুনাথের কানে পেঁছিলে রঘুনাথ উতলা হইলেন এবং চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য অতিশয় কাতরভাবে মা-বাপের নিকট মিনতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কাতর ভাব ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মাতা-পিতা-জেঠা স্থির থাকিতে পারিলেন না। হিরণ্য-গোবর্ধন প্রহরী সঙ্গে দিয়া, বহু জিনিস-পত্র উপহারসহ, রঘুনাথকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া রঘুনাথের অন্তর শান্ত হইল। চৈতন্যদেবও তাঁহার প্রতি অসীম স্নেহভালবাসা প্রকাশ করিলেন এবং কয়েকদিন তাঁহার নিকট থাকার অনুমতি দিলেন। শান্তিপুরের সেই 'পিরীতি-নগরে' বসতি করিয়া, 'প্রেমের হাটবাজারে' রঘুনাথ এবার অনেক সওদা করিলেন। বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গেও তাঁহার আলাপ-পরিচয়, মেলা-মেশা হইল। তখন সেখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ, ভজন কীর্তনেই দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় কাটিতেছে। চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের বিচিত্র চরিত্র, অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া, এই মর্ত্যলোকের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। সংসারের আবিলতা, বিষয়-বিষের তিক্ততা, ঈর্ষাদ্বেষ-কলহের নামগন্ধও এখানে নাই। প্রেম-ভক্তি-প্রীতি, বিষয়-বিতৃষ্ণা, দেহে-গেহে উপেক্ষা, সুখে-দুঃখে সমভাব,—

এখানকার দর্শনীয় বস্তু। রঘুনাথের চিত্ত আনন্দে ভরপুর হইল। ইতিমধ্যে অবসর বুঝিয়া একদিন রঘুনাথ চৈতন্যদেবের নিকট নিজ অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং আর গৃহে না ফিরিয়া বরাবর তাঁহার চরণপ্রান্তেই বাস করিবার অনুমতি চাহিলেন। রঘুনাথের বিষয়ে বিরাগ এবং ভগবানে অনুরাগ দেখিয়া চৈতন্যদেবের চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন হইলেও, উপস্থিত তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন এবং প্রবোধ দিয়া বলিলেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও না হইও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

সদুপদেশ ও সান্ত্বনা পাইয়া রঘুনাথের মন অনেকটা শান্ত হইল। চৈতন্যদেব শান্তিপুর ত্যাগ করিলে তিনিও তাঁহার শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করিয়া এবং তাঁহার ও অন্যান্য ভক্তগণের আশীর্বাদ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। বিদায়কালে চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, "আগামী বৎসর উত্তর-পশ্চিমের তীর্থদর্শনে যাইবার ইচ্ছা; তীর্থদর্শনান্তে পুরী প্রত্যাবর্তন করিলে তুমি গিয়া দেখা করিও।"

এইভাবে এ-যাত্রাও দশদিন মহানন্দে কাটাইয়া জননী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া চৈতন্যদেব পুরী রওয়ানা হইলেন। চৈতন্যদেব অতি শীঘ্র পুরী পেঁছিবার জন্য অন্যান্য সঙ্গীদিগকে পরে আসিবার অনুমতি দিয়া দামোদর পণ্ডিত ও বলভদ্র ভট্টাচার্য,—এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

"বলভদ্র ভট্টাচার্য পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥"

গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া গেলেন, "আগামী রথযাত্রায় আপনারা আর এ বৎসর পুরী যাইবেন না; বর্ষার পরেই উত্তর-পশ্চিম যাত্রা করিবার ইচ্ছা। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রাণপ্রিয়কে বিদায় দিলেন।

চৈতন্যদেব তাড়াতাড়ি চলিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে, অপ্রত্যাশিত সময়ে তাঁহাকে পাইয়া সার্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বিস্মিত হইয়া তাঁহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—

"বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥
এত মনে করি গৌড়ে করিল গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে॥
যাঁহা রহি তাঁহা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখি লোকপূর্ণ॥
... ...
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর॥
ভক্তগণে রাখি আইলাম নিজ নিজ স্থানে।
আমা সঙ্গে আইলো সবে পাঁচ ছয় জনে॥
নির্বিঘ্নে এবে কৈছে যাই বৃন্দাবন।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হইয়া প্রসন্ন॥"

তাঁহার মুখে গৌড়ের বিববণ, রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ, রঘুনাথের বৈরাগ্যভাব ও অন্যান্য ভক্তগণের কুশল সমাচারাদি শুনিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। কেবলমাত্র পুরীর ভক্তগণের সহিতই এ-বৎসর রথযাত্রার আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইল। বর্ষা কাটিবার পরই তিনি আবার উত্তর-পশ্চিমে যাত্রার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সঙ্গে চলিবার জন্য অনেকেই লালায়িত দেখিয়া চৈতন্যদেব সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তীর্থযাত্রায় দল বাঁধিয়া যাওয়া ঠিক নহে। সনাতন আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'একাকী যাইবে, কিম্বা সঙ্গে একজন'। সেইজন্য এবার আমি একলাই যাইব; একাকী থাকিলে ভগবচ্চিন্তাব বিশেষ সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া বহু সঙ্গী লইয়া চলিলে, রাস্তায়—'লোকে দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গ'।"

এইবার গৌড়দেশে না গিয়া, ঝাড়খণ্ড হইয়া যাওয়া সাব্যস্ত হইল। এই রাস্তা লোকালয়হীন, স্থানে স্থানে জঙ্গলাকীর্ণ; সেইজন্য রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদর একজন ব্রাহ্মণকে লইবার জন্য বিশেষ আবেদন করিয়া বলিলেন,—

"উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে মাত্র বহি॥

বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কহো না লইব।
একজনে নিলে আনের মনে দুঃখ হইব॥

. . ..

স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য॥
প্রথমেই তোমাসঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্বতীর্থ করিতে॥
ইহাঁর সঙ্গেতে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষাকৃত্য॥
ইহাঁ সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাহি কোন দুঃখ॥
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।[১]
ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥"

তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, চৈতন্যদেব বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইলেন। বলভদ্রের ভৃত্য ব্রাহ্মণও সঙ্গী হইল। শ্রীশ্রীজগন্নাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া, এক গভীর রাত্রিতে তিনি গোপনে পুরী ত্যাগ করিলেন। লোকে যাহাতে না জানিতে পারে, সেজন্য প্রকাশ্য রাজপথে গেলেন না। সকালবেলা দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতীব অধীর হইলেন এবং খোঁজ-খবর লইবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে, চৈতন্যদেবের মনোভাব জানাইয়া স্বরূপ সকলকে নিরস্ত ও শান্ত করিলেন।

এবার চৈতন্যদেব প্রকাশ্য রাজপথ ছাড়িয়া লোকসঙ্গ ভয়ে গ্রাম্যপথে চলিতে লাগিলেন। কটক ডাহিনে রহিল; তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ঝাড়খন্ড প্রদেশের ভিতর দিয়া চলিলেন। লোকালয়বিহীন, হিংস্র-জন্তু-সমাকুল এই দুর্গম অরণ্যপথ অতিক্রম করা বড়ই কণ্টকর ছিল। পথে চলিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে বন্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইত। সুবিধামত কখনও কখনও ভট্টাচার্য চাউল সংগ্রহ করিয়া এবং বনের শাকপাতা কুড়াইয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন, এবং পথে সুবিধাজনক স্থানে সেই সকল রন্ধন করিয়া সন্ন্যাসি-চূড়ামণিকে ভিক্ষা দিতেন। বন্য শাকসবজি খাইয়া চৈতন্যদেবের খুবই আনন্দ হইত।

---

১ বস্ত্র—বহির্বাস ইত্যাদি; অম্বুভাজন—জলপাত্র (কমণ্ডলু)।

"ভট্টাচার্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥"

লোকালয়শূন্য অরণ্যে 'ধুনি লাগাইয়া' বৃক্ষতলেই বাস করিতে হইত। পার্বত্য অঞ্চলে অনেক স্থলে পথের পাশে পাশেই ঝরনা থাকে, এই সকল ঝরনার জল অমৃততুল্য। নির্ঝরের নির্মল পবিত্র ধারাতে স্নান করিয়া তাঁহাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইত।

"নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কষ্ট অপার॥"

ভাবুক সন্ন্যাসী শারীরিক দুঃখ-কষ্ট কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না; বরং পরমেশ্বরের সৃষ্ট অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যে তাঁহার মনে অতুল হর্ষ ও প্রেমের সঞ্চার হইত এবং আনন্দিত হইয়া, ভট্টাচার্যকে সম্বোধন করিয়া প্রেমের সহিত বলিতেন,—

"কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল।
বনপথে আনি মোরে এত সুখ দিল॥"

ভগবানের নাম কীর্তন করিযা, তাঁহার ধ্যান-চিন্তায় তন্ময় হইয়া, চৈতন্যদেব পরমানন্দে এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

ঐ অঞ্চলে স্থানে স্থানে কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী পাহাড়ীদের বাস। তাহাদের ভাষা, রীতি-নীতি অজ্ঞাত থাকিলেও তিনি তাহাদের সংগে মিলিয়া, আকারে-ইঙ্গিতে, 'ঠারে ঠোরে', ভাব বিনিময় করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রেমব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সেই সকল 'জংগলী মানুষ'ও ভক্ত হইয়া যাইত। তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিয়া আপনার জন করিয়া লইলেন এবং ক্ষেত্র বুঝিয়া স্থানে স্থানে ভগবদ্ভক্তির বীজ ছড়াইতে লাগিলেন। যথাকালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অনুবর্তীদের জলসিঞ্চনে বর্ধিত হইয়া হিন্দুসমাজের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছিল। জংগলাকীর্ণ দেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ক্রমে বিহার প্রদেশের সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইভাবে ভক্তি-প্রেম প্রচার করিতে করিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা হিন্দুর চিরাকাঙ্ক্ষিত মোক্ষক্ষেত্র, সন্ন্যাসীদিগের অতিপ্রিয় তীর্থ কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তরবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিমতটে অর্ধচন্দ্রাকারে সুশোভিতা 'অন্নপূর্ণার রাজধানী', 'বিশ্বনাথের আনন্দকানন', মহাকাল-সুরক্ষিত, বারাণসীক্ষেত্র নয়নগোচর হইবামাত্রই তীর্থযাত্রীর মনে কি অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয়! এই নাস্তিকতার যুগেও কত বিদেশী, বিধর্মী,

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গঙ্গাবক্ষ হইতে এই পুণ্যতীর্থ অবলোকন করে। আর সেই সময়ে এই সুদীর্ঘ দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই বহুবাঞ্ছিত তীর্থকে কি দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কল্পনার অতীত। ভাব-বিহ্বল চৈতন্যদেব পুণ্যক্ষেত্রের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণামান্তর মণিকর্ণিকাতে স্নান করিতে গেলেন। মণিকর্ণিকা ঘাটে তাঁহার পূর্বপরিচিত তপন মিশ্রের[১] সঙ্গে দেখা হইল। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাকে পাইয়া মিশ্রের আনন্দের অবধি রহিল না; স্নানান্তে তাঁহার সঙ্গেই সন্ন্যাসি-চূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন। 'বাবা ভোলানাথের' শিরে গঙ্গাজল বিল্বদল অর্পণ করাতে সন্ন্যাসীর প্রাণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। প্রেমে পুলকিত চৈতন্যদেব, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনান্তে বিন্দুমাধব ও অন্যান্য দেবালয় দর্শন করিলেন; অবশেষে তপন মিশ্রের প্রার্থনায় তাঁহার আবাসে গিয়া ভিক্ষাগ্রহণ ও বিশ্রাম করিলেন।

চন্দ্রশেখর নামক জনৈক বাঙালী বৈদ্যভক্ত তখন কাশীতে থাকিতেন। তপন মিশ্রের সঙ্গে তাঁহার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ভজনশীল ভক্ত চন্দ্রশেখর কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী ও সন্ন্যাসীদিগের মুখে সদাসর্বদা নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়াবাদ এবং প্রেম-ভক্তির বিরোধী আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক শুনিয়া অন্তরে বিশেষ ব্যথা পাইতেন। কাজেই এখন চৈতন্যদেবকে পাইয়া এবং তাঁহার মুখে ভগবদ্-ভক্তির কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখরের হৃদয় শীতল হইল, তাঁহার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের বিশেষ আগ্রহে চৈতন্যদেব মিশ্রের গৃহেই অবস্থান করিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শন, ভজন-কীর্তন ও ধ্যান-ধারণাতে পরম আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মনোহর মূর্তি, সুমধুর উপদেশ ও অদৃষ্টপূর্ব ভাবভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে চাহিত; কিন্তু মিশ্রের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য চৈতন্যদেব অন্য কাহারও গৃহে না গিয়া প্রত্যহ মিশ্রভবনেই ভিক্ষা করিতেন। এইভাবে যথাসাধ্য লোকসঙ্গ এড়াইয়া, একান্তে, আপনার ভাবে দশ রাত্রি কাশীবাস করিয়া তিনি তীর্থরাজ প্রয়াগের দিকে যাত্রা করিলেন।

প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান ও দর্শনাদি করিয়া তাঁহার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। তিন রাত্রি সেখানে থাকিয়া ব্রজদর্শনের জন্য আবার রাস্তায় বাহির হইলেন। দিনের পর দিন চলিয়া এবং নানা তীর্থ ও প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া ক্রমে অগ্রবনে (আগ্রা) আসিলেন। অগ্রবনের নিকট যমুনাতীরে কৈলাস নামক পবিত্র তীর্থ ও মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রম; তথায় ভগবান পরশুরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাদেব বিরাজমান।

---

১ তপন মিশ্র—জগন্নাথ মিশ্রের জ্ঞাতি। শ্রীহট্ট গমনকালে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।

"প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি অগ্রবনে।
আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে॥
তাঁর ভার্যা রেণুকা, রেণুকা নামে গ্রাম।
যথা জন্ম লইলেন শ্রীপরশুরাম॥
রেণুকা হইতে শীঘ্র রাজগ্রাম দিয়া।
এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া॥"

—ভক্তিরত্নাকর

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, প্রেমিক সন্ন্যাসীর অন্তরের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল; অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইয়া প্রিয়দর্শন গৌর দেহকে অধিকতর মাধুর্যময় করিল। গোকুলে বৃক্ষতলে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন শ্রীমতী রাধারানীর জন্মস্থান রাউল (রায়া) গ্রাম দর্শন করতঃ যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া মথুরাতে উপস্থিত হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, সপ্তমোক্ষক্ষেত্রের অন্যতম মথুরা দর্শনে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; কোনও প্রকারে আত্মসংবরণ করিয়া যমুনাতে 'বিশ্রাম ঘাটে' স্নান করিলেন। স্নানান্তে কেশবদেবের মন্দিরে গিয়া দর্শন, স্তুতি-প্রার্থনা করিলেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সেই সুমধুর কীর্তন ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া বহু লোক আবিষ্ট হইল। কেশবদেবের মন্দিরের জনৈক ব্রাহ্মণ কীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া চৈতন্যদেবের নিকট আসিলেন এবং অতিশয় ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিলেন। ব্রাহ্মণের ভাবাবেশ হইল এবং আবিষ্ট হইয়া ক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের প্রেমভক্তি দেখিয়া চৈতন্যদেবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কীর্তনান্তে তিনি তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। পুরীজী যখন ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, সেইসময়ে তাঁহার কৃপালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নিজ গুরুর গুরুভ্রাতা জানিয়া চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, এবং অতিশয় আগ্রহ-সহকারে তাঁহার নিকট পুরীজীর ব্রজদর্শনের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। মাধবেন্দ্রজী মহারাজের অপার করুণার উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমরা সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ[১] বলিয়া, সন্ন্যাসীরা আমাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না; কিন্তু পুরীজী মহারাজ সেই প্রচলিত প্রথা উপেক্ষা করিয়া ভিক্ষাগ্রহণ পূর্বক আমাদের কৃতার্থ করিয়াছিলেন।" ব্রাহ্মণের মুখে এই ঘটনা অবগত হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে, ব্রাহ্মণ অতিশয়

১ সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ—বর্ণ ব্রাহ্মণ।

কাতরভাবে করজোড়ে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনাকে ভিক্ষা প্রদান বহু ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমাদের ঘরে অন্নগ্রহণ করিলে লোকে আপনাকে নিন্দা করিবে, এই কথা ভাবিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে।" তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া,—

"প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম॥
ধর্মস্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী গোঁসাইর আচরণ সেই ধর্ম সার॥"

সেই ব্রাহ্মণের গৃহেই তিনি ভিক্ষা করিলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মথুরার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ—স্বয়ম্ভূ ক্ষেত্র, বিশ্রাম ঘাট, বিষ্ণু ভগবান, মহাবিদ্যাদেবী, ভূতেশ্বর ও গোকর্ণ মহাদেব প্রভৃতি দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন।

"গোকর্ণাখ্য মহাদেব-অম্বিকা দোহোরে।
পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে॥"

—ভক্তিরত্নাকর

চৈতন্যদেব সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গী করিয়া মথুরার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শনান্তে বৃন্দাবনের দিকে চলিলেন এবং পথেও নানা লীলাস্থল দর্শন করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন।

বৃন্দাবনের অপার্থিব শোভা সন্দর্শন করিয়া চিত্তে অতীব হর্ষের সঞ্চার হইল। তাঁহার বোধ হইল বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম, তরুলতা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু সমস্তই ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিয়া মধুবর্ষণ করিতেছে। বিশ্ব-চরাচর তাঁহার নিকট মধুময় বোধ হওয়াতে অন্তরে ভাবাবেশ উপস্থিত হইল; শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মাধুর্যময় বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হওয়ায় বহির্জগতের জ্ঞান লোপ পাইল। ভাবাবেশে দেহ ভূলুণ্ঠিত হইলে, বলভদ্র ভট্টাচার্য ও সঙ্গী মাথুর ব্রাহ্মণ অতি সন্তর্পণে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ রক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নাম শুনাইবার পর ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

"নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হইল শতগুণ॥
সহস্রগুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে॥"

চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া লীলাস্থানসমূহ অতি আগ্রহ-সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থানসকল দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরে ঐ সকল লীলার স্ফূর্তি হওয়ায় বাহ্য জগতের বিস্মৃতি ঘটিল; সেই লীলারস আস্বাদন করিয়া অনুক্ষণ ভাবে বিভোর হইয়া থাকিলেন। দিবা-রাত্র সেই প্রেমসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে দেহের দিকে আর মোটেই দৃষ্টি থাকিল না; নিত্যকার অভ্যাসবশে কোনপ্রকারে তাঁহার স্নান-ভিক্ষাদি হইতে থাকিল। সঙ্গিগণ অতিশয় সাবধান হইয়া প্রাণপণ যত্নে শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে বনসমূহ[১] দেখিয়া রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শনান্তর গোবর্ধনে উপস্থিত হইলেন। গোবর্ধনের পাদদেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া একটি শিলা সাগ্রহে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং প্রেমভাবে বিভোর হইয়া বহু স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর, গোবর্ধন গ্রামে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং হরিদেবকে দর্শন করিয়া ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন। হরিদেবের মন্দিরের আঙ্গিনাতেই সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে মানসগঙ্গায় স্নান ও মহাদেবকে দর্শনের পর গোবর্ধন পরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রদক্ষিণ পথে গোবর্ধনের উপরে অন্নকুট নামক গ্রামে শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীজী প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ[২] দর্শনের জন্য চৈতন্যদেবের মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু পবিত্র গোবর্ধনের উপর আরোহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই; কাজেই কি ভাবে গোপালকে দর্শন করিবেন, এই চিন্তায় পীড়িত হইয়া গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলে শুনিতে পাইলেন, গোপাল নিকটবর্তী গাঠুলী গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে ভীষণ ডাকাতের উপদ্রব ছিল; দিল্লীর মুসলমান বাদশাহের তুর্কী সৈন্যগণ সুযোগ বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে সমৃদ্ধ গ্রামসমূহে গিয়া লুটপাট করিত। এইরূপ দৌরাত্ম্যের ভয়ে অন্নকুট-গ্রাম-বাসীরা সময় সময় গোপালকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিত। এই

---

১ "মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্য আর।
খদির শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এপার॥
শ্রীভদ্র ভাণ্ডীর বিল্ব লোহ মহাবন।
যমুনার ওপার এ মনোজ্ঞ কানন॥"

—ভক্তিরত্নাকর (দ্বাদশবন)

২ এই গোপাল বিগ্রহই বর্তমানে উদয়পুর নাথদ্বারে বিশেষ সমারোহে প্রতিষ্ঠিত।

সময়েও তাহারা এইরূপ আক্রমণের আশঙ্কাতে গোপালসহ গাঠুলী গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিল। লোকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া চৈতন্যদেব গাঠুলী গ্রামে গিয়া গোপালকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া তিন দিন সেখানে থাকিয়া গেলেন। স্থানীয় লোকেরাও এই উপলক্ষে তাঁহার সৌম্যমূর্তি ও ভাবাবেশের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইল।

গোবর্ধন প্রদক্ষিণান্তে কাম্যবন, বর্ষাণা, সঙ্কেতগ্রাম, নন্দগ্রাম প্রভৃতি লীলাস্থলসমূহ দর্শন করিলেন এবং পরে যমুনা পার হইয়া পুনরায় গোকুল-মহাবন দেখিয়া মথুরায় ফিরিলেন। এবারেও তিনি সেই পূজারী ব্রাহ্মণের গৃহেই দিনকয়েক অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিবার জন্য বহু লোক আসিতে লাগিল। দিনে দিনে লোকের ভিড় বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি জনবহুল মথুরা ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যবর্তী নির্জন স্থান,—অক্রুরঘাটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনে গিয়া, বিভিন্ন ঘাটে স্নান ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল, যমুনা পুলিন, বৃন্দাবনের অধীশ্বর গোপেশ্বর মহাদেব, কাত্যায়নী পীঠ ইত্যাদি দর্শন করিতেন এবং সেখানে কীর্তনানন্দে বিহ্বল হইতেন। লোকমুখে সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় দিনে দিনে অক্রুরঘাটেও দর্শনার্থীর ভিড় বাড়িতে আরম্ভ করিল। সমাগত সকল লোককেই তিনি সর্বদা অতিশয় প্রেমের সহিত গ্রহণ করিতেন এবং অতি প্রাণস্পর্শী সরল উপদেশে সকলের সংশয় দূর করিয়া, ভগবান লাভের সহজতম পথ ভক্তিমার্গ দেখাইয়া দিতেন। এখানে কৃষ্ণদাস[১] নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজপুতবীর তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সর্বদা সঙ্গে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে থাকেন।

সেই সময়ে বৃন্দাবনে এক গুজব রটিল,—কালীদহে শ্রীকৃষ্ণ আবার প্রকট হইয়াছেন; তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে কালীয় নাগের শিরে দাঁড়াইয়া নাচেন এবং নাগের মাথার মণির প্রভায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রকাশিত হয়। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু লোক প্রতিরাত্রে কালীয়দহের কিনারে দাঁড়াইয়া 'শ্রীকৃষ্ণ' দর্শন করিতে লাগিল। গুজব শুনিয়া চৈতন্যদেব হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গী সরল বিশ্বাসী বলভদ্র কৃষ্ণদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইলেন এবং বারংবার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্যের উৎকণ্ঠাতে বিরক্ত হইয়া,—

---

১ এই কৃষ্ণদাসই পরবর্তীকালে সংসারাশ্রম ছাড়িয়া ত্যাগের পথ অবলম্বন করেন এবং গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও সিন্ধুপ্রদেশে চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিমার্গের প্রবর্তন করেন বলিয়া ভক্তমাল গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

"তবে প্রভু কহে তারে চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলে পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হও ঘরে রহ ত বসিয়া।
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালিরাত্রে যাইয়া॥"

পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাদের নিকট কালীয়দহের ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন,

"লোকে কহে রাত্রে কৈবর্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীদহে মৎস্য মারে দেউটী জ্বালিয়া॥
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালীয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্তন॥
নৌকাতে কালীয় জ্ঞান দীপে রত্ন জ্ঞানে।
জালিয়াকে মূর্খলোক কৃষ্ণ করি মানে॥"

ব্যাপার শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন, বলভদ্রের মনও শান্ত হইল।

যমুনাতে স্নান, ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষা, লীলাস্থানসমূহ দর্শন ও ভজন-কীর্তনে আনন্দ করিয়া চৈতন্যদেব কিছুকাল অক্রূরঘাটে বাস করিবার পর, বলভদ্র ভট্টাচার্য আগামী মকর-সংক্রান্তিতে প্রয়াগে, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, "সময় অল্প, তাড়াতাড়ি না গেলে সেখানে ঠিকসময়ে পৌঁছানো যাইবে না।" বলভদ্রের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল হইতে শীঘ্রই বিদায় লইলেন এবং তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য প্রকাশ্য রাজপথে না গিয়া, ফাঁড়িপথে যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। সেই বৎসর প্রয়াগে কুম্ভমেলা ছিল কিনা কোথাও উল্লেখ নাই। বহু প্রাচীন কাল হইতেই সর্ব সম্প্রদায়ের গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসিগণের মতে, প্রয়াগে কুম্ভস্নান অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাই মনে হয় সেই বৎসর কুম্ভস্নানের জন্যই হয়ত তাঁহারা এত তাড়াতাড়ি প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। সেই সময়েও যে কুম্ভমেলা প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তাহার পূর্বেও চৈনিক পরিব্রাজক প্রয়াগে মেলা দেখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মকরসংক্রান্তিতে স্নান ও মাঘে প্রয়াগে কল্পবাস করিবার প্রথাও অতি প্রাচীন।

চৈতন্যদেব ব্রজেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আবার যাত্রা শুরু করিলেন; এবং মথুরা, মহাবন হইয়া প্রত্যাবর্তনের পথ ধরিলেন। রাজপুত ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং মথুরার ব্রাহ্মণ উভয়েই সঙ্গে চলিলেন—গঙ্গাতীর পর্যন্ত ফাঁড়ি-

পথে পেঁছাইয়া দিবার জন্য। চলিতে চলিতে পথে এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলার উদ্দীপন হওয়ায় চৈতন্যদেবের ভাবাবেশ হইল এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি ধরাশায়ী হইলেন। সেই সময়ে ঐ স্থান দিয়া দশজন অশ্বারোহী পাঠানসৈন্য যাইতেছিল। তাহারা পরম সুন্দর যুবক সন্ন্যাসীকে এইভাবে অচেতন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত দেখিয়া, কৌতূহলবশতঃ নিকটে আসিল। তাহাদের দলপতি কিছুক্ষণ দেখিয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিশ্চয়ই ধন-সম্পত্তি ছিল, আর সেইজন্যই ইহারা তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে এবং সমস্ত অপহরণ করিবার মতলব করিয়াছে। ইহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।" অধ্যক্ষের আদেশ পাইয়া সৈন্যগণ চৈতন্যদেবের সঙ্গীদিগকে বন্ধন করিল এবং অপরাধ কবুল করাইবার জন্য তলোয়ার খুলিয়া শিরশ্ছেদনের ভয় দেখাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাঁহার ভৃত্য ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া 'থরথর' কাঁপিতে লাগিলেন। মথুরার ব্রাহ্মণেরও খুব ভয় হইল। কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত ক্ষত্রিয়—অতিশয় সাহসী, তিনি নির্ভীকভাবে বাদশাহের দোহাই দিয়া বলিলেন, "আমরা নিরপরাধ, তোমরা অকারণে আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছ। সন্ন্যাসী আমাদের গুরু। আমরা ইঁহার আশ্রিত শিষ্য, সেবা করিবার জন্য সঙ্গে চলিয়াছি। ইঁহার মৃগীরোগ আছে, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়; কিছুক্ষণ পরেই আরাম হইবে। আমাদের বন্ধন খুলিয়া দাও, একটু সেবাযত্ন করিলে মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সুস্থ হইবেন। তোমরা একটু অপেক্ষা করিয়া দেখ।" পাঠান সেনাপতি হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা দুজন পশ্চিমা ডাকাত, আর এই বাঙালীরা ঠগ-বাটপাড়। তোমাদের কথায় বিশ্বাস নাই।" কৃষ্ণদাস উত্তর করিলেন, "তবে আমাদিগকে শিকদারের (স্থানীয় শাসনকর্তার) নিকট লইয়া চল, সেখানে আমার পরিচিত আছে, তাহাদের নিকট আমার সম্বন্ধে জানিবে।" সেনাপতি তাহাতেও সম্মত হইলেন না, বন্ধনও মুক্ত করিলেন না। সকলে ভয়ে কাঁপিতেছে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে,—

"কৃষ্ণদাস কহে, আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরকী আছে দুইশত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে সব তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুণ্ঠ আর চাহ মারিবার॥"

কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাইয়া সৈন্যমণ্ডলীর ভয় জন্মিল; তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। সঙ্গীরা মুক্ত হইয়া চৈতন্যদেবের কর্ণে কৃষ্ণনাম

শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নে একটু পরেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলে পাঠান সেনাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া তাঁহাব দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে কিনা। চৈতন্যদেব তদুত্তরে বিনীত-ভাবে জানাইলেন যে তিনি নিঃসম্বল সন্ন্যাসী, তাঁহার ধনকড়ি কিছুই নাই, মাঝে মাঝে মূর্ছারোগে অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন বাহ্যজ্ঞান কিছুই থাকে না; এই সঙ্গীরা দয়াপরবশ হইয়া যত্ন-শুশ্রূষা দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতেছেন,—ইঁহাবা তাঁহার পরম মিত্র।

চৈতন্যদেবের মধুর বাক্যে সৈনিকগণের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার হইল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে ধর্মালোচনা-তত্ত্বকথা আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্রানুযায়ী জগৎকারণ পরমেশ্বরকে নিরাকার অদ্বয়তত্ত্বরূপে প্রতিপাদন করিয়া সাকার উপাসনাব বিরোধী যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে চৈতন্যদেব সেই একদেশী যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুই সবিশেষ সাকাররূপে ভক্তগণের উপাস্য। ভববন্ধন খণ্ডনের এবং পবমানন্দ লাভের জন্য ভক্তিমার্গ ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের সাবগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মুসলমান পণ্ডিতেব মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি তাঁহাব সিদ্ধান্তবাক্যসমূহ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। সকলের শাস্ত্রই সেই এক পরমতত্ত্বের কথা বলিয়াছে, কিন্তু লোকে যথার্থ মর্ম বুঝিতে পারে না বলিয়াই পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে। আপনার কৃপায় আমার সংশয় দূর হইল।"

চৈতন্যদেব তাঁহাকে আরও বুঝাইয়া দিলেন, "দুর্বল জীবের ভগবদুপাসনা ভিন্ন গতি নাই এবং প্রেমভাবে উপাসনা করিলেই সহজে তাঁহাব কৃপালাভ হয়।" প্রেম-ভক্তির ভজন-প্রণালী শুনিবার জন্য তখন সেই মুসলমান পণ্ডিতের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। উপযুক্ত অধিকারী বুঝিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে সংক্ষেপে সহজ সরল ভাবে উচ্চমার্গের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও ভজনপ্রণালী উপদেশ দিলেন। সেই যুক্তিযুক্ত উপদেশে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় সংশয় দূর হইল, তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় এই পাঠান ভক্তটির হৃদয় দ্রব হইল। স্নেহভরে চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'রামদাস' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

এই দলের মধ্যে বিজুলী খাঁ নামে এক রাজবংশীয় যুবক ছিলেন। চৈতন্যদেবের তত্ত্বোপদেশ তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল; তিনি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সাধন-ভজন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ গ্রহণ করিলেন। পরবর্তীকালে সেই

যুবক পরম ভক্তরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং বহু লোকহিতকর সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

"সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব॥"

ব্রজমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া সোজা ফাঁড়িপথে গঙ্গার কিনারে পেঁছিয়া চৈতন্যদেব ভক্ত রাজপুত ও মাথুর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিতে চাহিলে, তাঁহারা প্রয়াগ পর্যন্ত সঙ্গী হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—

"প্রয়াগ পর্যন্ত দোঁহা তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥
ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥"

বাস্তবিকই সেই সময়ে, ঐ সকল অঞ্চলে বাঙালীর চলাফেরা বড়ই কঠিন ছিল। এই জন্যই দেখা যায়, পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব তাঁহার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দকে মথুরা যাত্রাকালে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধানে যাবে ক্ষত্রী আদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে॥"

ব্রজমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া সোজা ফাঁড়িপথে গঙ্গাতীরে আসিয়া সোরোক্ষেত্র[১] দর্শন করিয়া খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোরোক্ষেত্রে ভগবান বরাহদেবের জন্মস্থান, সেখানে দশনামী সন্ন্যাসিগণের এক অতি প্রাচীন মঠ আছে; বরাহদেবের, গঙ্গাদেবীর ও মহাদেবেরও সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। সন্ন্যাসীরাই মন্দিরের সেবক। প্রতি বৎসর বিরাট মেলা হয়।

প্রতি মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে, সারা ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের বহু ত্যাগি-মহাত্মা ও গৃহস্থ স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া কল্পবাস ও স্নানদান করেন। এই প্রাচীন প্রথা কত কাল হইতে চলিয়া

---

১ সোরোক্ষেত্র—বর্তমানে শোরক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এটোয়া জেলায় বেরিলী–কাসগঞ্জ রেললাইনে শোর ষ্টেশন আছে। বরাহদেবের জন্মস্থান বলিয়াই সম্ভবতঃ শোরক্ষেত্র বা সোরক্ষেত্র (বরাহ—শূকর, শোর) নাম হইয়া থাকিবে। এখানে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের একটি মন্দির সংস্থাপিত দেখা যায়।

আসিতেছে, অনুমান করা সহজ নহে। চৈতন্যদেব উপস্থিত হইয়া সেই বিরাট ভক্তমেলা দেখিয়া মোহিত হইলেন, এবং সেই মহান্ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উল্লসিত হৃদয়ে সঙ্গিগণসহ ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিলেন। সেখানে তাঁহার পূর্বপরিচিত এক দাক্ষিণী ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইল। ব্রাহ্মণ অতিশয় আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে স্বীয় বাসস্থানে লইয়া গিয়া, খুব শ্রদ্ধা-সহকারে ভিক্ষা করাইলেন।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে আপাততঃ এই মেলায় রাখিয়া, এই অবসরে আমরা তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহার প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের প্রধান আচার্যদ্বয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সন্ধানে বঙ্গ-রাজধানী গৌড়ে গমন করিব। চৈতন্যদেবকে দর্শন করার পর হইতে রূপ-সনাতনের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে 'তদ্‌গত' হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের পক্ষে তখন বিষয়কর্ম পরিচালন কিংবা রাজকার্য সম্পাদন কঠিন হইয়া পড়িল। সংসারে তাঁহাদের আর মন নাই; অন্তরের বৈরাগ্য দিনে দিনে প্রবল হইতে লাগিল। দুই ভাই রাজসেবা পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল চৈতন্যদেবের সেবা ও ভগবদ্‌ভজনে কাটাইবার সংকল্প স্থির করিলেন। কিন্তু হঠাৎ এইভাবে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পরিত্যাগ করা খুবই শক্ত; বিশেষতঃ নবাবের মনে সন্দেহ জন্মিলে মহাবিপদে পড়িতে হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় না পাইয়া তাঁহারা দুইজনে সংকটনাশের জন্য যোগ্য ব্রাহ্মণকে বহু ধন দিয়া পুরশ্চরণ আরম্ভ করাইলেন। তাঁহারা অতুল বিভবের অধিকারী, ধনজন কিছুরই অভাব নাই; যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে শ্রীরূপ নবাবের নিকট ছুটি চাহিলেন; ঈশ্বরেচ্ছায় ছুটি মঞ্জুর হইল। তিনি বহু ধনসহ বাড়ীতে আসিলেন এবং উহার অর্ধেকাংশ ব্রাহ্মণ-সাধু-ভক্তদিগের সেবার্থ দান করিয়া, এক-চতুর্থাংশ আত্মীয়স্বজনদিগকে বাঁটিয়া দিলেন; অপর চতুর্থাংশ নিজ প্রয়োজনে সঞ্চিত রহিল। তাহা ছাড়া গৌড় নগরে জনৈক বিশ্বস্ত বণিকের নিকট তিনি সনাতনের জন্য দশ হাজার মুদ্রা গচ্ছিত রাখিলেন। চৈতন্যদেবের খবর লইবার জন্য ইতিপূর্বেই রূপ নীলাচলে দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা এই সময়ে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, যে তিনি গোপনে উত্তর-পশ্চিমে তীর্থযাত্রায় গিয়াছেন। তাঁহার তীর্থগমনের খবর শুনিয়া রূপের মন অতিশয় উতলা হইল। তিনিও স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমের সহিত উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কাশী দর্শনান্তে প্রয়াগে গিয়া জানিতে পারিলেন, চৈতন্যদেব ব্রজভূমি দর্শন করিয়া ত্রিবেণীতে মকরস্নানের জন্য প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। উভয় ভ্রাতা আর অগ্রসর হইলেন না,—শীঘ্রই তাঁহার দর্শনের আশায় প্রয়াগে সাধুসঙ্গে অবস্থান করতঃ তৃষিত চাতকের ন্যায়

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রূপ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বেই সনাতনকে গোপন পত্রদ্বারা চৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রার সংবাদ ও তাঁহাদের দুই ভাইয়ের উত্তর-পশ্চিম গমনের খবর জানাইয়াছিলেন। সনাতনকে গৌড়নগরের বণিকের ঠিকানা দিয়া এবং তাহার নিকট গচ্ছিত দশ হাজার মুদ্রা হইতে প্রয়োজনমত খরচ করিবার কথাও রূপ পত্রদ্বারা সনাতনকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহারা যাহাতে মিলিত হইতে পারেন একথাও পত্রে লেখা হইয়াছিল।

চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভের আশায় রাজকার্য হইতে অবসর লইবার জন্য সনাতনের অন্তরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলেও তিনি মুক্ত হইবার কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁহার কাজ অতীব দায়িত্বপূর্ণ, নবাবের অতি প্রিয় বিশ্বস্ত অমাত্য তিনি, তাঁহাকে ছাড়া হুসেনশাহের মোটেই চলে না। সনাতন ভাবিয়া দেখিলেন, নবাব তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে সহজে ছাড়িবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে কোনপ্রকারে তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইতে পারিলে তখন অবশ্যই তাড়াইতে হইবে। নানা ভাবনাচিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি রাজদরবারে যাওয়া, নবাবের সঙ্গে দেখা করা ও কাজকর্ম সব বন্ধ করিলেন। এদিকে নবাব তাঁহাকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া খবর লইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সনাতন বলিলেন, "অসুস্থ আছি।" খবর শুনিয়া নবাবের মন উদ্বিগ্ন হইল, তিনি সনাতনের চিকিৎসার জন্য রাজবৈদ্যকে নিযুক্ত করিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন এবং ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, "সনাতনের স্বাস্থ্য ভালই আছে, তাঁহার দেহে কোন ব্যাধি নাই।" চিকিৎসকের মুখে সনাতন সুস্থ শরীরে গৃহে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া, নবাবের মনে অতীব বিস্ময় জন্মিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া আরও জানিতে পারিলেন, সনাতন সুস্থ শরীরে ঘরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা, তত্ত্বকথা ও ভগবদ্‌ভজনে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ-কর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা যাওয়ায় নবাবের খুব অসুবিধা হইতেছিল। তিনি তাঁহার অসুখের জন্য বিষম ভাবনায় পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ততোধিক চিন্তিত হইলেন এবং স্বয়ং অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছায় গোপনে জনৈক অনুচরকে সঙ্গে লইয়া সনাতনের গৃহে গমন করিলেন। পণ্ডিতগণসহ সভাতে বসিয়া সনাতন শাস্ত্র বিচার করিতেছেন এমন সময়ে নবাব আসিয়া উপস্থিত। সকলেই শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সসম্ভ্রমে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। সনাতন অতিশয় সম্মানসহকারে নবাবকে অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। সনাতনের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া,--

"রাজা কহে তোমাস্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥

আমার যা কিছু কার্য সব তোমা লইয়া।
কার্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদে আছে কহ মোর পাশ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥
তবে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহে আর বার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্বকার্যনাশ॥"

সনাতন করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আপনি দেশের অধিপতি, অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করুন।" গৌড়েশ্বরের মনে ভীষণ সন্দেহের উদ্রেক হইল; সনাতন পাছে অন্যত্র পলায়ন করেন, সেইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন পরেই উড়িষ্যা-সীমান্তে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় নবাবের স্বয়ং সেখানে যাইবার প্রয়োজন হইল। পুরাতন বিশ্বস্ত মন্ত্রী সনাতনকে সঙ্গে চলিবার জন্য নবাব বিশেষ অনুরোধ করিলেও, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নবাবকে বিনীত ভাবে জানাইলেন,--

"তথায় যাইবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গেতে যাইতে॥"

নবাবের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। যাত্রা করিবার পূর্বে সনাতনকে বিশেষ কড়া পাহারায় আটক রাখিয়া গেলেন। সনাতনের বন্দীদশার কথা শুনিয়া সকলেই অতীব দুঃখিত হইল, তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এ-সংবাদ শ্রীরূপেরও অবিদিত রহিল না।

এদিকে শ্রীরূপ ও অনুপম চৈতন্যদেবের প্রতীক্ষায় প্রযাগে আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহার শুভাগমনবার্তা পাইলেন। খবর পাইয়াই দুই ভাই তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া চৈতন্যদেবের অন্তরেও বিশেষ হর্ষের সঞ্চার হইল। কুশল সমাচার বিনিময়ের পর রূপ অতিশয় কাতরভাবে স্বীয় অগ্রজের বন্দীদশার উল্লেখ করিয়া সকল ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "ভগবান তাঁহার ভক্তকে বেশীদিন দুঃখে রাখেন না, সনাতন শীঘ্রই মুক্ত হইবেন।"

"প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন॥"

ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকটেই চৈতন্যদেবের আসন স্থির হইল।

"ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসা ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥"

আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি, রূপ-সনাতন মুসলমান নবাবের সংসর্গহেতুই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, আপনাদিগকে পতিত ভাবিয়া সংকুচিত থাকিতেন এবং চৈতন্যদেবের সমীপস্থ হইতে বা শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে চাহিতেন না। এমনকি তিনি জোর করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেও অতিশয় কাতরভাবে বিনয়-নম্র বাক্যে নিষেধ করিতেন। তিনি কিন্তু তাঁহাদের বাক্য গ্রাহ্য করিতেন না, পরম পবিত্র জ্ঞানে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া পুলকিত হইতেন। তিনি তাঁহাদের এই লজ্জা-সংকোচ ভাঙ্গিবার জন্য, যতই তাঁহাদিগকে নিকটে টানিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ততই আপনাদিগকে অধিক অপরাধী বলিয়া মনে করেন। পরিশেষে চৈতন্যদেব শাস্ত্রপ্রমাণ সহায়ে তাঁহাদের মনের সংশয় দূর করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, "ভগবদ্‌ভক্তিই সর্বাপেক্ষা পবিত্রকর বস্তু, ভক্তিপ্রভাবে নীচও উচ্চ-পবিত্র হয় এবং ভক্তিহীন ব্যক্তি উচ্চ-কুলে জন্মিলেও মহা অপবিত্র।" চৈতন্যদেবের ও অন্যান্য পণ্ডিত সাধু-মহাত্মা-গণের মুখে ভগবদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য ও পবিত্রকর প্রভাবের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের অন্তরের সংকোচন কাটিয়া গেল। তাঁহারা সকলের সঙ্গে মিশিয়া, সেই পুণ্য ক্ষেত্রে ভগবদ্‌ভজনে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব শ্রীরূপকে অতি উচ্চ অধিকারী বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উপর বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠ তত্ত্বসমূহ, যাহা তিনি নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন ও রামানন্দ রায় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত রহস্য ও সাধ্য-সাধন শিক্ষা দিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধনভজনে অগ্রসর হইয়া শ্রীরূপ দিনে দিনে ভগবানের বিশেষ কৃপা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

প্রয়াগের মেলায় ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মারাই সমবেত হন। চারি মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের[১] অন্যতম বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত সুপ্রসিদ্ধ আচার্য শ্রীমৎ বল্লভ ভট্টও সেই বৎসর মেলা উপলক্ষে আসিয়া প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন। লোকমুখে তিনি অসাধারণ প্রভাবশালী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর নাম ও তাঁহার অলৌকিক ভাবভক্তির কথা শুনিয়া

১ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়—রামানুজী, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মাধ্ব।

একদিন দেখা করিতে আসিলেন। উভয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীর মুখে সহজ সরল ভাষায় উচ্চ তত্ত্বকথা শুনিয়া ও তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব ভাবভক্তি দেখিয়া ভট্টের মন মোহিত হইল। তিনি বহুক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিয়া সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। চৈতন্যদেবের সহচর শ্রীরূপ ও অনুপমের দীনতা এবং তাঁহাদের ভক্তি-ভাবপূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখিয়া ভট্টের মনে কৌতূহল জন্মিল। তিনি তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্যদেব দুই ভাই-এর পূর্ব পরিচয় দিয়া তাঁহাদের অপূর্ব ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ভক্তি-বিশ্বাসের কথা শুনাইলে ভট্টের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পরিচয়ের পর দুই ভাই স্বাভাবিক দীনতাবশতঃ দূর হইতেই ভট্টকে অতিশয় শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম করিলে, ভট্ট তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুই ভাই সসঙ্কোচে আরও পশ্চাতে হটিয়া গিয়া করজোড়ে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "অস্পৃশ্য পামর মুই না ছুঁইহ মোরে।"

বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় খুব আচার-বিচারী ও সম্প্রদায়ের গোস্বামীরা নিজেদের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকেন। এজন্য চৈতন্যদেবও ভট্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,--

"ইহাঁ না স্পর্শিহ, ইহোঁ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥"

তথাপি ভট্ট অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন এবং চৈতন্যদেবের মুখের দিকে চাহিয়া ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।[১]

আলাপ-পরিচয়ে সন্ন্যাসীর প্রতি বল্লভাচার্যের খুব অনুরাগ জন্মিল, তাঁহাকে সঙ্গীদের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন স্বীয় বাসস্থলে যমুনার অপর পারে লইয়া গেলেন। নূতন স্থানে আসিয়া চৈতন্যদেবের মনেও খুব হর্ষের সঞ্চার হইল। তিনি উৎফুল্ল অন্তঃকরণে যমুনায় অবগাহন করিয়া উঠিলে ভট্ট তাঁহাকে নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ নারায়ণজ্ঞানে যথাবিধি মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া এবং ধূপ-দীপাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। অলৌকিক সন্ন্যাসীর আগমন-

১ "অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"
—ভাগবত, ৩।৩৩।৭

—হে ভগবন্! অহো যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও পূজনীয়। যাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, যজ্ঞ করেন, তীর্থস্নান করেন, বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত আর্য।

বার্তা অতি দ্রুত প্রচারিত হওয়ায় চতুর্দিক হইতে দর্শনার্থীর আগমনে ক্রমে সেখানে ভিড় জমিয়া উঠিল।

রঘুপতি উপাধ্যায় নামক জনৈক ত্রিহুত (মিথিলা)-বাসী শাস্ত্রজ্ঞ কবি ও কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ নিকটে বাস করিতেছিলেন। তিনিও সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে আসিলেন। পণ্ডিতব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিধি ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী সন্ন্যাসীকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী প্রচলিত প্রথা পালন করিলেন না। কবিবরকে শ্রীকৃষ্ণভক্ত বুঝিয়া তিনি 'নমো নারায়ণায়' উচ্চারণ না করিয়া 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া আশীর্বাদ বর্ষণ করাতে ভক্তকবির অতিশয় আনন্দ জন্মিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে ভগবৎ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইল। সন্ন্যাসীর মুখে সহজ সরল ভাষায় ভক্তি ও ভগবৎ-তত্ত্বের অতি নিগূঢ় রহস্য সকল অবগত হইয়া পণ্ডিতের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। চৈতন্যদেবও ব্রাহ্মণের কবিত্বের খ্যাতি ও শ্রীকৃষ্ণভক্তির কথা জানিয়া, তাঁহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য বার বার আগ্রহ প্রকাশ করিলে রঘুপতি উপাধ্যায় দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। সুমধুর শ্লোকের কবিত্বরসে ও ভক্তিভাবে চৈতন্যদেবের অন্তরে প্রেমাবেশ হইল; তিনি বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গেলেন। ভাবাবস্থায় তাঁহার দেহের উজ্জ্বল কান্তি ও অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। উপাধ্যায় স্তম্ভিত হৃদয়ে, পুনঃ-পুনঃ প্রণাম ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন, বল্লভ ভট্ট এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ও বিস্মিতভাবে এই অলৌকিক মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিভরে চরণে প্রণত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাব উপশম হইলে চৈতন্যদেব উপাধ্যায়কে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন, ব্রাহ্মণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে সমাগত জনমণ্ডলী সন্ন্যাসীর দর্শন ও কৃপালাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বল্লভাচার্য অতিশয় চিন্তিত হইলেন, পাছে চৈতন্যদেবের কোন কষ্ট ও অসুবিধা হয়। তিনি সকলকে বাধা দিয়া বলিলেন, "এখানে নিমন্ত্রণ করা চলিবে না; যদি নিতান্ত আগ্রহ থাকে, প্রয়াগে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। এখানে ইঁহার থাকা সম্ভব নহে, আমি এখনই প্রয়াগে রাখিয়া আসিব।" চৈতন্যদেব মধুর-বাক্যে সকলকে তুষ্ট করিলেন, এবং সদ্ভাবে জীবনযাপন, ভগবানের চিন্তা ও নামকীর্তন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। ভট্ট লোকের ভিড় ঠেলিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে নৌকায় উঠাইলেন, এবং প্রয়াগে বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রয়াগেও দিনে দিনে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসুকে তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না, একেবারে

রিক্তভাবে কাহাকেও ফিরাইয়া দিতেন না। ভগবানের মহিমা কীর্তন করিয়া, ভগবৎ-তত্ত্ব শুনাইয়া ও ভগবানেব নামগুণ কীর্তনের সহজ সুখকর প্রণালী উপদেশ দিয়া তিনি লোককে ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার,—ভব-কারাগার হইতে মুক্ত হইবার সুগম পথ দেখাইয়া দিতেন। ক্রমশঃ ভক্তসংখ্যা আরও বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি ঐ স্থান ছাড়িয়া দশাশ্বমেধঘাটে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁহার সঙ্গে আসিলেন এবং নির্জন স্থান খুব অনুকূল হওযায তিনি তাঁহাদিগকে,—বিশেষভাবে শ্রীরূপকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার কৃপাতে শ্রীরূপের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক স্ফুরণ হইল।

"লোকভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধ যাইয়া।
রূপ গোসাঁইকে শিক্ষা করায় শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ রায় পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥"

মাঘে প্রয়াগে বাস করিয়া চৈতন্যদেব বারাণসীর দিকে যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁহাব সঙ্গে চলিবার অনুমতি চাহিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে গিযা কিছুকাল একান্তে বাস ও ভগবদ্‌ভজন করিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং পরে পুরীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে বলিয়া গেলেন।

এদিকে তিনি কাশী পেঁাছিবার পূর্বরাত্রে তাঁহার বিশেষ অনুগত কাশী-বাসী ভক্ত চন্দ্রশেখর তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া পরদিন ভোরবেলাই তাঁহার দর্শন আশায় প্রয়াগের পথে ধাবিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরকে বহুদূর যাইতে হইল না, অল্প রাস্তা অতিক্রম করিবাব পরেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রেমে পুলকিত হইয়া ভক্ত তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। চন্দ্রশেখরকে পাইয়া চৈতন্যদেবেরও আনন্দের সীমা রহিল না। চন্দ্রশেখরের আগ্রহাতি-শয্যে তাঁহার গৃহেই সন্ন্যাসীব আসন হইল এবং পূর্বের ন্যায় তপন মিশ্রের প্রার্থনায় মিশ্র-গৃহেই ভিক্ষা নির্বাহ হইতে লাগিল। বিশ্বনাথের আনন্দকাননে আসিয়া চিত্ত আবার আনন্দে ভরপুর হইল। তিনি নিত্য মণিকর্ণিকায় স্নান, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর-বিন্দুমাধব ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এবার বেশীদিন কাশীতে

থাকিবেন না. কিন্তু কাশীপুরাধিশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণার নগরপাল মহাকাল ভৈরব[১] তাঁহাকে তাড়াতাড়ি যাইতে দিলেন না।

সনাতনকে কারাগারে অতি কঠোর পাহারায় রাখিয়া হুসেনশাহ উড়িষ্যা সীমান্তে যুদ্ধযাত্রা করিবার পর শ্রীরূপের পত্র বন্দীর হস্তগত হইল। পত্র পড়িয়া সনাতন আরও উতলা হইলেন এবং চৈতন্যদেবকে দর্শন ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে মিলনের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।

"এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে।
শ্রীরূপ গোসাঁইর পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাইয়া সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষকপাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাপুণ্যবান।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
এবে তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার॥
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজভয়॥
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণে গিয়াছে যদি লেউটি আইসয়॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহো বহি গেল॥
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হইয়া আমি মক্কায় যাইব॥"

এইভাবে অনেক বলা-কহার পরে কারাপ্রহরীর মন নরম হইল এবং সাত হাজার মুদ্রা দানের অঙ্গীকার করাইয়া একদিন গভীর রাত্রে সনাতনের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার করিয়া দিল। মুক্তি পাইয়া সনাতন পূর্বের

১ কাশীবাস মহাকাল ভৈরবের ইচ্ছাধীন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে বণিকের নিকট গচ্ছিত ধন হইতে সেই সাত হাজার মুদ্রা দিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং ঈশান নামক জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ অতিদ্রুত পশ্চিম দিকে ছুটিলেন।

প্রকাশ্য পথে পলাতক বন্দীর চলিবার উপায় নাই ; তাই পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর দিয়া অনবরত চলিয়া, বহু কষ্টে দুইদিন পরে রাজমহলের পার্বত্য প্রদেশে এক ঘাঁটির নিকট উপস্থিত হইলেন। এক ভুঁইয়া সেখানকার পাহারাদার। রাজবন্দী সনাতন সেখানে উপস্থিত হইয়া, গোপনে বনপথ পার করিয়া দিবার জন্য তাহাকে কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিলেন। ভুঁইয়া অতি সহজেই সম্মত হইল এবং দিনের বেলা স্নানাহার ও বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, রাত্রে সে নিজের লোক সঙ্গে দিয়া বনের রাস্তা গোপনে পার করিয়া দিবে, কেহ কিছু জানিতে পারিবে না। ভুঁইয়ার আদরযত্নে তাঁহাব বাড়ীতেই তাঁহাবা অবস্থান করিলেন। অনাহার-অনিদ্রার পর ভালরূপ স্নানাহার বিশ্রাম করিতে পাইয়া শরীরের অবসাদ-গ্লানি অনেক কাটিয়া গেল। আহারান্তে বিশ্রাম করিতে করিতে রাজমন্ত্রী সনাতনের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল, "এই ভুঁইয়া আমাদিগকে এত আদরযত্ন করিতেছে কেন? রাজবন্দী অপরাধী আমি, গোপনে পলাইতেছি; এরূপস্থলে পাহাবাদারের আদরযত্ন করিবার কারণ কি?" "ভাবিয়া চিন্তিয়া সনাতন সঙ্গী ঈশানকে ডাকিলেন এবং তাহার নিকট কিছু ধন-সম্পত্তি আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। ঈশান বিনীতভাবে বলিলেন, "আপদে-বিপদে পথের সম্বল হিসাবে সাতটি মোহর সঙ্গে লইয়াছি।"

"শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভুঁঞা কাছে দিয়া কহ মধুর করিয়া॥
এই সাত মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্বত আমা দেহ পার করি॥"

সনাতনের কথা শুনিয়া ভুঁইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার সঙ্গীর নিকট আটটি মোহব আছে। গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া আমি তোমাদিগকে আদরযত্ন করিয়া স্থান দিয়াছি। উদ্দেশ্য ছিল, রাত্রে তোমাদিগকে হত্যা করিয়া মোহর লইব। আমি এই ভাবেই হত্যা করিয়া লোকের ধন অপহরণ করি; কিন্তু তুমি যখন নিজেই দিতে চাহিতেছ, তখন আর তোমার ধন লইব না।

তোমাদের মোহর তোমরাই সঙ্গে লইয়া যাও, রাত্রে আমার লোকজন সঙ্গে দিয়া বনের রাস্তায় নিরাপদে পার করিয়া দিব, কোন ভয় নাই নিশ্চিন্ত থাক।" সনাতন কিছুতেই মোহর ফিরাইয়া লইলেন না,—

"গোসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥"

সনাতনের অনুরোধে, অনুনয়ে-বিনয়ে, ভুঁইয়া অবশেষে মোহর সাতটি গ্রহণ করিল এবং সঙ্গে লোক দিয়া গভীর রাত্রে, জঙ্গলের ভিতরের রাস্তায় সীমান্তদেশ পার করিয়া দিল।

পরদিন সকালবেলা সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কিছু সঙ্গে আছে কিনা। ঈশান বিনীতভাবে স্বীকার করিলেন, শেষ সম্বল একটিমাত্র মোহর এখনও তাঁহার নিকট রহিয়াছে। সনাতন তাঁহাকে সেই মোহরটি লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অনুগত ভৃত্য কাঁদিতে লাগিল। সনাতন তাহাকে মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া বিদায় দিলেন, এবং নিঃসম্বল কাঙ্গালবেশে ভগবানের নাম লইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পথ ধরিলেন।

"তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া ছেড়া কন্থা নির্ভয় হইলা॥"

গৌড়েশ্বরের প্রিয় সচিব, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি সনাতন আজ পথের ভিক্ষুক—ভগবানের কৃপালাভের আশায়। অকিঞ্চন সনাতন ভগবানের নাম জপিয়া সারাদিন পথ চলিতে চলিতে সন্ধ্যাবেলা হাজিপুরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে এক সুবৃহৎ উদ্যানের পাশে বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে থাকিলেন।

হাজিপুরের সন্নিকটে গঙ্গার অপর পারেই সুবিখ্যাত হরিহর ছত্রের মেলা বসে। বাৎসরিক এই মেলা বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। হরিহর ছত্রের মেলাতে বিক্রয়ের জন্য বহু হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু আনীত হইয়া থাকে। সারা ভারতের মধ্যে, পশু ক্রয়-বিক্রয়ের এক প্রধান কেন্দ্র এই হরিহর ছত্রের মেলা। এইরূপ সুযোগ-সুবিধা আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, সনাতন যখন হাজিপুরে উপস্থিত হন সেই সময়ে হরিহর ছত্রের মেলা চলিতেছিল। কারণ সনাতনের ভগিনীপতি, নবাব-সরকারের পদস্থ কর্মচারী শ্রীকান্ত তখন নবাবের তরফ হইতে ঘোড়া কিনিবার জন্য তিন লক্ষ মুদ্রাসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হরিহর ছত্রের মেলা ভিন্ন এত ঘোড়া এক জায়গায় পাওয়া কঠিন। যে বাগানের ধারে বৃক্ষতলে সনাতন রাত্রে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন, সেই বাগানের ভিতরেই শ্রীকান্তের তাঁবু পড়িয়াছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ

করিয়া পরিচিত স্বরে হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে, শ্রীকান্ত চমকিত হইলেন এবং কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিনাম-কীর্তনকারী ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। দীন-হীন-কাঙ্গাল বেশ ধারণ করিলেও সনাতনকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহাকে এইভাবে দেখিয়া শ্রীকান্তের মনে অতীব বিস্ময় জন্মিল। সনাতনের উপর নবাবের ক্রোধ ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখার কথা শ্রীকান্ত জানিতেন, কাজেই এইভাবে তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও নিকট আর কিছু প্রকাশ করিলেন না। গভীর রাত্রে খুব বিশ্বস্ত জনৈক অনুচরকে সঙ্গে লইয়া সনাতনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। সনাতনের বেশভূষা দেখিয়া শ্রীকান্তের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তিনি তাঁহাকে এই ভিখারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া যথাযোগ্য পরিচ্ছদ ধারণ করিবার জন্য এবং দু'চার দিন তাঁহার কাছে থাকিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সনাতন তাহাতে কোনপ্রকারে সম্মত হইলেন না, ববং তৎক্ষণাৎ গঙ্গা পার হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য শ্রীকান্তকে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকান্ত অগত্যা বিমর্ষ চিত্তে তখনই নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সঙ্গে কাপড়চোপড়—আবশ্যকীয় জিনিসপত্রাদি লইবার জন্য শ্রীকান্ত বহু অনুরোধ-উপরোধ করিলেও, সনাতন কিছুই গ্রহণ করিলেন না। শেষে শ্রীকান্তের মন রক্ষা করিবার জন্যই হউক অথবা পশ্চিমের শীতে প্রয়োজনীয় বলিয়াই হউক, মাত্র একখানা ভোটকম্বল[১] গ্রহণ করিয়া নৌকায় চড়িলেন। মাঝি তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার করিয়া দিল।

এবার সনাতন অনেক নিরাপদ, নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। অহর্নিশ ভগবানেব চিন্তা ও নামকীর্তন করিতে করিতে কাশীব দিকে অগ্রসব হইতেছেন। রাজ-বৈভবে পালিত দেহ আজ ধূলায় ধূসরিত। বৃক্ষতলে শয়ন, ভিক্ষান্নে উদব-পোষণ, কিন্তু সেজন্য অন্তরে বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ হইতেছে না, বরং সংসার-পাশ-মুক্ত হইয়া চিত্তে পরম আনন্দ বোধ হইতেছে। এখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা চৈতন্যদেবের দর্শন ও কৃপালাভ। পদব্রজে চলিতে অনভ্যস্ত সনাতন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অনেকদিন পরে যখন কাশীতে উপস্থিত হইলেন, চৈতন্য-দেব তৎপূর্বেই প্রয়াগ হইতে ফিরিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তিনি লোক-সঙ্গ এড়াইয়া গোপনে থাকিতে ইচ্ছা করিলেও পূণ

১ ভোটকম্বল—পশমী কম্বল। প্রাচীনকাল হইতে তিব্বতের হিমালয়ের সংলগ্ন প্রদেশের নাম ভোট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা তিব্বত হইতে পশম ও পশমী কম্বলাদি ভারতে আমদানী করিয়া থাকেন। হরিহর ছত্রের মেলাতেও এই সকল জিনিস বহু আমদানী হয়। কাতিক মাসে মেলা হয়। তখন হইতেই শীত পড়িতে থাকে; সম্ভবতঃ এই কারণেই শ্রীকান্ত ভোটকম্বল দিয়াছিলেন।

চন্দ্রের বিমলকিরণের ন্যায় তাঁহার মহিমাজ্যোতিঃ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল। কাজেই সনাতনের পক্ষে তাঁহার সন্ধান ও বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হয় নাই। অনুসন্ধান লইয়া সনাতন চন্দ্রশেখরের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বহির্দ্বারের পার্শ্বে পথপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন, আশা—প্রভু বাহিরে আসিলে দর্শন মিলিবে।

বহুদিনের পথশ্রমে ক্ষীণ মলিন দীর্ঘকেশ-শ্মশ্রুধারী ছিন্নবসন ভিখারী ফকিরকে কেহই গ্রাহ্য করিল না; এরূপ ভিক্ষুক-দরবেশ লোকের দরজার পাশে কতই দেখা যায়। কিন্তু ভক্তের টানে ভক্তবৎসলের হৃদয়ে 'টনক' নড়িল। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দেখ দেখি, দরজার পাশে কোন ভক্ত বৈষ্ণব অপেক্ষা করিতেছেন কিনা?" চন্দ্রশেখর বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিয়া জানাইলেন, "কোন ভক্ত বৈষ্ণব বাহিরে নাই।" চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকেও দেখিতে পাইলে না?" চন্দ্রশেখর বিনীতভাবে বলিলেন, "একজন দরবেশ বসিয়া আছে।" অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া চৈতন্যদেব আদেশ করিলেন, "পরম সমাদরে সেই দরবেশকে ভিতরে লইয়া আইস।" বিস্মিত চন্দ্রশেখর দরবেশকে ভিতরে লইয়া আসিলেন, অবশ্য ভিতরে প্রবেশ করিতে দরবেশের খুব সঙ্কোচ হইল। চৈতন্যদেব দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া গিয়া দরবেশকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন,—উভয়ের প্রেমাশ্রুবারিতে উভয়ের দেহ সিক্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

> "প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।
> মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্‌গদ বচন॥
> দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
> দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
> তবে প্রভু তাঁরে হাতে ধরি লৈয়া গেলা।
> পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥
> শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জন।
> তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
> প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
> ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"

চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রকে সনাতনের পরিচয় দিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, "সনাতনের 'ভদ্রবেশ' করাইয়া দাও।" সনাতনের পরিচয় পাইয়া ভক্তগণের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তাঁহারা অতীব শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে, তাঁহাকে গঙ্গাঘাটে লইয়া গিয়া, নাপিত ডাকিয়া কামাইয়া দিলেন। কামাইবার পর গঙ্গাস্নান করিয়া সনাতন তীরে উঠিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র

প্রদান করিয়া পরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই সেই নূতন কাপড় পরিলেন না। তপন মিশ্রের বিশেষ আগ্রহে আজ চৈতন্যদেব সনাতনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। মিশ্রও সনাতনকে ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য একখানা নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। কিন্তু সনাতন নূতন কাপড় কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না শেষে মিশ্রের মনরক্ষার জন্য তাঁহার পরিধেয় পুরাতন একখানা ধুতি চাহিয়া লইলেন এবং তাহা ছিঁড়িয়া, বহির্বাস ও ডোর-কৌপীন করিয়া পরিলেন। সনাতনের কঠোর বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া চৈতন্যদেবের অন্তর 'পুলকিত হইল'।

চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণে যাইবার পূর্বে, যখন কাশীতে কয়েকদিন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কাশীবাসী জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। সাধুভক্ত এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, কাশীস্থ অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসিগণের নিকটও যাতায়াত করিতেন। শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক মণ্ডলীশ্বর[১] সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামী অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানমার্গ প্রচার করিতেন এবং ভগবদ্‌ভক্তি ও উপাসনামার্গের উপর কটাক্ষ করিয়া শাস্ত্রযুক্তি-সহায়ে ব্রহ্মের রূপকল্পনা এবং সাকার সগুণ উপাসনা ভ্রমমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বামিজীর বেদান্তব্যাখ্যা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন এবং তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিতেন। চৈতন্যদেবের মুখে ভক্তিউপাসনার কথা শুনিয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দজীকে বলিলেন, "পুরী হইতে এক তেজস্বী তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি ভক্তিউপাসনা প্রচার করেন। ভগবানের নামকীর্তন করিতে করিতে প্রেমে তাঁহার দেহে আশ্চর্য সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়, এমনকি বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না; বহু লোক তাঁহার অনুগত হইতেছে।" ব্রাহ্মণের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিয়াছিলেন,—

> "শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
> কেশবভারতী-শিষ্য লোকপ্রতারক॥
> চৈতন্য নাম তার ভাবকগণ লঞা।
> দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
> যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
> ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে সে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত

প্রকাশানন্দ স্বামী বাঙালী যাদুকর সন্ন্যাসী হইতে দূরে থাকিবার জন্য খুব সাবধান করিয়া দিলেও, ব্রাহ্মণ কিন্তু নিরস্ত হন নাই। চৈতন্যদেবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে একদিন প্রকাশানন্দজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করেন। প্রকাশানন্দের উক্তি শুনিয়া চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন,--

"ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাই না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম, কেমনে লঞা যাব।
অল্পস্বল্প মূল্যে পাইলে এথাই বেচিব॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত

তাঁহার সরস বাক্যে ভক্তগণের মনে হর্ষের সঞ্চার হইয়াছিল। এই ঘটনার পরেই চৈতন্যদেব কাশী ছাড়িয়া প্রয়াগের দিকে চলিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ভজনের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী জীবনযাপন করতঃ, পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সাগ্রহে পথ চাহিয়া ছিলেন। এখন তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার দর্শন পাইয়া ব্রাহ্মণের অন্তর পূর্ণ হইল।

সাধুভক্ত ব্রাহ্মণ একদিন সাধুগণের সেবার জন্য গৃহে ভাণ্ডারার[১] আয়োজন করিয়াছিলেন। নিরিবিলি আপনার ভাবে থাকিতে ইচ্ছুক চৈতন্যদেব কাশীতে কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, কিংবা কোন ভাণ্ডারাতে যাইতেন না, এমনকি স্বীয় দশনামী সম্প্রদাযের সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে পর্যন্ত মিশিতেন না। কিন্তু পরম অনুগত ভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহার বিশেষ আগ্রহে নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ভাণ্ডারাতে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগৃহে নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসীরা সভা করিয়া

---

১ ভাণ্ডারা—সাধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে ভোজন করাইবার নাম ভাণ্ডারা।

বসিয়াছেন। সমাগত মণ্ডলীশ্বর[২] মোহান্ত, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, জ্ঞানী, তপস্বী, ত্যাগী পণ্ডিত সন্ন্যাসীদিগকে সমাদরে ভাল আসনে ভাল স্থানে বসান হইতেছে; সকলের মধ্যস্থলে শ্রীমৎ প্রকাশানন্দজী মহারাজ সভাপতির ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীমৎ স্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীজী মহারাজ উপস্থিত হইয়া প্রচলিত প্রথানুযায়ী সভাস্থ সন্ন্যাসী-দিগকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া নমস্কার করিলেন এবং তৎপরে পাদপ্রক্ষালন-স্থানে গিয়া পাদপ্রক্ষালনান্তর সেই স্থানের নিকটেই সভার প্রান্তদেশে দীন-হীনভাবে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার তেজোময় দেহকান্তি, প্রশান্ত স্থির দৃষ্টি ও ভাবোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রকাশানন্দজী স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি এখানে কেন বসিয়া আছেন? সভার মধ্যে আসুন।" চৈতন্যদেব সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন, আপনাদের সঙ্গে বসিবার যোগ্য নহি।" প্রকাশানন্দ তাঁহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজের পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি পূজ্যপাদ কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী?" চৈতন্য-দেব বিনীতভাবে স্বীকার করাতে প্রকাশানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অনুযোগ দিয়া বলিলেন,—

"সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবা না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন গায়ন।
ভাবক সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্তন॥
বেদান্ত-পঠন-পাঠ সন্ন্যাসীর ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন এর কি কারণ॥"

---

১ মণ্ডলীশ্বর—বিদ্যা-বুদ্ধি-চরিত্রবান গণ্যমান্য যে-সকল সাধুর সমীপে বহু সাধু বাস করেন, তাঁহারা মণ্ডলীশ্বর বলিয়া পরিচিত। জুনা, নির্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, আনন্দ প্রভৃতি নামে পরিচিত কয়েকটি আখড়া (চিহ্নিত মঠমণ্ডলী)-তে বিভক্ত নাগা সন্ন্যাসিগণ উক্ত আখড়া ও বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক। ঐ সকল আখড়ার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল মঠ বা আখড়া আছে, সকলেই উঁহাদের নির্বাচিত পঞ্চায়েতের অধীন। কুম্ভমেলাতে সকলে একত্র হইয়া নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক বিষয়ে বিচার-বিবেচনা আলোচনাদি করিয়া থাকেন। সমস্ত মূল আখড়াই উপযুক্ত দেখিয়া এক-একজন মণ্ডলীশ্বর নির্বাচিত করেন—তাঁহার নেতৃত্বে পঞ্চায়েত ও কুম্ভমেলা পরিচালিত হয়।

চৈতন্যদেব বিনম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "স্বামিজী, আমি বেদান্ত বিচারে অনধিকারী, সেইজন্যই গুরুদেবের উপদেশানুসারে কৃষ্ণনাম জপ করি। তাঁহার আদেশ,—

"মূর্খ তুমি নাহি তব বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মাত্র সার॥"

কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে আমার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়, ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারি না।

'হাসি কাঁদি নাচি গাই যেন মদমত্ত।'

গুরুদেবকে এইরূপ অবস্থার কথা নিবেদন করায়, তিনি অতীব প্রসন্নচিত্তে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্বজন॥
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করি॥"

চৈতন্যদেবের সুমধুর বাক্যে সকলেরই অন্তরে প্রীতির সঞ্চার হইল; কিন্তু প্রকাশানন্দ তাহাতে তুষ্ট হইলেন না। তিনি অনুযোগ দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কৃষ্ণভক্তি কর ইহাই সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেন তাহে কিবা দোষ॥"

সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে মেলামেশা ও বেদান্ত আলোচনা না করার জন্য প্রকাশানন্দ পুনঃপুনঃ অনুযোগ দেওয়াতে চৈতন্যদেব স্বীয় অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, "বেদান্তসূত্র ঈশ্বরের বাক্য। মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানই ব্যাসরূপে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, মানুষ প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিতে পারে না। উপনিষদ সহিত ব্যাসসূত্র যে তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহাই চরম সাধ্য। কাজেই ব্যাসসূত্র শ্রবণ-মননে,—বেদান্ত আলোচনায় পরম লাভ ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কূটবুদ্ধি তার্কিক, বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ ও অন্যান্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের তর্কজাল খণ্ডন এবং বিচার-যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আস্তিক্য বুদ্ধি স্থাপন ও বেদানুগামী করিবার জন্য, ঈশ্বর ইচ্ছানুসারেই পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাহাতে

প্রতিবাদীদিগের সিদ্ধান্ত খণ্ডনমুখে যদিও ব্রহ্মের নির্গুণ নির্বিশেষ তত্ত্ব ও তদুপলব্ধির জন্য জ্ঞানমার্গে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের কথাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, তথাপি উপনিষদে ও ব্যাসসূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষ সগুণ ভাব ও উপাসনা সম্পর্কে যে সকল বাক্য আছে, আচার্য তাঁহার খণ্ডন করা ত দূরের কথা, ঐ সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পূর্বক, অবিদ্যা-তিমিরাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে ভগবদুপাসনা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য উপাসনা-বিরোধী বলিয়া মনে করেন এবং সেইজন্যই তাঁহার ভাষ্য অবলম্বন করিয়া শ্রুতি ও ব্যাসসূত্রের বিকৃতব্যাখ্যা প্রচার করিয়া লোকের বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটাইয়া থাকেন। ফলে দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব নিজেকেই বিভু মনে করে, অবিচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের মহিমা ভুলিয়া তাঁহার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিপথগামী হয়,—নশ্বর দেহের দাসত্ব করিয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বেদান্তালোচনা না করাই ভাল মনে করি।"

"প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থে করয়ে ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্র-কর্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥

. ...

চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু কয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥"

চৈতন্যদেব এইভাবে প্রচলিত বেদান্তালোচনার দোষ প্রদর্শন করিলে প্রকাশানন্দ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ করিলেন। দুইজনেই মহাপণ্ডিত, ঘোরতর তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রকাশানন্দ শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত এবং তাঁহার উপলব্ধির জন্য জ্ঞানমার্গেরই সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হইলেন। চৈতন্যদেব দেখাইলেন, সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও পরমেশ্বরের উপাসনাও শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত। দুইজনই শাস্ত্রজ্ঞ, স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনে পটু; কিন্তু চৈতন্যদেবের শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়াও 'বস্তু'র স্বরূপ সম্বন্ধে 'স্বানুভূতি' ছিল। তিনি যে তত্ত্ব প্রচার

করিতেন, স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অপরোক্ষ অনুভব থাকায় তাঁহার বাক্য ও সিদ্ধান্তসমূহ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইল। পরিশেষে প্রকাশানন্দ ভগবদ্ভক্তি ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন, আর বিচার করিতে চাহিলেন না।

"তবে সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া॥
.. ..
প্রভুতে প্রণত হইল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে অতি মনোরম॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে প্রভুর করিয়া সম্মান॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতীব মোহন॥"

মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত-গৃহস্বামীর অন্তর, প্রভুর সম্মান দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হইল। সেইদিন হইতে 'বাঙালী ভাবক সন্ন্যাসী'র মহিমা চারিদিকে সমধিক ছড়াইতে লাগিল।

"প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী॥
বারাণসী পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরী সহ সর্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাঁহাই সকল লোক হয় মহা ভিড়ে॥"

চৈতন্যদেব মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। সনাতনের ত্যাগ-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তি দেখিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণের মনে খুব প্রীতির সঞ্চার হইল। তিনি সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গিয়া পরম সমাদরে একদিন ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রত্যহই তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সনাতন কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

"সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব॥"

অন্নপূর্ণার রাজ্যে মাধুকরীর অন্নে উদর পোষণ করিয়া সনাতন চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকম্বলখানি শীতনিবারণের জন্য গায়ে থাকিত। সনাতন লক্ষ্য করিলেন, চৈতন্যদেব মধ্যে মধ্যে কম্বলখানার উপর দৃষ্টি দেন। এভাবে দৃষ্টি প্রদানের কারণ কি? সনাতনের মনে চিন্তা হইল এবং বিচক্ষণ রাজমন্ত্রীর পক্ষে এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও দেরি লাগিল না। পরদিন সনাতন গঙ্গাঘাটে জনৈক গরীব বাঙালীকে একখানি কাঁথা ধুইয়া শুকাইতে দেখিয়া, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় ভোটকম্বলের বিনিময়ে তাহার কাঁথাখানি লইতে চাহিলেন। সে বেচারী সনাতনের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিল না; তাহাকে উপহাস করা হইতেছে ভাবিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার সাধুর পোশাক দেখিয়া মহৎ লোক বলিয়া মনে হয়। গরীবকে এইভাবে বিদ্রূপ করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না।" সনাতন মধুর বাক্যে তাহাকে আশ্বাস দিয়া জানাইলেন, তিনি উপহাস করিতেছেন না; সত্যই ভোটকম্বলের বিনিময়ে তাহার কাঁথা লইতে ইচ্ছা করেন, সে যদি উহাতে রাজি হয় তবে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই ব্যক্তির এ-হেন অদ্ভুত প্রস্তাবে সে অতীব বিস্মিত হইল, এবং তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া ভোটকম্বলের বদলে কাঁথাখানি তাঁহাকে দিয়াই দিল। গরম কম্বল পাইয়া দরিদ্র লোকটি খুবই খুশী হইল এবং সনাতনও পরমানন্দে কাঁথা গায়ে দিয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইলেন। সনাতনের গায়ে কাঁথা দেখিয়া চৈতন্যদেবের চিত্ত অতীব প্রসন্ন হইল।

"প্রভু কহে উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সৎ বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥"

জ্ঞানগুরু শঙ্করের প্রিয় নিকেতন কাশী চিরকালই বিদ্যালোচনার কেন্দ্র। চৈতন্যদেব কাশীতে বেশীদিন থাকিতে প্রথমে ইচ্ছা না করিলেও মহাদেবের ইচ্ছায় তাঁহাকে বেশ কিছু দিনই থাকিতে হইল। কাশীতে ভক্তগণের সঙ্গে তিনি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ভজন-কীর্তন করিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেছিলেন; এখন প্রিয় অন্তরঙ্গ সনাতনের আগমনে সেই আলোচনাদি আরও

বৃদ্ধি পাইল। এইস্থানেই তিনি স্বীয় ভক্তিমার্গের সর্বপ্রধান আচার্য, প্রচাবক ও সংরক্ষক শ্রীমৎ সনাতনকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবজগৎ, ঈশ্বব-তত্ত্ব ও ভক্তি-উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে সনাতনের শিক্ষা প্রসঙ্গে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাহা হইতে চৈতন্যদেব প্রচারিত মার্গের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সনাতন শরণাগত হইয়া চৈতন্যদেবের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, তিনি একে একে তাঁহাকে শাস্ত্র-যুক্তি সহায়ে যে সকল তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য প্রশ্নোত্তর ছলে অতি সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

প্রশ্ন—বিশ্বের কারণ মূল বস্তু কি?

উত্তর—"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
পুনরপি সেই ব্রহ্মে হয়ে যায় লয়॥"

প্রশ্ন—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—তিন একই বস্তু হইলেও পৃথক নাম নির্দেশের হেতু কি?

উত্তর—"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

প্রশ্ন—জীবের স্বরূপ কি?

উত্তর—"জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্যাংশ কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

প্রশ্ন—জীব পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান কৃষ্ণের নিত্যদাস-অংশ হইলে জীবের ত্রিতাপের হেতু কি? মুক্তিলাভই বা কিরূপে হইবে?

উত্তর—"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

প্রশ্ন—জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল?

উত্তর—"মায়াদ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তিবিনে।"

প্রশ্ন—অবতার তত্ত্ব কি?

উত্তর—"সৃষ্টি হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্তি অবতাব নাম ধরে॥

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া করি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা যায় পুরাণ গণন॥”

প্রশ্ন—এইরূপে সৃষ্টিকার্যে মায়া সম্পর্কে তাঁহার শুদ্ধ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপের হানি হয় না কি?

উত্তর—“যদ্যপি সর্বাশ্রয় তিঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ॥
এইমত গীতাতেই পুনঃপুনঃ কয়।
সর্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥”

প্রশ্ন--তিনি এক হইয়াও কিভাবে বহুরূপে জগতে লীলা বিলাস করিতেছেন?

উত্তর—“অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডে করে বিহার॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশে জীব দুই ত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য-সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥

তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকটে যায়॥"

প্রশ্ন—কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ যাঁর গোলক নিত্যধাম॥
জ্ঞান-যোগ-ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥
ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংশ॥
ভক্তে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥"

... ...

"কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥
কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

প্রশ্ন—শক্তিত্রয় কি কি?

উত্তর—"চিচ্ছক্তি-স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষাশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥

'স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ' কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ' সর্বশাস্ত্রে কয়॥"

প্রশ্ন—স্বরূপশক্তির পরিচয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্বনাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা-পিতা স্থান-গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥"

... ...

"কৃষ্ণ-ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥"

"হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব নাম॥

. ...

মহাভাব স্বরূপ শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি।
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনাগণ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥
লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর তথি॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংস্থরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশ স্বরূপ॥
আকাব স্বভাব ভেদ ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥

বহু কান্তা বিনে নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রসাদিক লীলাস্বাদে॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি॥
অতএব সর্বপূজ্য পরম দেবতা।
সর্বপালিকা সর্ব জগতের মাতা॥"

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীরাধা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভেদ কি অভেদ বস্তু?

উত্তর—"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান॥
মৃগমদ তাঁর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিত ধরে দুইরূপ॥"

প্রশ্ন—বস্তুর জ্ঞান কিভাবে হয়?

উত্তর—"স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ—স্বরূপ লক্ষণ।
কার্যদ্বারা জ্ঞান হয় তটস্থ লক্ষণ॥"

প্রশ্ন—ভগবদ্‌ভক্তির স্বরূপ কি?

উত্তর—"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণ উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ[১] কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি[২] শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

---

১ "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
নানারূপ চেষ্টা প্রযত্নাদি ক্রিয়ার ফলে অভীষ্ট বস্তু লাভ করার নাম সাধনা, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বস্তুকে অন্তরে উপলব্ধিই তাহার সাধনাসিদ্ধ।

২ শ্রবণাদি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তি। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—বাচনিক; পাদসেবন, অর্চনা ও বন্দনা—কায়িক; দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—মানসিক।

প্রশ্ন—(প্রেমের) ভক্তির সাধন প্রণালী শুনিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—"এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥"

প্রশ্ন—শাস্ত্রে বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি (৬৪) অঙ্গের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মুখ্য কি কি?

উত্তর—"সাধুসঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

প্রশ্ন—রাগানুগার ভজন প্রণালী কিরূপ?

উত্তর—"লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হইয়া॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজায় প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতি-ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান॥"

প্রশ্ন—সাধন-ভজনের প্রধান বিঘ্ন কি?

উত্তর—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

প্রশ্ন—সাধুসঙ্গের ফল কি?

উত্তর—"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মোক্ষ অঙ্গ॥"

প্রশ্ন—ভজনশীল ভক্ত কি ভাবে জীবন যাপন করিবেন?

উত্তর—"অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে॥
হানি-লাভ সম শোকাদি বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥"

প্রশ্ন—রাগমার্গে-বিধিমার্গে অনুভবের তারতম্য কি?

উত্তর—"রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।[১]
বিধি ভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥"

প্রশ্ন—সেই পরম তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলা হয় কেন?

উত্তর—"ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কহে সর্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য করি নাহি যাঁর সম॥
সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন॥"

প্রশ্ন—তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয় কেন?

উত্তর—"আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্বস্বরূপ।
সর্বব্যাপক সর্ব সাক্ষী পরমস্বরূপ॥
... ...
সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান তিনরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥
ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্তে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষে ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥"

---

১ "কর্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধিভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ॥"

প্রশ্ন—প্রেমভক্তির তত্ত্ব বিশেষভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।

উত্তর—"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবনাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাতে এতেক চিহ্ন সর্বশাস্ত্রে কয়॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি রয়॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় লালসা প্রধান।
নাম গানে সদারুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ লীলাস্থানে করে সর্বদা বসতি॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
তার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্তমুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥”

একদিন চৈতন্যদেব পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব দর্শনে গমন করিয়াছেন, বহু ভক্তও তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের বন্ধু পরমানন্দ নামক জনৈক সুগায়ক কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহাকে ভজন শুনাইয়া আনন্দ দিতেন; তিনিও সেই সঙ্গে আছেন। মাধবকে দর্শন ও স্তুতি প্রার্থনাদি করিবার পর চৈতন্যদেব পরমানন্দকে ভজন গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরমানন্দ কীর্তন আরম্ভ করিলে, ভক্তগণ সহ চৈতন্যদেব স্বয়ং তাহাতে যোগ দিলেন। সংকীর্তন খুবই জমিয়া উঠিল। ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবকে ঘিরিয়া ভক্তগণ আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। সুমধুর সংকীর্তন ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক আসিয়া কীর্তনে যোগ দিল। আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে ছুটিয়া চলিল। ভক্তগণসঙ্গে প্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেব মধুরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছেন,--

“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥”

সেই নামধ্বনি শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরের গভীরে যাইয়া এবং চিত্তকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবানের ভাবে বিভোর করিতেছে। সশিষ্য প্রকাশানন্দ স্বামী গঙ্গাতীরে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চৈতন্যদেব কখনও বা ভাবের আবেশে স্থির চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন আর সমবেত জনমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হইয়া তৃষিত নয়নে সেই দেবদুর্লভ রূপ-মাধুরী পান করিতেছে। আবার কখনও সেই অপূর্ব ভাবের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া সোনার তনু ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে; তখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অতি সাবধানে সেই দেব-দেহ রক্ষা করিতেছেন। এই অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া প্রকাশানন্দ বিস্মিত ও স্তম্ভিত; সঙ্গী শিষ্যগণসহ একটু দূরে দাঁড়াইয়া নির্বাক, নিস্পন্দভাবে সেই অদৃষ্টপূর্ব ভাবসমুদ্রের লীলা-লহরী দেখিতেছেন। ভাবাবস্থায় চৈতন্যদেবের তেজোদৃপ্ত দিব্য দেহ দেখিয়া প্রকাশানন্দের বিস্মরণ হইল— ইনিই সেই বিনয়-নম্র মধুরভাষী যুবক সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী! শেষ পর্যন্ত প্রকাশানন্দ আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহার ভক্তিকোমল হৃদয়ের শুষ্ক জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইল। তিনি আবিষ্টের ন্যায় সংকীর্তনে যোগ দিলেন, তাঁহার শিষ্যগণও অনুবর্তী হইলেন।

অনেকক্ষণ নৃত্যগীতের পর চৈতন্যদেব ভাব সংবরণ করিলেন, কীর্তন ভঙ্গ হইল। স্বাভাবিক অবস্থায় চৈতন্যদেব প্রকাশানন্দকে সম্মুখে দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তাহাতে প্রকাশানন্দের মনে অতিশয় সঙ্কোচ জন্মিল। তিনি ততোধিক বিনয় সম্মানসহকারে ভক্তিভাবে প্রতিনমস্কার করিলে পর, চৈতন্যদেব তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি জগদ্‌গুরু! আমি আপনার শিষ্যের তুল্য, প্রণামের যোগ্য নহি; আপনি এইভাবে প্রণাম করিলে আমার সর্বনাশ হইবে।" তদুত্তরে প্রকাশানন্দ তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' সম্বোধন করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। চৈতন্যদেব তাহাতে বাধা দিয়া পুনরায় বিনয় প্রকাশপূর্বক কহিলেন, "আপনি তত্ত্ববিৎজ্ঞানী, আপনার নিকট সকলই ব্রহ্ম; কিন্তু দুর্বল জীবের ইহাতে অনিষ্ট হয়। আমরা অতি দুর্বল জীব।"

"যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাষে।
লোকশিক্ষা লাগি এমত কহিতে না আইসে॥"

দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে 'আমি ব্রহ্ম' অভিমান অত্যন্ত অমঙ্গলের হেতু হয়। দুর্বল জীবের পক্ষে, 'আমি ভগবানের দাস', এই ভাবই শ্রেয়স্কর।

"প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে॥"

প্রকাশানন্দের হৃদয় আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি পূর্বে যে নিন্দা করিয়াছিলেন সেজন্য আজ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং শাস্ত্রপ্রমাণসহ ভক্তিমার্গের রহস্য জানিতে চাহিলেন। অন্তরের পরিবর্তন ও উপাসনাতত্ত্ব জানিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ বুঝিয়া চৈতন্যদেবের মন তাঁহার উপর প্রসন্ন হইল। তিনি প্রকাশানন্দকে 'শ্রীমদ্ভাগবত' অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিমার্গের সম্যক্‌তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। উহা উক্ত মার্গের প্রধান সিদ্ধান্তগ্রন্থ। ভগবান বেদব্যাস বেদ, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের সার-সঙ্কলনস্বরূপ এই পরমহংস-সংহিতা ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিযা, নিজ তনয় তত্ত্বজ্ঞশিরোমণি শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের প্রতি কৃপাপূর্বক ইহা জগতে প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও গুণময়, নিরঞ্জন হইয়াও নররূপধারী। ইহাতে পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও লীলাকথা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ইহার আলোচনা করিলে ভগবৎ-তত্ত্ব ও ভক্তিমার্গের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। ইহা

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপ বলা চলে।” প্রকাশানন্দের সঙ্গে তাঁহার 'ভাগবত' সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। তিনি শ্রুতি-বাক্য ও ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে ভাগবতের মিল দেখাইবার জন্য অনুরূপ শ্লোকসমূহের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া ঐ সকলের সহিত ভাগবতের সম্পূর্ণ একবাক্যতা দেখাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তত্ত্বকথায় প্রকাশানন্দের মনে এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একাদিক্রমে পাঁচ দিবস পর্যন্ত তাঁহার সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রুতি-স্মৃতি, ন্যায়-যুক্তি সহায়ে চৈতন্যদেব তাঁহার অন্তরে ভক্তিভাব দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের গতি ও ভাবধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। তিনি চৈতন্য-দেবের পরম অনুগত ভক্ত হইয়া শেষ জীবনে ব্রজবাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীতে বাঙালী নবীন সন্ন্যাসীর 'ভাবুকতার' প্রভাব ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহার সুমধুর বাক্য-সুধা পান করিয়া জুড়াইবার জন্য দিগ্‌দিগন্তর হইতে বহু লোক আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি নিজে চন্দ্রশেখরের গৃহে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে চুপি চুপি ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিতে চাহিতেন না বা লোকসঙ্গ ভালবাসিতেন না। কিন্তু আগ্রহান্বিত দর্শকবৃন্দ তাহা বুঝিত না, বুঝিলেও তাহাদের প্রাণ মানিত না; তাহারা তাঁহাকে ঠিক খুঁজিয়া বাহির করিত এবং প্রাণ ভরিয়া দর্শনাদি করিয়া ও উপদেশ শুনিয়া অন্তর জুড়াইত।

> “প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
> লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
> স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
> তাহাই সকল লোক আসি হয় ভিড়॥”

চৈতন্যদেব কাশীতে দুই মাস থাকিয়া ভক্তিধর্ম প্রচার করিলেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতনকে বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞান ও ভজনপ্রণালী শিক্ষা দিয়া নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন। সনাতনের বিশেষ আগ্রহ ছিল, সঙ্গে গিয়া পুরীতে তাঁহারই নিকট বাস করিবেন। তিনি বিনীতভাবে আপনার অন্তরের অভিপ্রায় তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব বলিলেন, “তোমার দুই ভাই বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তুমিও সেখানে গিয়া সাধনভজন কর এবং সেখানে কোন ভক্ত গেলে তাঁহার সেবা করিও। পরে অবসরমত পুরীতে গিয়া দেখা করিবে।

'কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন॥'"

কাশীর ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া এবং শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চৈতন্যদেব বলভদ্র ভট্টাচার্য ও সেবক-ব্রাহ্মণসঙ্গে পুনরায় সেই ঝাড়খণ্ড হইয়াই পুরী প্রত্যাবর্তনের পথ ধরিলেন। তাঁহার বিদায়ের পর সনাতনও প্রয়াগ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

শ্রীরূপ ও অনুপম চৈতন্যদেবের আদেশানুযায়ী ব্রজভূমে গমন করিলে মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক ভক্ত বাঙালীর সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। রায় বিশেষ আদরযত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিকটে রাখিয়া থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া দেন এবং সঙ্গে লইয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিদর্শন করান। পাঠকগণের পরিতোষের জন্যে সুবুদ্ধি রায়ের অদ্ভুত কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

সুবুদ্ধি রায় প্রথমে গৌড় নগরীর একজন সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন অধিবাসী ছিলেন এবং গৌড়ের নবাব হুশেনশাহ বাল্যকালে তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রতিভাশালী বালকের উপর রায়ের খুব স্নেহ-মমতা ছিল এবং সর্বদা তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। স্নেহশীল হইলেও রায় আবশ্যকানুযায়ী বালকের সুশিক্ষার জন্য কঠোর শাসন করিতেও ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে একসময়ে তাহাকে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য রায় বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে এক ঘা জোরে লাগাতে বালকের কোমল শরীর কাটিয়া যায় এবং উহার ফলে চিরকালের মত শরীরে একটি ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়। পরবর্তীকালে সৌভাগ্যশালী বালক অধ্যবসায়বলে যখন বাংলার মসনদে বসিলেন তখন তিনি পূর্ব আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। সুবুদ্ধি রায় হুশেনশাহের রাজত্বের প্রথমদিকে বাদশাহের আনুকূল্যে ধনী-মানী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং নানা সৎকর্মের জন্য চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তিও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং তিনি অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইলেন। হুশেনশাহের প্রিয়তমা বেগম একদিন বাদশাহের শরীরে বাল্যকালের সেই পুরাতন দাগ দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হন এবং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, ইহা সুবুদ্ধি রায়ের বেত্রাঘাতের চিহ্ন, তখন তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে আত্মহারা বেগম সুবুদ্ধি রায়কে অপমানিত করিবার জন্য হুশেনশাহকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রায়ের অন্নে

আমি প্রতিপালিত, তিনি আমার পিতৃতুল্য; শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আমাকে শাস্তি দিয়াছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহেই আমার এত উন্নতি হইয়াছে. তাঁহাকে কোন-প্রকার অসম্মান করিলে আমার অধর্ম হইবে।" বেগম নিরস্ত হইলেন না, সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি অন্তরে বিষম আক্রোশ পোষণ করিয়া রাখিলেন. এবং পরে সুযোগ বুঝিয়া স্বামীকে আবার উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বাদশাহকে পত্নীর মনরক্ষা করিতেই হইল, তাহা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। নবাব অগত্যা অন্য কোনপ্রকার নির্যাতন না করিয়া, শুধুমাত্র 'বদনার পানি' রায়ের মুখে দেওয়াইলেন।

মুসলমানের জল মুখে পড়ায় ধর্ম নষ্ট হইল। তিনি জাতিচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। কোন কোন পণ্ডিত বলিলেন, "সর্বনাশ! মুসলমানের জল! মহাপাতক! তপ্তঘৃত মুখে ঢালিয়া পুড়িয়া মরাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।" আবার কোন কোন পণ্ডিত বলিলেন, "অনিচ্ছাকৃত পাপ,—সামান্য দোষ, সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে।" সুবুদ্ধি রায় নানা পণ্ডিতের নানা মতে সংশয়াকুল হইয়া, কাশীস্থ বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ব্যবস্থা লইবার জন্য কাশীতে আসিলেন। সেই সময়ে চৈতন্যদেব মথুরা যাওয়ার পথে প্রথমবার কাশী আসিয়াছেন। মনোদুঃখে জীবন্মৃত রায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহার নাম-মহিমা ও অলৌকিক প্রভাবের কথা রায়ের নিশ্চয়ই শোনা ছিল। এখন সাক্ষাতে সেই ভুবনমোহন মূর্তি দর্শন করিয়া ও অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া রায়ের অন্তর জুড়াইল। রায়ের মুখে তাঁহার অন্তরের গভীর দুঃখের কাহিনী শুনিয়া চৈতন্যদেবের হৃদয় বিগলিত হইল; তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "হরিনাম কর।

'এক নামাভাসে তোমার সর্বপাপ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥'"

চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি রায়কে অভয় দিয়া ভগবানের নাম কীর্তন ও তীর্থ দর্শন করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী, রায় কাশী হইতে বাহির হইয়া প্রয়াগ, অযোধ্যা দর্শন করিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন এবং খুব ভজনের অনুকূল দেখিয়া সেই স্থানে থাকিয়া কিছুকাল ভগবদ্ভজন করেন। ভজনের ফলে চিত্ত শান্ত হইলে রায় মথুরা গমন করিলেন: রায় শুনিয়াছিলেন চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল দর্শন করিতে আসিবেন। সেইজন্য আশা করিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে আবার এখানে সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু মথুরায় আসিয়াই জানিতে পারিলেন, অতি অল্পদিন পূর্বে তিনি ব্রজভূমি দর্শন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। অন্তরে খুব দুঃখ হইলেও সুবুদ্ধি রায় মথুরাতেই বাস করিয়া সাধন-ভজনে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রায় জঙ্গল হইতে শুক্‌না কাঠ আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন; তাহাতে দৈনিক পাঁচ-ছয় পয়সা রোজগার হইত। তাহা হইতে এক পয়সা নিজ আহারের জন্য খরচ করিতেন এবং বাকী পয়সাগুলি জনৈক দোকানদারের নিকট জমা থাকিত। সাধুভক্ত গরীব-দুঃখীর সেবাতে সেই অর্থ ব্যয় করিতেন। পূর্বে বাঙালীদিগের ঐ অঞ্চলে গিয়া থাকা-খাওয়া বড়ই কষ্টকর ছিল, বিশেষতঃ সাধু-সন্ন্যাসী গরীব-দুঃখীর পক্ষে। স্থানীয় লোকের প্রদত্ত হিন্দুস্থানী খাওয়া, 'রুখা শুকা' মোটা রুটি, নবাগত বাঙালীর পক্ষে খুবই কষ্টকর হইত। সুবুদ্ধি রায় সেইজন্য কোন বাঙালী পাইলে তাহাকে খুব আদরযত্ন করিয়া রাখিতেন এবং পরম প্রেমের সহিত মাথায় তেল মাখাইয়া দিতেন ও দই-ভাত খাওয়াইয়া পেট ঠাণ্ডা করিতেন। তাঁহার নিজের কিন্তু অধিকাংশ দিন ঐদেশী লোকের ন্যায় এক পয়সার শুক্‌না চানা চিবাইয়া কাটিয়া যাইত।

শ্রীরূপ ও অনুপম মথুরায় আসিলে সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল। দেখা হইবামাত্রই রায় তাঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করাইলেন। মাত্র এক মাস থাকিয়া দুই ভাই সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আবার কাশীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। চৈতন্যদেব মথুরা হইতে গঙ্গার কিনারের রাস্তায় গিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারাও সেইপথে চলিয়াছেন; আর এদিকে সনাতন কাশী হইতে যাত্রা করিয়া প্রয়াগ দর্শনান্তর প্রসিদ্ধ রাজপথে মথুরা আসিতেছেন। কাজেই বিভিন্ন পথে চলার দরুণ পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইল না। শ্রীরূপ প্রয়াগ পৌঁছিয়া সনাতনের মথুরা গমনের বার্তা পাইলেন এবং সনাতনও মথুরাতে আসিয়া দুই ভাইয়ের প্রত্যাবর্তন-খবর শুনিলেন। পরস্পর দেখা না হওয়াতে সকলেরই মনে খুব দুঃখ জন্মিল।

সনাতনকে পাইয়া সুবুদ্ধি রায়ের পরম আনন্দ হইল। তিনি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য খুবই চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কঠোর তপস্বী, তীব্র বৈরাগ্যবান সনাতনের দেহসুখে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। সর্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর, আর চৈতন্যদেবের আদেশ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান—লুপ্ত তীর্থসকল আবিষ্কার করিবার জন্য আকুল। ভগবানের কৃপায় সাধন-ভজন -উপলব্ধি-সহায়ে দিনে দিনে তাঁহার সেই আগ্রহ পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি স্থানীয় পাণ্ডাগণের নিকট হইতে মথুরা মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন এবং সাধু-পণ্ডিত ও প্রাচীন ব্রজবাসীদিগের সহায়তায়, অনুসন্ধানক্রমে ধীরে ধীরে সেই সকল লুপ্ত স্থান উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

"মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে॥

মথুরা মাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া॥"

কাশী হইতে বাহির হইয়া চৈতন্যদেব ঝাড়খন্ড হইয়া জঙ্গলের রাস্তায় চলিয়া যথাসময়ে পুরী প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া পুরীবাসী ভক্তগণের অন্তর শীতল হইল; তাঁহারা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনি সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন, কনিষ্ঠেরা তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া চরণে সাষ্টাঙ্গ হইল। বহুদিন পর দেখা-সাক্ষাতে পরস্পরের হৃদয়ে প্রেম উথলিয়া উঠিল।

চৈতন্যদেব পূর্বের ন্যায় পুরী-ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ, জগদানন্দ-দামোদর প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ এবং রামানন্দ-সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্ত-গৃহস্থগণ-সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়া এবং নিত্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন, সমুদ্রস্নান, মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার পুরী প্রত্যাবর্তনের শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য বাংলা দেশে লোক প্রেরিত হইল, শচীদেবী ও ভক্তগণ সেই খবব পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। আগামী রথযাত্রায় আবার তাঁহার সঙ্গে মিলনের আশায় ভক্তগণের হৃদয়ে উল্লাসের সীমা রহিল না। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর প্রথম ছয় বৎসরের অধিকাংশ কাল, এইভাবে তীর্থভ্রমণেই অতীত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি আর কোথাও যান নাই, পুরীতেই থাকিয়া ধর্মপ্রচার, ভক্ত-অন্তরঙ্গগণের শিক্ষা, সাধন-ভজন-ধ্যান-ধারণা-শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়া ত্রিতাপ-তাপিত জীবের প্রাণে শান্তির সুশীতল বারি সিঞ্চন করিয়াছিলেন।[১]

১ উত্তর-পশ্চিমযাত্রায় চৈতন্যদেবের অযোধ্যা দর্শনের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। সুবুদ্ধি রায়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়—

তিনি— "পাঞা আজ্ঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে রহিলা॥"

বুঝা যাইতেছে তখন অযোধ্যা গমন অতিশয় কঠিন ছিল না; এমতাবস্থায় চৈতন্যদেব যে তাঁহার পরম প্রিয় রঘুনাথের জন্মভূমি দর্শন করেন নাই, ইহাতে সংশয় হয়।

নবম অধ্যায়

পুরীবাস—অন্তরঙ্গগণের শিক্ষা—প্রচারক-গঠন সংঘ-স্থাপন

এবারেও গৌড়ীয় ভক্তগণ হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে রথযাত্রার পূর্বে পুরীতে প্রবেশ করিলেন; চৈতন্যদেব স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। বহুদিন পরে আচার্য অদ্বৈত, প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, ভক্তাগ্রণী শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গগণের সহিত মিলনে, যে অপার প্রেমের বিকাশ হইল, তাহার মাধুর্য বর্ণনাতীত। চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় ভক্তগণের সম্মিলনে এ বৎসর রথযাত্রা এবং আনুষঙ্গিক উৎসবগুলি খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইল। পূর্বের ন্যায় গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে সন্ন্যাসি-চূড়ামণি শ্রীমন্দিরে মহাসংকীর্তনে গাহিলেন, নাচিলেন, রথের পূর্বে ভক্তগণসহ গুণ্ডিচাবাড়ী মার্জনা করিয়া সকলকে আনন্দ দিলেন, রথাগ্রে নৃত্যগীতকীর্তন ও প্রেমভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক লক্ষ লক্ষ যাত্রীর নয়ন-মন সার্থক করিলেন। মহানন্দের ভিতর দিয়া চারি মাস মুহূর্তের ন্যায় কাটিয়া গেল। অতঃপর ভক্তগণ চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেশে ফিরিলেন।

শ্রীরূপ ও অনুপম প্রয়াগ হইতে কাশী আসিয়া খবর পাইলেন চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উভয়ের প্রাণই ব্যাকুল; দুই ভ্রাতা যুক্তি করিয়া বঙ্গদেশ হইয়া পুরী চলিলেন। গৌড়ে আসিয়া অনুপমের দেহ অসুস্থ হইল এবং কিছুদিন পরে শ্রীরামচন্দ্রের পরম-ভক্ত অনুপম 'তারক-ব্রহ্ম' রামনাম জপ করিতে করিতে 'গঙ্গাপ্রাপ্ত' হইলেন। স্নেহের পাত্র পরম অনুগত কনিষ্ঠ সহোদরের দেহত্যাগের জন্য গৌড়ে শ্রীরূপকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ভ্রাতার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াই তিনি আবার নীলাচলের পথ ধরিলেন এবং যথাসময়ে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপ দূরে থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়ায় চক্রদর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণতঃ হইলেন, প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ভক্তিবিহ্বল চিত্তে স্তুতি-প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মন্দিরের নিকট গেলেন না। অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে চৈতন্যদেবের কুঠিয়াতে পৌঁছিয়া তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইলেন।

উল্লসিতহৃদয় চৈতন্যদেব শ্রীরূপকে বুকে জড়াইয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তাঁহার সেই প্রেমের স্পর্শে শ্রীরূপের সমস্ত দুঃখকষ্ট এককালে তিরোহিত

হইল। পরস্পর কুশলবার্তা বিনিময়ের পর চৈতন্যদেব উপস্থিত ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলেন। অনুপমের দেহত্যাগের খবরে চৈতন্যদেবের মনে দুঃখ হইলেও দেহত্যাগকালীন উচ্চভাবের কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। সনাতনের সঙ্গে তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই জানিয়া চৈতন্যদেবের অন্তরে দুঃখ জন্মিল। হরিদাসের কুঠিয়াতেই রূপের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল, চৈতন্যদেবের আদেশানুযায়ী গোবিন্দ প্রত্যহ হরিদাসের ন্যায় তাঁহাকেও মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন। বরাবরই চৈতন্যদেব সকালবেলা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে ফিরিয়া হরিদাসের কুঠিয়াতে আসিতেন এবং তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসাপূর্বক কিছুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সমুদ্রস্নানে যাইতেন। এখন রূপ গোস্বামীকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই; তাই হরিদাসের কুঠিয়ায় উভয়ের সঙ্গে সদালাপে বহুক্ষণ কাটিতে লাগিল।

রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেবের অপূর্ব ভাবের আবেশ এবং বারংবার এক সুমধুর কবিতা[১] আবৃত্তির কথা ভক্তগণের মুখে শুনিয়া শ্রীরূপের মন ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। উক্ত কবিতার মর্ম একমাত্র দামোদর স্বরূপ জানিতেন। ভাবুক রসজ্ঞ কবিকুল-চূড়ামণি রূপের পক্ষে উক্ত কবিতার মর্ম ও রসমাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরি লাগিল না। তিনি সেই ভাব অনুসরণ করিয়া অল্পদিন পরেই উহার পরিপোষক এক শ্লোক স্বয়ং রচনা করিলেন এবং তালপত্রে লিখিয়া উহা চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রস্নানে গেলেন। সেই সময়েই চৈতন্যদেব শ্রীরূপের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কুঠিয়ায় আসিলেন এবং দৈবাধীন উক্ত পত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি সেই পত্র হস্তে লইলেন এবং উহা পাঠ করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার যে গোপনভাব এক দামোদর ছাড়া অন্যের অবিদিত, তাহা রূপ ঠিক-ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন এবং অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়া সুমধুর শ্লোক রচনা করিয়াছেন দেখিয়া অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া আসিয়া রূপ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রেমাবিষ্ট চৈতন্যদেব প্রথমে বাহ্যিক রোষের ভাব দেখাইয়া, পরে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার অন্তরের গোপন

---

১ রথের সময় চৈতন্যদেব 'কাব্যপ্রকাশ' নামক সংস্কৃত কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের মধুর রসাত্মক একটি শ্লোক পাঠ করিয়া নিজ অন্তরের ভাব শ্রীশ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেন। উক্ত শ্লোকের ভাব এই,—কোন সুন্দরী রমণী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, —যিনি তাহার মনোহরণ করিয়াছিলেন তিনিই এখন তাহার স্বামী এবং সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমস্তই এখনও বর্তমান; তথাপি যৌবনোন্মেষে যে স্থানে উভয়ের প্রথম মিলন হইয়াছিল, সেই স্থানেই মিলিবার জন্য চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত।

কথা জানিলে কিরূপে?" শ্রীরূপ সলজ্জভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার উচ্চ কবিত্বশক্তি ও রসজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিয়া সেই পত্র লইয়া গিয়া শ্লোকের ভালমন্দ দোষগুণ বিচার করিবার জন্য মহাপণ্ডিত দামোদর স্বরূপের হাতে দিলেন। আলঙ্কারিক-শিরোমণি দামোদর বিশেষভাবে রূপকৃত শ্লোকের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া উহার গভীর রস আস্বাদন করিলেন এবং খুব প্রশংসার সহিত চৈতন্যদেবকে বলিলেন, "শ্রীরূপ নিশ্চয় তোমার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ।"[১] বাস্তবিকই রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন এবং ভক্তিতত্ত্বে ও রস-শাস্ত্রে তাঁহার অসীম অধিকার জন্মিয়াছিল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-তত্ত্বব্যাখ্যা ও ভগবৎপ্রেমের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি—মধুর রসের উচ্চতম অবস্থাসমূহ প্রচারের জন্য চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীরূপ সংস্কৃত ভাষায় "বিদগ্ধ মাধব" ও "ললিত মাধব" নামক দুইখানি নাটক ইতিপূর্বে রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পুরীতে অবস্থানকালেও অবসর সময়ে কিছু কিছু লিখিতেন। চৈতন্যদেব নাটকের দোষগুণ বিচারের জন্য একদিন তাঁহার রচনা পণ্ডিত ভক্তগণকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীরূপের অত্যন্ত লজ্জাসঙ্কোচ বোধ হওয়াতে প্রথমে তিনি সম্মত না হইলেও, শেষে সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একদিন পড়িয়া শুনাইলেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ও গুরু-ইষ্ট নমস্কার ইত্যাদি পাঠ করিবামাত্র শ্রোতৃবৃন্দের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার ভাষা, ভাব ও কবিত্বশক্তি দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। রায় রামানন্দ, দামোদর স্বরূপ; সার্বভৌম মহা মহা পণ্ডিতগণের অন্তরেও শ্রীরূপের অদ্ভুত কবিত্বশক্তি, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধ দেখিয়া বিস্ময় জন্মিল; সকলে উচ্চপ্রশংসা করিলেন। তৎপরে চৈতন্যদেবের আদেশানুযায়ী, স্বরূপ দামোদর অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে নাটকের লক্ষণাদি বিচার করতঃ শ্রীরূপের কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিলে, সমবেত ভক্তগণের হৃদয়ে কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল।

চৈতন্যদেবের সমীপে, পুরীতে দশমাস অবস্থান করিয়া, তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধন-ভজনাদিতে শ্রীরূপের অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ এবং মানবজন্ম সার্থক বোধ হইল। এইসময়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া, ধর্ম-

---

১ ব্রজগোপীর ভাবে বিভোর চৈতন্যদেব রথের উপর জগন্নাথকে দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে মিলিতা গোপীগণের অন্তরের ভাব অনুভব করতঃ উক্ত কবিতা পাঠ করিতেন। শ্রীরূপ তাহা বুঝিতে পারিয়া তদনুযায়ী শ্লোক রচনা করেন। উক্ত শ্লোকের ভাব এই—শ্রীমতী রাধা বহু দিন বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে মিলিতা হইলেও, সেই বৃন্দাবন যমুনাপুলিনে মধুর মিলনের কথা স্মরণ করিয়া সখিগণের নিকট আবার সেইরূপ মিলনের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

সংস্থাপক সন্ন্যাসি-চূড়ামণি তাঁহাকে ভবিষ্যতে স্বীয় প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের প্রচারক ও সংরক্ষক আচার্যরূপে গঠন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে সনাতনের সহিত ব্রজভূমিতে বাস করিয়া ব্রজের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভগবদ্‌ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য নির্দেশ দিয়া পাঠাইলেন। তিনি সেই আদেশ অবনতমস্তকে গ্রহণ পূর্বক পুরী হইতে যাত্রা করিয়া গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিল। তাঁহার বিপুল বিষয়-বৈভবের কিয়দংশ আত্মীয়স্বজনকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দিলেন, কিয়দংশ দেবস্থান সাধু-সন্ন্যাসী গরীব-দুঃখীর সেবার্থে দান করিলেন এবং বাকী সমস্ত অনুপমের পুত্র শ্রীজীবকে[১] দিলেন। এইভাবে সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাট ষোল আনা মিটাইয়া দিয়া, বৃন্দাবনে মহাপ্রস্থান করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন দুই ভাই চৈতন্যদেবের আদেশানুযায়ী ব্রজে বাস করিয়া সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেমভক্তির বিমল স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে এইকালে অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শিক্ষাদান, সাধনভজনে উৎসাহ প্রদান ও ধর্মপ্রচারক আচার্যরূপে তাঁহাদের জীবন গঠনে চৈতন্যদেবের বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। প্রয়োজনানুযায়ী তিনি তাঁহাদিগকে কঠোর শাসন করিয়াও শিক্ষা দিতেন। হরিদাস নামক জনৈক বাঙালী সংসারত্যাগী বৈরাগী যুবক তাঁহার আশ্রিত হইয়া পুরীতে অবস্থান করিয়া সৎসঙ্গে সাধনভজনে কাল কাটাইতেছিলেন। হরিদাসের গলার স্বর খুব মিষ্ট ছিল এবং চমৎকার কীর্তন করিতেন। তাঁহার সুমধুর কীর্তন শুনিয়া চৈতন্যদেবের খুব আনন্দ হইত, এজন্য তিনি তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ভক্তগণের নিকট তাঁহার পরিচয় ছিল 'ছোট হরিদাস'। সেই বৎসর স্বরূপ দামোদরের পরমবন্ধু সুপণ্ডিত ভক্ত ভাগবতাচার্য চৈতন্যদেবের সঙ্গ করিবার অভিলাষে পুরীধামে আসিয়া কিছুকাল বাস করিতেছিলেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া একদিন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবার জন্য ভক্তিমান আচার্যের মনে সাধ হওয়াতে জিনিস-পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উত্তম সরু চাউল সংগ্রহ করিতে না পারায় আচার্যের মনে খুব দুঃখ জন্মিল, এবং সেই কথা ছোট হরিদাসের নিকট প্রকাশ করিলে তিনি পুরীর বিশিষ্ট ভক্ত শিখি মাহিতীর বাড়ী গিয়া তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী মাধবী দাসীর নিকট হইতে কিছু সুগন্ধি মিহি চাউল ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিলেন। শ্রীমতী মাধবী দাসী অতি উচ্চশ্রেণীর সাধিকা এবং চৈতন্য-দেবের প্রতি বিশেষ ভক্তিসম্পন্না ছিলেন। শোনা যায়, চৈতন্যদেবের উচ্চ অবস্থা,

---

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

প্রেমভক্তির তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম, পুরীতে মাত্র 'সাড়ে তিনজন' ছিলেন—স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাধবী দাসী।[১]

সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভাগবতাচার্য নির্দিষ্ট দিনে সেই সুগন্ধি চাউলের অন্ন ও নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছেন। যথাসময়ে চৈতন্যদেব ভিক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত। আচার্য অতিশয় ভক্তি সহকারে প্রিয়তম সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, এবং স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পরম আদরের সহিত খাওয়াইতে লাগিলেন। ভক্তপ্রদত্ত সেই সকল অতি উপাদেয় খাদ্য আস্বাদ করিয়া তাঁহার পরিতোষ জন্মিল, রান্নার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য, এমন সুন্দর সুগন্ধ মিহি চাউল কোথায় পাইলেন?" তদুত্তরে আচার্য জানাইলেন, "ছোট হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট গিয়া এই চাউল মাগিয়া লইয়া আসিয়াছেন।" চৈতন্যদেব চাউলের খুব প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণান্তে কুঠিয়ায় গিয়া সেবক গোবিন্দকে গম্ভীরভাবে আদেশ করিলেন, "অদ্য হইতে ছোট হরিদাসকে আর এখানে আসিতে দিও না।"

আদর্শ সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব নিজে যেমন সর্বতোভাবে কামিনী-কাঞ্চন হইতে দূরে অবস্থান করিতেন, ত্যাগি-ভক্তগণও সেই আদর্শ যাহাতে ঠিক ঠিক পালন করেন, সেই বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। কামিনী-কাঞ্চনের সম্পর্কই ত্যাগীর সর্বনাশের হেতু। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের সম্পর্ক পর্যন্ত ত্যাগীর পক্ষে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় মহা বিপজ্জনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ত্যাগী বৈরাগী হরিদাসের পক্ষে মাধবী দাসীর নিকট যাতায়াত ও কথাবার্তা, চৈতন্যদেবের নিকট অতিশয় গর্হিত অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইল, সেইজন্যই তিনি সকলের শিক্ষার উদ্দেশ্যে হরিদাসের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিলেন।

হরিদাস অপরাহ্নে অন্যান্য দিনের ন্যায় কীর্তন শুনাইতে আসিলেন; কিন্তু ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না। গোবিন্দের মুখে চৈতন্যদেবের কঠোর আদেশের কথা শুনিয়া মনঃপ্রাণ শিহরিয়া উঠিল; অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, কোন ফল হইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া হরিদাস ভগ্নহৃদয়ে বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং দরজায় খিল দিয়া ঘরের ভিতরে উপবাসী হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ঘটনা ভক্তগণের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা চৈতন্যদেবের নিকট গিয়া হরিদাসের অপরাধ জানিতে চাহিলেন। সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া গভীর ক্ষোভের সহিত—

---

১ প্রাচীন গণনার প্রণালীতে পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের পৃথকত্ব বোধের জন্য অর্ধেক লিখার প্রথা ছিল। সেইজন্যই তিনজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক,—সাড়ে তিনজন বলা হয়।

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনি জনার মন॥
ক্ষুদ্র জীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাইয়া বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

ভক্তগণ কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, "হরিদাসের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, এমন কর্ম আর কখনও করিবে না, এইবারের মত ক্ষমা করুন।" স্বরূপ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তগণ চৈতন্যদেবের মন নরম করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ফল লাভ হইল না।

"প্রভু কহে কভু নহে বশ মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
নিজ কার্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা॥"

তাঁহার ভাব দেখিয়া ভক্তগণ ভীতচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে ছোট হরিদাস তিন দিন পর্যন্ত ঘরের ভিতর উপবাসেই পড়িয়া রহিলেন,—স্নানাহার বন্ধ। ভক্তগণের চিত্তে অতিশয় দুঃখ জন্মিল; তাঁহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া শেষে সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী মহারাজকে চৈতন্যদেবের নিকট পাঠাইলেন। ভরসা,—পুরীজির কথায় তাঁহার মন নরম হইতে পারে, কারণ পুরীজিকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। চৈতন্যদেব পুরীজিকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া আসনে বসাইলেন এবং সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন প্রয়োজনবশতঃ আসিয়াছেন কিনা। পরমানন্দজী সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়া ছোট হরিদাসেব অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া চৈতন্যদেবের বদনমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি স্বামিজীকে বলিলেন, "আমার জন্য আপনাদের অসুবিধা হইতেছে। অনুমতি করিলে আমি গোবিন্দকে লইয়া আলালনাথে গিয়া বাস করিতে পারি; এখানে আপনারা সকলে ছোট হরিদাসকে লইয়া আনন্দে থাকিতে পারিবেন।"

"শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোঁসাই।
সব বৈষ্ণব লইয়া তুমি রহ এই ঠাঁই॥
মোরে আজ্ঞা দেও মুই যাই আলালনাথ।
একেলা রহিব তাহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥"

চৈতন্যদেব গোবিন্দকে ডাকিয়া আলালনাথ যাইতে উদ্যোগী হইলেন দেখিয়া পরমানন্দজীর প্রাণ উড়িয়া গেল; তখন সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে শান্ত ও নিবৃত্ত করিয়া স্বামিজী বিদায় লইলেন।

স্বরূপ উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা ভক্তগণসহ ছোট হরিদাসেব কুঠিয়াতে উপস্থিত হইলেন। সকলের প্রবোধবাক্য ও সান্ত্বনাতে তাঁহার মনে খুব ভরসা হওয়ায়, দরজা খুলিয়া হরিদাস ভক্তগণের সহিত কথাবার্তা বলিলেন, এবং স্নানাহার করিয়া তাঁহার শরীর সুস্থ হইল। সেই অবধি ছোট হরিদাস চৈতন্যদেবকে দূর হইতে দর্শন ও প্রণাম করিতেন,—বিশেষতঃ তিনি যখন সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেন সেই সময়ে। তিনি কিন্তু তাঁহার দিকে মোটেই লক্ষ্য করিতেন না। হরিদাসের ভরসা ছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, কথাবার্তা বলিবেন, কিন্তু অনেকদিন গত হইলেও চৈতন্যদেব তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিতে লাগিলেন। দেখিয়াও দেখেন না, সম্মুখে পড়িলেও পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান,—একটি কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা কবেন না। হবিদাসের নিজ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইল ; কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন গোপনে উত্তর-পশ্চিমের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরে নববর্ষ উপস্থিত। বৎসরের প্রথম দিনে চৈতন্যদেবের শুভ আশীর্বাদ গ্রহণ ও দর্শন-প্রণাম করিবার জন্য ভক্ত-সজ্জনগণ সমবেত হইয়াছেন। ছোট-বড়, নবীন-প্রাচীন সকল ভক্তগণকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে খুব আনন্দ হইয়াছে। আজ তাঁহার হৃদয়ের অপার করুণার উৎস শতধারে উচ্ছ্বসিত। ভক্তগণের নিজ নিজ অভিলাষানুযায়ী সকলেরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছেন। এমন সময়ে এই আনন্দেব মেলাতে আশ্রিত ভক্ত ছোট হরিদাসের জন্য সঞ্চিত স্নেহ-ভালবাসা অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়া পড়িল,—ব্যাকুল হইয়া চৈতন্যদেব বলিয়া উঠিলেন, "ছোট হরিদাস কোথায়? তাহাকে ডাকিয়া আন!" এতকাল পরে হরিদাসের প্রতি তাঁহার টান দেখিয়া ভক্তগণেব হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার করুণস্বরে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! ছোট হরিদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে পুরী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহার খবর কিছুই জানি না।" হরিদাসের নিরুদ্দেশ-বার্তা শুনিয়া চৈতন্যদেব মর্মাহত হইলেন।

ছোট হরিদাস পুরী হইতে বাহির হইয়া তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল এই মনোবম স্থানে অবস্থান করিয়া ভগবদ্‌ভজনে মনোনিবেশ করেন। অনিত্য সংসারে তাঁহার আর মোটেই স্পৃহা রহিল না ; চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া এখন জীবনধারণেও বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। প্রাচীন কাল হইতে তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণের স্বেচ্ছায় দেহবিসর্জনের প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। সর্পের

নির্মোক পরিত্যাগের ন্যায় তাঁহারা জীবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এই দেহকে অনায়াসে পরিত্যাগ করেন। হিমালয়ে, ত্রিবেণীতে, গোবর্ধনে, জগন্নাথের রথচক্রের নীচে, এইরূপে কেহ কেহ দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। দেহধারণরূপ বিড়ম্বনা অসহ্য হওয়ায় হরিদাস একদিন চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে নশ্বরদেহ বিসর্জন দিয়া বাঞ্ছিত গতি লাভ করিলেন।

হরিদাসের জন্য পুরীর ভক্তগণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন , এক বৎসর পরে তাঁহাদের নিকট তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ পেঁাছিলে সকলেই দুঃখিত হইলেন। চৈতন্যদেব 'স্বকর্মফলভাক্‌পুমান্‌' এই শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করিলেন এবং ত্যাগী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥" হরিদাসের ঘটনাতে সকলের এমন শিক্ষা হইল যে, "স্বপ্নেও ছাড়িল সব স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গগণের অনেকে অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বিচক্ষণ, বিচারশীল ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁহারা একদিকে যেমন অদ্ভুত ত্যাগি-তপস্বী, অন্যদিকে তেমনি লৌকিক ব্যবহারেও নিপুণ। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পুরী পর্যন্ত অনুগমন করেন এবং তদবধি পুরীতেই বাস করতঃ তাঁহার সেবা পরিচর্যাতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের অন্যতম, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পণ্ডিত দামোদর ঐরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক ছিলেন। দামোদরের সুমিষ্ট শাসনে পরমানন্দিত চৈতন্যদেব রহস্য করিয়া বলিতেন,—

"আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
আমার উপর সদা আছে বাক্যদণ্ড ধরি॥"

চাল-চলনে, কথাবার্তায়, যাহাতে কোন লোক চৈতন্যদেবের অকলঙ্ক শুভ্র চরিত্রে বিন্দুমাত্র কালিমা লেপন করিতে না পারে, সেজন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি দামোদর সর্বদা নজর রাখিতেন।

একসময় পুরীর একটি পিতৃহীন অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণবালক চৈতন্যদেবের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করে। প্রিয়দর্শন সুশীল বালকের ভক্তিভাব দেখিয়া তিনিও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। পিতৃহীন বালক আদর পাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইল এবং ঘন ঘন আসিতে লাগিল। দূরদর্শী দামোদর এইভাবে বালকের ঘন ঘন যাতায়াত এবং চৈতন্য-দেবের সহিত মেলামেশা পছন্দ করিতেন না। কিছুকাল পরে দামোদর যখন শুনিলেন, বালকের বিধবা মাতা ভক্তিমতী হইলেও, বয়স অল্প এবং পরমা সুন্দরী তখন তিনি আর চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। বালকের সঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশী 'পিরীত' দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র

নহে। তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় অকলঙ্ক চাঁদে কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া দামোদর চৈতন্যদেবকে বালকের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া স্পষ্টবক্তা দামোদর বলিলেন,—

"পণ্ডিত হইয়া কেনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী।
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর॥"

দামোদরের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও অসীম ভালবাসা দেখিয়া চৈতন্যদেবের অন্তর অতিশয় পুলকিত হইল। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক ভক্তগণের নিকট দামোদরের বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং বালকের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিলেন।

উক্ত ঘটনাতে চৈতন্যদেবের অন্তরে দামোদরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি কথার উদয় হইল। দামোদরের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এখানে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু নবদ্বীপে মিশ্র-পরিবারে যদি কিছু হয়? সেখানে ত এরূপ বিচক্ষণ অভিভাবক কেহ নাই! একদিন চৈতন্যদেব দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া স্বীয় অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং নবদ্বীপে গিয়া শচীদেবীর নিকটে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন।

দামোদরের জন্মস্থান নবদ্বীপে, মিশ্র-পরিবারের সন্নিকটে। ব্রাহ্মণসন্তান, অবিবাহিত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—বাল্যকাল হইতে দামোদর চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুগত, তাঁহার সঙ্গলাভের আশাতে পুরীবাসী হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়া অতীব কষ্টসাধ্য বুঝিলেও, চৈতন্যদেব শচীদেবীর কাছে গিয়া থাকার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—

"তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥

মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাহা করিও গমনে॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥"

চৈতন্যদেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ দামোদর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া শুভ-দিনে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে, চৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বিশেষ প্রীতি-ভালবাসা দেখাইলেন। জননীর উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিয়া, জননী ও ভক্তগণের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে, মহাপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন।

নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া দামোদর শচীদেবীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর চৈতন্যদেবের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। ইহাতে বৃদ্ধার প্রাণে অতিশয় আনন্দের সঞ্চার হইল। সন্ন্যাসী হইয়াও নিমাই তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন জানিয়া, শচী-মাতা স্নেহে-বাৎসল্যে বিগলিত হইলেন। দামোদর ক্রমে ক্রমে আচার্য অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া চৈতন্য-দেবের শুভেচ্ছা জানাইলেন; তাঁহাদের প্রতি সন্ন্যাসীর অহেতুক ভালবাসা দেখিয়া সকলেই অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন এবং সকৃতজ্ঞ চিত্তে দামোদরকে আদর-যত্ন করিলেন। চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী দামোদর অল্পদিনের মধ্যেই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ লইলেন এবং তাঁহার নির্দেশা-নুসারে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধান, সেবা-শুশ্রূষা,—সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইল। ভক্তগণও অনেক বিষয়ে তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইলেন।

"দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাঁহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥
প্রভুগণে যারে দেখে অল্প মর্যাদা লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্যাদা স্থাপন॥"

তদবধি দামোদর পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী হইলেও প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণসহ পুরীতে গমন করিযা চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হইতেন। তাঁহার মুখে নবদ্বীপের সমস্ত খবর পাইযা চৈতন্যদেবের মন নিশ্চিন্ত থাকিত এবং পুরী হইতে আসিয়া শচীদেবীকে চৈতন্যদেবের কুশল সমাচার, প্রণাম ও মাতৃভক্তির পরিচয় দিলে বৃদ্ধারও আনন্দের সীমা থাকিত না।

এইস্থানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় আমরা উল্লেখ করিতেছি। মিশ্র-পরিবারের পুরাতন সেবক ঈশানের পক্ষে বয়সের আধিক্য ও দেহের দুর্বলতা-

হেতু সমস্ত কাজ সুনির্বাহ করা যখন কঠিন হইয়াছিল, তখন চৈতন্যদেবের অনুমতি মতে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর নামক অল্পবয়স্ক নবদ্বীপবাসী জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণকুমার, ঈশানের সহকর্মিরূপে মিশ্রগৃহে সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বংশীবদন অতিশয় সৌভাগ্যবান ছিলেন, তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত,—দেবী স্বয়ং তাঁহাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন। বংশীবদন বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলেও তাঁহার মনঃপ্রাণ শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাতেই অর্পিত ছিল। মিশ্রভবনের সন্নিকটেই তাঁহার পৈতৃক বাস-ভিটা, কিন্তু তিনি বাড়ীঘরের কোন খোঁজখবর লইতেন না, তাঁহার ভাই-বন্ধুরাই ঐ সমস্ত বিষয়-আশয় দেখাশুনা করিতেন। এইরূপে বংশীবদন ঠাকুর সেবাধিকার পাইলেও, দামোদরই ছিলেন মিশ্রগৃহের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহার নির্দেশানুসারেই সকল কিছু সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হইত।

চৈতন্যদেবের উপদেশানুযায়ী, কিছুকাল ব্রজভূমে বাস করিবার পর সনাতনের মনে তাঁহাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইল। ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যও তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন, সেইজন্য শ্রীরূপ ও অনুপম পুরী যাত্রা করিয়াছেন খবর পাইয়া, তিনিও পুরী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। চৈতন্যদেব যে পথে কাশী হইয়া পুরী গিয়াছিলেন, সনাতনেরও সেই পথেই যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি দুর্গম রাস্তার দুঃখকষ্টের কথা গ্রাহ্য করিলেন না, খোঁজখবর লইয়া সেই পথেই যাত্রা করিলেন। মনে হয়, রাজবন্দী সনাতনের পক্ষে গৌড়ের রাস্তায় চলা নিরাপদও ছিল না। যাহাই হউক, ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে সুদীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রয়াগ ও কাশী দর্শনান্তর সনাতন ঝাড়খণ্ডে আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্গম রাস্তা, তাহার উপর ভিক্ষার অসুবিধা, অর্ধাশনে-অনশনে, বহু কষ্টে তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। বোধহয় সেইসময়ে ঋতুও অনুকূল ছিল না, তাই জলবায়ুর দোষে শরীরের রক্ত খারাপ হইয়া সর্বাঙ্গে ভয়ানক খোস-পাঁচড়া দেখা দিল! সুখে দুঃখে সমান নির্বিকার হইলেও সনাতন ভাবিলেন, এই অশুচি পচা দেহ লইয়া চৈতন্যদেবের নিকট যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরের নিকটেই তাঁহার বাস সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ সর্বদাই চলাফেরা করেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ ঘটিলেও মহা অকল্যাণ। কাজেই সেখানে যাওয়া এখন অনুচিত। আর এই অশুচি দেহ রাখাও ঠিক নহে চিন্তা করিয়া সনাতন ঠিক করিলেন, দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিভাবে দেহ বিসর্জন দিবেন ভাবিয়া তিনি ঠিক করিলেন। রথযাত্রা নিকটবর্তী;—পুরীতে গিয়া দূর হইতে একবার চৈতন্যদেবকে দর্শন করিবেন, তৎপরে রথের দিনে, রথোপবিষ্ট শ্রীশ্রী জগন্নাথের

মুখচন্দ্র দেখিতে দেখিতে রথচক্রের নীচেই শরীর ত্যাগ করিবেন। সংকল্প স্থির করিয়া সনাতন আনন্দিত মনে পথ চলিতে লাগিলেন, এবং যথা সময়ে পুরী পেঁৗছিয়া খোঁজ লইয়া হরিদাসের কুঠিয়াতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সনাতন আসিয়া ভক্তিভরে হরিদাসের চরণবন্দনা করিয়া চৈতন্যদেবের সংবাদ গ্রহণ করিলেন। সনাতনকে দেখিয়াই হরিদাসের অন্তরে অতীব উল্লাস জন্মিয়াছিল, পরে পরিচয় পাইয়া আনন্দের অবধি রহিল না। হরিদাস সনাতনকে বসাইয়া বলিলেন—চৈতন্যদেব মন্দিরে গিয়াছেন প্রভুকে দর্শন করিযা অল্পক্ষণের মধ্যেই এখানে আসিবেন। উদগ্রীব হইয়া সনাতন পথপানে নিরীক্ষণ করিতেছেন,—কিছুক্ষণ পরেই চিরআরাধ্য প্রাণপ্রিয় সেই মূর্তি নয়নগোচর হইল। দর্শন মাত্রই সনাতন বিহ্বল হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। হরিদাস অগ্রসর হইয়া গিয়া চৈতন্যদেবের চরণ-বন্দনা করিলে তিনি তাঁহাকে প্রেমালিংগনে আবন্ধ করিলেন। হরিদাস সনাতনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বলিলেন "সনাতন করে নমস্কার"। সনাতনেব নাম শুনিয়া তাঁহার চিত্ত চমৎকৃত হইল, উৎফুল্ল হৃদয়ে বাহু প্রসারিত করিয়া সনাতনকে আলিংগন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন—

> "সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
> পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥
> মোরে না ছুঁইবে প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
> একে নীচ জাতি অধম কণ্ডু-রসা গায়।"

চৈতন্যদেব সনাতনের নিষেধ শুনিলেন না, অগ্রসর হইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিজ দেহের রক্ত-পুঁজ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিল দেখিয়া সনাতনের অন্তরে ভীষণ দুঃখের সঞ্চার হওয়াতে, তিনি হায় হায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের অন্তরে পরম আনন্দের সঞ্চার হওয়ায় বদন-কমলে প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, মৃদুমধুর হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সনাতনকে স্বহস্তে টানিয়া লইয়া, নিজের পার্শ্বে বসাইযা চৈতন্যদেব কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—তৎপরে শ্রীরূপের কথায় বলিলেন,—তিনি পরমানন্দে এখানে দশমাস বাস করিয়া, অল্পদিন পূর্বে গৌড়ে যাত্রা করিয়াছেন। তৎপরে অনুপমের দেহত্যাগেব সংবাদ জানাইয়া তাঁহার অতুলনীয রাম-ভক্তিব খুব প্রশংসা করিলেন। শ্রীরূপের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় এবং পরম স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সহোদরের দেহত্যাগে সনাতনের অন্তর ব্যথিত হইলেও, চৈতন্যদেবের মুখে ভ্রাতাদের প্রশংসা শুনিয়া চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করিল। সনাতন অনুজের নিষ্ঠাভক্তির পরিচয় দিয়া বলিলেন, "বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথের প্রতি অনুপমের অপার ভক্তি ও সুদৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। করুণাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি

তাঁহার অন্তরের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা একসময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—'অনুপম, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভাবনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় কর,—তাহা হইলে তিন ভাই একসঙ্গে পরমানন্দে কাল কাটাইতে পারিব। ভাইদের মধ্যে পরস্পর পৃথক ইষ্ট হইলে অসুবিধা হয়।' আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনুপম কৃষ্ণভজন করিবেন বলিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অনুপমের চিত্ত তাহাতে প্রসন্ন হইল না, অন্তর হইতে রঘুনাথকে সরাইতে না পারিয়া, সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই আমাদের নিকটে আসিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতর ভাবে বলিলেন—'দাদা, আমার মস্তক রঘুনাথের পাদপদ্মে চিরকালের জন্য সমর্পিত হইয়া গিয়াছে, আর উপায় নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়াছে। আমায় ক্ষমা কর।' তাহার ইষ্টনিষ্ঠাতে আমরা পুলকিত হইলাম, এবং বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। তৎপরে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার অদ্ভুত ইষ্টনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলাম—'ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া একমনে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা চিরকাল কর, তাহাতে আমাদের পরম আনন্দ। শুধু তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমরা এরূপ কথা বলিয়াছিলাম'।"

সনাতনের মুখে অনুপমের ইষ্টনিষ্ঠার কথা শুনিয়া অতীব প্রীত হইয়া চৈতন্যদেব তাহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমিও এক সময়ে ঐরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য রামগতপ্রাণ ভক্তাগ্রণী মুরারি গুপ্তকে, রামকে ছাড়িয়া শ্যামকে ভজনা করিতে বলিয়াছিলাম। আমার কথা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া গুপ্ত রাম ছাড়িয়া কৃষ্ণভজনে চেষ্টা করিতে গিয়া সক্ষম হইলেন না। কাতর হইয়া মুরারি আমাকে অক্ষমতার বিষয় জানাইলে আমি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তির বিশেষ প্রশংসাপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান করি।" ভগবানের কৃপালাভ করিতে হইলে, এইরূপ একাঙ্গী ভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া চৈতন্যদেব সনাতনকে বলিলেন,—

"সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন॥
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥"

পুরীবাসী ভক্তগণের সঙ্গে চৈতন্যদেব সনাতনের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলে, তাঁহার ভক্তি-বৈরাগ্য ও চরিত্রমাধুর্যে সকলের অন্তর প্রসন্ন হইল। রূপ গোস্বামীর ন্যায় তিনিও হরিদাসের কুঠিয়াতেই বাস করিতেন, গোবিন্দ প্রত্যহ মহাপ্রসাদ পৌঁছাইয়া দিতেন। নিত্য মন্দির হইতে ফিরিয়া, চৈতন্যদেব

সেই কুঠিয়াতে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন এবং মন্দিরে তাঁহাকে যে সকল উত্তম উত্তম প্রসাদ দেওয়া হইত তাহা অতি ভক্তিভরে লইয়া আসিয়া পরমপ্রীতির সহিত উভয়কে উপহার দিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরচূড়ায় চক্র-দর্শনে, সমুদ্রস্নানে, মহাপ্রসাদ গ্রহণে এবং চৈতন্যদেব ও ভক্তগণের সঙ্গে সনাতন পুরীতে পরমানন্দে বাস করিলেও তিনি তাঁহার দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই।

শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহারের মর্যাদা রক্ষার জন্য রূপ, সনাতন ও হরিদাস প্রমুখ মহাপুরুষগণ স্বেচ্ছায় মন্দিরে যাইতেন না। তখনকার প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহারা মন্দিরপ্রবেশে অনধিকারী! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ে অসীম ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিলেও তাঁহারা কখনও প্রচলিত শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিধান লঙ্ঘনের চেষ্টা করেন নাই। চৈতন্যদেবও কোন সময়ে জোর করিয়া ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। নতুবা সেই সময়ে তাঁহার যেরূপ প্রবল প্রভাব ছিল, অনায়াসেই উক্ত ভক্তগণের জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিতেন। তিনি ঐরূপ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। দূর হইতে মন্দিরের চক্রদর্শন করিয়াই তাঁহারা ভাবে বিভোর হইতেন, প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসাইয়া ভূমে লুটাইতেন। সর্বত্রব্যাপক প্রভু কিভাবে তাঁহার পরমপ্রিয় এই সকল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি আমরা তাহা কিরূপে জানিব? বিনয়-নম্রতার প্রতিমূর্তি উক্ত ভক্তত্রয় চৈতন্যদেবের আবাসস্থলেও গমন করিতেন না, কারণ শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবক মণ্ডলী সেখানে যাতায়াত করেন,—পাছে তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ হয়।

রথচক্রের নীচে দেহত্যাগের ইচ্ছায় সনাতন রথযাত্রার অপেক্ষা করিতেছেন। অন্তরের অভিপ্রায় কাহারও নিকট বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। একদিন তাঁহার সহিত তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ চৈতন্যদেবের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইল এবং ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

> "সনাতন দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
> কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
> দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
> কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নাহি ভক্তি বিনে॥
> দেহত্যাগাদি এইসব তমো ধর্ম।
> তমোরজঃ-ধর্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম॥
> ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
> প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমী ভক্ত-বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেও না পারে মরিতে॥
গাঢ় অনুরাগে বিয়োগ না যাহে সহন।
তাতে অনুরাগী চাহে আপন মরণ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

সনাতনের চিত্ত চমৎকৃত হইল, তিনি স্বীয় অন্তরের দুর্বলতার কথা চৈতন্যদেবের নিকট প্রকাশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিশেষভাবে বুঝাইলেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। সনাতনকে এইরূপ হীনকার্য করিতে নিষেধ করিয়া সাধন-ভজনে উৎসাহিত করিলে পর, তিনি কাতর হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—

"নীচ অধম মুই পামর স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥"

তদুত্তরে,—

"প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য কেন তুমি চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে॥
তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥"

তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যে শান্ত করিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, "সনাতন, জননীর আদেশ অনুসারে আমি নীলাচলবাসী, এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। আমার বিশেষ ইচ্ছা, তোমরা দুই ভাই, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ব্রজভূমে থাকিয়া তাঁহার লীলাস্থান—লুপ্ততীর্থসকলের উদ্ধার কর, এবং শুষ্কজ্ঞানপ্রধান উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে উপাসনামার্গ ও শুদ্ধাভক্তির প্রচার করিয়া

ত্রিতাপতপ্ত দুর্বল মানুষকে শান্তিলাভের সুগম পন্থা নির্দেশ কর। বুদ্ধিমান ত্যাগী তোমরা দুই ভাই-ই এই মহৎকার্য সম্পাদনের যোগ্য পাত্র।

"ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহা এত কর্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥"

সনাতনের অন্তরের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল।—দেহ ত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের পাদপদ্মে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী পরমানন্দে পুরীবাস করিতে লাগিলেন। সনাতনের দেহে এখনও খোস-পাঁচড়া রহিয়াছে, চৈতন্যদেব কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দেখা হইবা মাত্রই তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করেন। নিজ দেহের ক্লেদ-রক্ত-পুঁজ চৈতন্যদেবের পবিত্রদেহ কলুষিত করে দেখিয়া সনাতনের দুঃখের সীমা থাকে না। এই ভয়ে তিনি সর্বদা দূরে সরিয়া থাকিতে চান; কিন্তু প্রেমিক সন্ন্যাসী তাঁহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করেন। আলিঙ্গন না করিবার জন্য, মোটেই স্পর্শ না করিবার জন্য সনাতন বার বার প্রার্থনা করেন, কত অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করেন; কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। বেশী কাকুতি-মিনতি করিলে বলেন, "তোমার দেহের রক্তপুঁজ তোমার নিকট ঘৃণ্য মনে হইলেও আমার উহাতে ঘৃণা হয় না, চন্দনের মত মনে হয়।"

নিরুপায় হইয়া সনাতন একদিন মনের দুঃখ জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয়ের অনেক আলোচনা হইল। পরিশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া জগদানন্দ তাঁহাকে পুরী ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। রথযাত্রার পরই বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া সনাতন চৈতন্যদেবকে সেই কথা নিবেদন করিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মুখে চলিয়া যাইবার কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত শীঘ্র ফিরিবার হেতু কি?" সনাতন অকপটে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আমি নীচ অস্পৃশ্য; এখানে থাকিয়া নানাভাবে অপরাধী হইতেছি; বিশেষতঃ আমার দেহের রক্তপুঁজ আপনার দেবদেহ অপবিত্র করে—ইহা আমার নিকট নিতান্তই অসহ্য। এই বিষয়ে জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারও মত,—আমার পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করাই ভাল।" চৈতন্যদেবের দেহ যাহাতে সুস্থ থাকে,—কোনরূপ পীড়া বা কষ্ট না হয় সেজন্য জগদানন্দ সর্বদা চেষ্টা

করিতেন বটে, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিতেন না;—কঠোর সন্ন্যাসী দেহ-সুখ উপেক্ষা করিয়াই চলিতেন।

ছোঁয়াচে রোগ খোসপাঁচড়াতে পাছে চৈতন্যদেবের কোমল দেহ না আক্রান্ত হয়, সেইজন্য সরলপ্রাণ জগদানন্দের অন্তরে ভয় হওয়া স্বাভাবিক। জগদানন্দের পরামর্শে সনাতন সত্বর চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া চৈতন্যদেব বিস্মিত হইলেন এবং পণ্ডিতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্বী হৈল।
তোমা সবাকারে উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তাঁর গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য।
তোমাকে উপদেশে বালকা ঐছে তার কার্য॥"

চৈতন্যদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য সনাতন করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, পণ্ডিতের কোন দোষ নাই, আমার অভিপ্রায় জানিয়াই তিনি যুক্তি দিয়াছেন। আমার পচা শরীরের ক্লেদ-রক্ত আপনার পবিত্র দেহে লাগার ভয়ে, আমি নিজেই শীঘ্র শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক।" সনাতনের বাক্যে সন্ন্যাসি-চূড়ামণি পরমহংস-আচার্যের বদনমণ্ডল অধিকতর উজ্জ্বল হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"দ্বৈত ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম যায়॥"

অদ্বয়-তত্ত্ববিদ্ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী আত্মারাম যোগীর নির্বিকল্প-সমাধিপরিশুদ্ধ মহান অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া হরিদাস ও সনাতন নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া চৈতন্যদেব পরে স্নেহস্বরে বলিলেন,—

"মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে আরও মহাসুখ পায়॥
লালামেধ্য বালকের চন্দন সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়॥"

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের মাধুর্য হরিদাস ও সনাতনকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আশ্রিতগণের প্রতি এই অতুলনীয় স্নেহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভগবানে সমর্পিত ভক্তগণের দেহ অতি পবিত্র।"

"অতি প্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥"

অতঃপর অতিশয় প্রীতির সহিত সনাতনকে সম্বোধন করিয়া,—

"প্রভু কহে সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥
এবৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে।
এবৎসর বৈ তোমারে আমি পাঠাইমু বৃন্দাবনে॥"

চৈতন্যদেবের স্নেহাশীর্বাদে, ভক্তগণের সেবাযত্নে এবং পুরীর জলবায়ুর গুণে সনাতনের দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় ও সবল হইল। চৈতন্যদেবের আদেশানুযায়ী তিনি পুরীতেই পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। রথযাত্রা নিকটবর্তী হইল। যথাসময়ে গৌড়ীয় ভক্তগণ বেণু-শিঙ্গা-খোল-করতালসহ কীর্তনরবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া আবার পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে পুরীর আনন্দস্রোত শতগুণে বর্ধিত হইল। প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি সকলেই সনাতনকে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে পুরীতে চৈতন্যদেবের আনন্দোৎসবের কথা, মহাসংকীর্তন, গুণ্ডিচা-মার্জন, রথাগ্রে কীর্তন-নর্তন, অপূর্ব উল্লাস, অত্যদ্ভুত প্রেম-প্রকাশ, দেহমনে অলৌকিক ভাববিকাশ এবং আরও নানাবিধ লীলা-রঙ্গরসের বিষয় সনাতন ভক্তগণের মুখে শুনিয়া বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। আবার সেই সকল ভাব প্রকটিত হইলে সনাতন যথাসাধ্য প্রাণ ভরিয়া সেই লীলারস আস্বাদন করিলেন। চাতুর্মাস্য অন্তে গৌড়ীয় ভক্তগণ নির্দিষ্ট সময়ে, চৈতন্যদেবের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। সেই অদ্ভুত প্রেমের দৃশ্য দেখিয়া সনাতনের প্রাণমন মোহিত হইল।

মন্দিরের পূজারি-সেবকগণের অঙ্গ, স্বীয় দেহের কিংবা ছায়ার স্পর্শে ভীত সনাতন সদাসর্বদা অতি সাবধানে চলাফেরা করিতেন। এমনকি ভয়ে মন্দিরের পুরোবর্তী রাজপথেও চলিতেন না। গ্রীষ্মকালে একদিন এক ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহে চৈতন্যদেব ভক্তগৃহে ভিক্ষাগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া, পূর্বাহ্ণেই সমুদ্রতীরবর্তী তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিলেন। সমুদ্রতটেই বাড়ী। সমুদ্রে স্নানান্তে সেই পরম রমণীয় স্থানে বসিয়া অনন্ত নীলাম্বুরাশির লহরী-লীলা দেখিয়া ও দেহপ্রাণ-সুশীতলকারী স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া তাঁহার অন্তরে বিশেষ হর্ষের সঞ্চার হইল। মধ্যাহ্নকালে ভাগ্যবান ভক্ত অতি পরিপাটী

সহকারে নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য সুসজ্জিত করিয়া অতিশয় ভক্তিভরে তাঁহাকে ভিক্ষাগ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন সনাতনের জন্য তাঁহার কোমল হৃদয় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। তাঁহার ব্যাকুলতা বুঝিয়া গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ সনাতনের জন্য লোক পাঠাইলেন, এবং অনেক অনুনয় করিয়া চৈতন্যদেবকে ভোজনে বসাইলেন। লোকমুখে প্রভুর বাণী কর্ণে পেঁীছিবামাত্র সনাতনও ছুটিয়া আসিলেন। পুরীর ভিতর দিয়া মন্দিরের সম্মুখ হইয়া যে ভাল রাস্তা আছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবক-স্পর্শ ভয়ে তিনি সে রাস্তায় গেলেন না। অপর একটি রাস্তা, পুরীর বাহিরে সমুদ্রের কিনারে কিনারে গিয়াছে —উহা সম্পূর্ণ বালুকাময়। গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপে সমুদ্র-সৈকত জ্বলন্ত পাবকতুল্য। সনাতন প্রভুর আদেশ পাইয়া সেই উত্তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়াই খালি পায়ে অতিদ্রুত হাঁটিয়া চলিলেন,— পাছে প্রভু তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন।

প্রভুগতচিত্ত সনাতন উত্তপ্ত বালুকার তাপ কিছুই টের পাইলেন না। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভোজনান্তে চৈতন্যদেব তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সনাতন উপস্থিত হইয়া চরণ-বন্দনা করিলে, তিনি পরম স্নেহে কাছে বসাইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলেন এবং পথশ্রম দূর হইলে সেবক গোবিন্দকে আদেশ করিয়া স্বীয় ভোজনাবশেষ প্রসাদ দেওয়াইলেন। সেই অমৃত পাইয়া সনাতনের আনন্দের সীমা রহিল না। সনাতনের প্রতি প্রভুর অপার স্নেহ করুণা দেখিয়া গৃহস্বামীরও অন্তর পুলকিত হইল।

ভোজনান্তে, সনাতন চৈতন্যদেবের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন রাস্তায় আসিয়াছ?" বিনীতভাবে সনাতন উত্তর করিলেন, "সমুদ্রের কিনারের রাস্তায়।" বিস্মিত হইয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, "এই আগুনের মত বালির উপরে চলিলে কিরূপে?" তদুত্তরে সনাতন বলিলেন, "কই তেমন গরম ত বোধ হয় নাই!" চৈতন্যদেব নজর করিয়া দেখিলেন, সনাতনের পায়ের নীচে খুব ফোস্কা পড়িয়াছে। তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং এই ভাবে দেহকে পীড়া দেওয়ায় বিশেষ অনুযোগের সহিত বলিলেন, "তুমি ভাল রাস্তায় আসিলে না কেন?" আসিবার সময় সনাতন এমন তদ্‌গতচিত্ত ছিলেন যে, শরীরের কষ্ট তাঁহার অনুভব হয় নাই। আসিবার পর প্রভুর অপার স্নেহ-ব্যবহারে চিত্ত আনন্দে ভরপুর ছিল; এখন আবার তাঁহার দেহের প্রতি প্রভুর মমতা দেখিয়া অন্তর গলিয়া গেল। সনাতন অতিশয় বিনয়সহকারে যখন জানাইলেন যে সেবকগণের অঙ্গস্পর্শভয়ে তিনি ভাল রাস্তায় আসিতে সাহস করেন নাই তখন চৈতন্য-দেবের মন খুবই প্রফুল্ল হইল। সনাতন নিজ দেহকে উপেক্ষা করিয়াও শাস্ত্রবিধি পালনে যত্নবান, দেখিয়া খুশী হইয়া তাঁহার খুব প্রশংসা করিলেন।

"যদ্যপিও হও তুমি জগতপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেবগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্যাদা-রক্ষণ।
মর্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হৈল মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করিবে কোন জন॥"

চৈতন্যদেব সনাতনকে এক বৎসর নিকটে রাখিয়া, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া, সাধন-ভজন করাইয়া তৎপ্রবর্তিত ভক্তিমার্গের আচার্যরূপে তাঁহাকে গঠন করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে নিজেদের জীবন যাপন ও কাজকর্ম পরিচালনা করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিয়া ব্রজভূমে পাঠাইয়া দিলেন। চৈতন্যদেবের শুভাশীর্বাদ ও চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া সনাতন ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় লইলে, প্রেমাশ্রুতে সকলেরই বক্ষ ভাসিয়া গেল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সনাতন শুভদিনে সেই পূর্ব পথেই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ফিরিবার সময় পূর্বের ন্যায় কষ্ট হইল না। পথে পথে তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে সনাতন যথা সময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুকাল পরে শ্রীরূপও গৌড়ের কার্য শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পর দুই ভাই বাকী জীবন ব্রজমণ্ডলেই থাকিয়া চৈতন্যদেবের আদেশ ও শিক্ষানুযায়ী প্রেম-ভক্তি-মার্গের প্রচার করিয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখিয়াছেন—

"আসি সিন্ধু-নদীতীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি কত তীর্থ হয়॥
দুই ভ্রাতার প্রেম ফলে সকলি ভাসিল।
প্রেম ফলাস্বাদে লোকে উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রচারিলা দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্র দৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার
বৃন্দাবনে করিল শ্রীমূর্তির সেবার প্রচার॥"

জননী-জন্মভূমির সন্দর্শন উপলক্ষে শান্তিপুরে অবস্থানকালে চৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথ দাসের সাক্ষাতের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। চৈতন্য-

দেবের উপদেশে রঘুনাথ তখন বাহ্যিক বৈরাগ্য ছাড়িয়া অনাসক্তভাবে সংসার করিতে থাকেন। ফলতঃ তাঁহার ভাবের পরিবর্তন ও বিষয়কর্মে মনোযোগ দেখিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মনে খুব আনন্দ হয় এবং নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহারা রঘুনাথকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে আর নিষেধ করিতেন না। পাহারা দিবারও প্রয়োজন রহিল না। বিষয়ে আসক্তিহীন রঘুনাথ বাহ্যতঃ বিষয়কর্মে লিপ্ত হইলেও তাঁহার মনঃপ্রাণ যোল আনাই ঈশ্বরের দিকেই নিবন্ধ। গুরুজন-সাধুভক্তের সেবা, গরীব-দুঃখীর উপকার, নানাবিধ সৎকর্ম ও সাধন-ভজনে ভালভাবে দিন কাটাইলেও তাঁহার অন্তর সংসার-পাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিল। তাই সুযোগ পাইলেই নিকটবর্তী ভক্তগণের সঙ্গে মিলিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে ও ভজনে চিত্তের জ্বালা উপশম করিতেন।

প্রভুপাদ নিত্যানন্দ তখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করতঃ চৈতন্যদেবের আদেশ অনুযায়ী আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ ও ভক্তি-উপাসনা প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অত্যদ্ভুত ধর্মপ্রচারের ফলে বঙ্গদেশে অভূতপূর্ব ভগবদ্ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল,—সমস্ত দেশ হরিধ্বনিতে ও নাম-সংকীর্তনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সংবাদ আমরা পূর্বেই দিয়াছি। নিত্যানন্দ এইভাবে ধর্মপ্রচার ও পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় পানিহাটীর বিশিষ্ট ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাসংকীর্তন, নৃত্যগীত-উৎসবে ঐ স্থান আনন্দক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ ব্যাকুল হইলেন এবং অভিভাবকগণের অনুমতি লইয়া পানিহাটী গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে এক বিশাল বটবৃক্ষের তলায় প্রভুপাদ প্রেমানন্দে বিভোর, এমন সময়ে রঘুনাথ উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। দয়াল নিতাই তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন এবং স্নেহস্বরে বলিলেন, "চোর! তুমি বাড়ী ছাড়িয়া বারবার পলাইয়া আইস, আর ভক্তসঙ্গে প্রেমাস্বাদ কর। সেজন্য এবার তোমাকে দণ্ড দিব।" রঘুনাথ নিজেকে কৃতার্থ মানিয়া অবনত মস্তকে হৃষ্টমনে দণ্ডপ্রার্থনা করিলে, প্রভুর হুকুম হইল, "সমস্ত ভক্তগণকে একত্র করিয়া এখানে দই-চিড়ার মহোৎসব কর,—এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।" প্রভুর অপরিসীম অনুগ্রহ দেখিয়া রঘুনাথের চিত্ত গলিয়া গেল। তিনি তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া আদেশ শিরোধার্য করিলেন এবং পরম পুলকিত হইয়া উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ বাড়ীতে খবর দিয়া প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার, লোকজন আনাইলেন। নিত্যানন্দের অভিপ্রায়ানুসারে চারিদিকে ভক্তগণের নিকট লোকমারফত নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইল। উৎকৃষ্ট দই, চিড়া, কলা, চিনি, ক্ষীর, সন্দেশের প্রচুর আয়োজন করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সকল ভক্তগণ মিলিত হইলেন। গঙ্গাতীরে সেই বটবৃক্ষের তলায় মহোৎসব আরম্ভ হইল। প্রেমোন্মত্ত নিতাই চৈতন্য-

দেবকে স্মরণ করিয়া নৃত্য-গীত-কীর্তন আরম্ভ করিলেন, ভাবোন্মত্ত ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন। সংকীর্তনের কলরোলে গঙ্গাবক্ষ কম্পিত, গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল,—সেই সুরধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিক হইতে বহু লোক ছুটিয়া আসিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া সেই নামমহাযজ্ঞে যোগ দিল। প্রেমদাতা নিতাইয়ের উচ্চনীচ ভেদ নাই, ধনীদরিদ্র বিচার নাই - দীন-দুঃখী, আতুর-কাঙ্গাল সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিতেছেন। যে-ই আসিতেছে তাঁহার অহেতুক কৃপালাভ করিয়া সে-ই ধন্য হইতেছে। ভাবুক ভক্তগণ ভাবে-প্রেমে বিভোর হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। গঙ্গা-তীরে এক অপূর্ব দৃশ্য, যেন প্রেমের হাট বসিয়াছে।

দই-চিড়ার বিরাট ভোগ ভগবানকে নিবেদন করা হইল। নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তগণ ও সমবেত জনমণ্ডলীকে রঘুনাথ ভক্তিভরে পরম সমাদরে সেই প্রসাদ গ্রহণ করাইয়া, নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন। কেহই সেই অমৃতলাভে বঞ্চিত হইল না, এমনকি মহোৎসবের মেলাতে বেচিবার জন্য অনেক দোকানী-পসারী নানা খাদ্য-মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিয়াছিল,—রঘুনাথ উপযুক্ত মূল্যে তাহাও সব খরিদ করিয়া বিতরণ করিলেন, এবং ঐ সকল দোকানদারদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া প্রসাদ খাওয়াইলেন। রঘুনাথের ভক্তিভাবে ও মহামহোৎসবের সাফল্যে ভক্তগণসহ নিত্যানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। উৎসব শেষে রঘুনাথ সমাগত সাধুভক্ত-ব্রাহ্মণ-সজ্জনদিগকে যথোপযুক্ত প্রণামী দিয়া সম্মানিত করিলেন। রাঘবপণ্ডিতের হস্তে তাঁহার পূজিত শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য যথেষ্ট ধন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার জন্য তাঁহার সেবকের নিকটেও কিছু অর্থ প্রদান করিয়া রঘুনাথ কৃতার্থ হইলেন। সাড়ম্বরে অথচ সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে, কলিকালের মহাযজ্ঞ নাম-সংকীর্তন-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইলে নিত্যানন্দ ও ভক্তগণের স্নেহাশিস মস্তকে ধারণ করিয়া পরম পুলকিতচিত্তে রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। সেই মহাযজ্ঞের পুণ্যস্মৃতিতে এখনও প্রতিবৎসর, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, পানিহাটীতে উৎসব হয়,—'দণ্ড-মহোৎসব' নামে তাহা সুপরিচিত।

গৃহে ফিরিবার পর রঘুনাথের অন্তরের বৈরাগ্য আবার প্রবলাকার ধারণ করিল। তিনি বিষয়কর্ম একবারে পরিত্যাগ করিলেন। এখন রঘুনাথ আর ভিতরবাটীতে প্রবেশ করেন না, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপেই বাস করেন, - আর দিবারাত্র ভগবচ্চিন্তায় বিভোর। তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আত্মীয়স্বজনের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল। রঘুনাথের মাতা অধীর হইয়া পুত্রকে আবার পাহারাতে আটক রাখিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে, রঘুনাথের পিতা খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥"

মায়ের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না,—একমাত্র পুত্র পাছে চোখের আড়াল হয়, ঘর হইতে পলাইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি বিশেষ ব্যাকুলা হইলে, অগত্যা আবার রঘুনাথকে দিবারাত্র পাহারা দেওয়ার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইল।

রঘুনাথের বাপ-জ্যেঠা যে জমিদারির মালিক, তাহা পূর্বে এক মুসলমান জমিদারের সম্পত্তি ছিল। তিনি নিয়মমত সরকারী রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায়, উহা হস্তান্তর হয়। রঘুনাথের জ্যেঠা হিরণ্য ও পিতা গোবর্ধন সেই বিস্তীর্ণ জমিদারি নবাবের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া সরকারী রাজস্ব নিয়মিতভাবে জমা দিয়া বহু উপসত্ত্ব ভোগ করিতেন। সপ্তগ্রাম তখন শুধু বাংলার নয় সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। দেশ-বিদেশের সওদাগর-গণের কুঠিতে, আড়তে, বাণিজ্যতরীতে, সপ্তগ্রামবন্দর সুশোভিত ছিল। তাহা ছাড়াও সপ্তগ্রাম চাক্‌লা (এলাকা--মহল) বহু বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের অনেকাংশ সপ্তগ্রাম চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই বিস্তীর্ণ জমিদারি, সুদক্ষভাবে পরিচালনা করিয়া হিরণ্য ও গোবর্ধন রাজৈশ্বর্য ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সৎকীর্তি, পূজা-ব্রত-দান-পুণ্যকর্মাদির সীমা ছিল না। তৎকালে প্রবাদ রটিয়াছিল, হিরণ্য-গোবর্ধনের দান যে ব্রাহ্মণ পায় নাই সে ব্রাহ্মণই নহে। ধনীলোকের শত্রুও থাকে অনেক। হিরণ্য-গোবর্ধনের শত্রুরা অনিষ্টাচরণের জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। শেষে তাহারা সপ্তগ্রাম চাক্‌লার পূর্বমালিক সেই মুসলমান জমিদারের সহিত মিলিত হইয়া নবাবের নিকট হিরণ্য-গোবর্ধনের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। অভিযোগের হেতু, হিরণ্য-গোবর্ধন প্রজাদের নিকট হইতে বহু বেশি খাজনা আদায় করিতেছেন, অথচ সরকারী রাজস্ব সেই পূর্বের পরিমাণই ঠিক আছে। নবাব প্রথমে ঐ সকল কথায় তেমন মনোযোগী না হইলেও শত্রুগণের নানারূপ চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের ফলে হিরণ্য-গোবর্ধনের উপর তাঁহার মন বিরূপ হইতে থাকে। নবাব তাঁহাদিগকে জানাইলেন, "শুনিতেছি, তোমরা প্রজার নিকট হইতে খাজনা বেশী আদায় করিয়া আয়ের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়াছ। কাজেই সরকারী রাজস্বও বেশী দিতে হইবে।" হিরণ্য-গোবর্ধন প্রতিবাদ করিলেন—বেশী রাজস্ব দিতে সম্মত

হইলেন না। উভয়পক্ষে বাদানুবাদ হইয়া মনোমালিন্য হইল, ক্রমে বিবাদ বাড়িয়া চরমে উঠিল। নবাব তাঁহাদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত ও দুই ভাইকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ রাখিবার হুকুম দিলেন। নবাবসৈন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার জন্য ধাবিত হইল,—তাঁহাদের বাসভবন অবরোধ করিলে দুই ভাই পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পাইয়া সেনাপতির আদেশমত সৈন্যগণ অবশেষে রঘুনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল।

বাপ-জ্যেঠার সন্ধান দিবার জন্য সেনাপতি রঘুনাথকে নানাপ্রকার অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। শান্ত নির্ভীক রঘুনাথ, বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া, আপনার ভাবে একাগ্রমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, প্রভূত ক্ষমতাশালী জনপ্রিয় ভূম্যধিকারী কায়স্থ-সন্তান হিরণ্য-গোবর্ধনের একমাত্র বংশধরকে মুখে নানা-প্রকার ভয় দেখাইলেও, পরিণাম ভাল হইবে না ভাবিয়া কোন প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে সেনাপতির সাহস হইল না। রঘুনাথের আকৃতি-প্রকৃতি চালচলন ব্যবহার দেখিয়া এবং সুবিনীত কথা শুনিয়া সেই বয়স্ক মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষের অন্তর মোহিত হইল। তিনি রঘুনাথকে পুত্রবৎ স্নেহবাৎসল্য প্রদর্শন করিয়া কৌশলে স্বকার্য উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। রঘুনাথও তাঁহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার মন নরম করিয়া বাপ-জ্যেঠার উপর আক্রোশ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই পক্ষই অনেক শান্ত হইলে আপসের প্রস্তাব হইল। রঘুনাথ খবর দিয়া বাপ-জ্যেঠাকে আনাইলেন; তাঁহার মধ্যস্থতায় অতি সুন্দরভাবে উভয়পক্ষের বিবাদের সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গেল। হিরণ্য সপ্তগ্রামের জমিদার রহিলেন।

রঘুনাথের জন্যই এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়াতে, তাঁহার প্রতি বাপ-মা, জ্যেঠা-জ্যেঠি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। রঘুনাথ মনে মনে বিপদ গণিলেন, তাঁহার পক্ষে উহা অসহ্য। তিনি অতি শীঘ্র সংসার-সম্পর্ক ছেদন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চৈতন্য-দেব সেই সময়ে পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। রঘুনাথ খবর পাইলেন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে শীঘ্রই পুরী যাত্রা করিবেন। এই সংবাদে তাঁহার মন অধিক উতলা হইল এবং পুরীতে গিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভের জন্য অধীর হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। তখনও বহির্বাটীতে চন্ডীমন্ডপে তাঁহার বাসস্থান পাহারা দিবার জন্য প্রহরী মোতায়েন আছে। ভগবৎকৃপায় হঠাৎ একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল। রঘুনাথের কুলগুরুর গৃহদেবতার পূজকের অভাব হওয়ায় ভোরবেলাই তাঁহারা রঘুনাথের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—পূজারী ঠিক করিয়া দেওয়ার

জন্য। পূজক ঠিক করার জন্য রঘুনাথ তদ্দণ্ডেই বাহির হইয়া চলিলেন। অতি প্রত্যূষকাল,—প্রহরী তাঁহার অনুগমন করিল না। রঘুনাথ পূজক ব্রাহ্মণ ঠিক করিয়া, যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়া, আর ঘরে না ফিরিয়া পুরীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিলেন। প্রকাশ্য পথে চলিলে ধরা পড়িবার ভয়, সেজন্য পথ ছাড়িয়া লোকালয় হইতে দূরে দূরে বিপথে ছুটিলেন। আহারনিদ্রার খেয়াল নাই, বিশ্রামের অবসর নাই, পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত—ছুটিয়া চলিয়াছেন। এইভাবে রাজবিভবে লালিতপালিত রঘুনাথ, অর্ধাশনে-অনশনে পথ চলিয়া বারো দিনে প্রায় আড়াইশত মাইল অতিক্রম করিয়া পুরীতে উপস্থিত হইলেন। পুরীতে পেঁাছিয়াই রঘুনাথ চৈতন্যদেবের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন,—তাঁহার জীবন সার্থক বোধ হইল।

এদিকে রঘুনাথের গৃহে আত্মীয়স্বজনগণ মনে করিতেছিলেন—তিনি যে কাজে গিয়াছেন তজ্জন্যই দেরি হইতেছে, পূজার সুব্যবস্থা করিয়া একটু পরেই ফিরিবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন এবং খোঁজ করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খোঁজ আর পাওয়া গেল না, চারিদিকে লোক ছুটিল, কিন্তু কোথাও কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। সেই সময়ে গৌড়ীয় ভক্তগণ দলবদ্ধ হইয়া কীর্তন করিতে করিতে পুরী যাইতেছিলেন। হিরণ্যগোবর্ধন মনে করিলেন রঘুনাথ অবশ্যই ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইবেন; কিন্তু দেখা গেল তিনি তাঁহাদের নিকটেও যান নাই। তাঁহারা রঘুনাথের কোন সন্ধান জানেন না। রঘুনাথের পরিবারবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া ভীষণ উদ্বেগে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

রঘুনাথ পুরী পেঁাছিলে, তাঁহাকে পাইয়া চৈতন্যদেবের খুব আনন্দ হইল। কিন্তু তাঁহার পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষীণ, দুর্বল দেহ দেখিয়া তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি রঘুনাথকে দামোদর স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে তুমি রঘুনাথকে নিজ শিষ্য ও ভৃত্য মনে করিবে এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ত্যাগ-বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন গঠন করিতে ও প্রেম-ভক্তিমার্গে ভগবানের দিকে তাহাকে দিনে দিনে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিবে—এই আমার অনুরোধ।" স্বরূপ অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন,—সেইদিন হইতে রঘুনাথের পরিচয় হইল 'স্বরূপের রঘু'। তৎপরে স্বীয় সেবককে সম্বোধনপূর্বক চৈতন্যদেব বলিলেন, "দেখ গোবিন্দ রঘুনাথের দেহ বড় দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; কিছুদিন তার খাওয়া-থাকার যত্ন করিও, যাহাতে শরীর শীঘ্রই সুস্থ ও সবল হইতে পারে।"

পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভে রঘুনাথের জীবনে নূতন আশার সঞ্চার হইল,—তিনি ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং স্বরূপের বিশেষ অনুগত ও আশ্রিত থাকিয়া তাঁহার শিক্ষানুযায়ী দৈনন্দিন

জীবনযাত্রাপ্রণালী নিত্যকর্ম-ভোজন-ভজন সমস্তই সুনিয়ন্ত্রিত করিতে যত্নশীল হইলেন। চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী গোবিন্দ রঘুনাথের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু পাঁচ দিন পরেই রঘুনাথ আর তাঁহার নিকট হইতে আহার্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। রঘুনাথ আপন কুটীরে সমস্ত-দিন ভগবদ্‌ভজনে কাটাইয়া রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইতেন এবং সেইখানে বসিয়া কিছুক্ষণ ভজন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথের রাজবেশ-পুষ্পাঞ্জলি দর্শনান্তর সিংহদ্বারের পাশে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিতেন। পুরীর কোন কোন ত্যাগী সংসারবিমুখ মহাত্মা, ভিক্ষার জন্য কোথাও না গিয়া, এইরূপে সিংহদ্বারের পাশে দণ্ডায়মান থাকেন। সদ্‌গৃহস্থ যাত্রী ও পাণ্ডাগণ এইসকল সাধুসন্তকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেন। এই প্রথা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। রঘুনাথ এইপ্রকার জীবনযাপন আরম্ভ করিলে গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে জানাইলেন। রঘুনাথ আহারের সুব্যবস্থা ছাড়িয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া চৈতন্যদেবের মন প্রসন্ন হইল। তিনি তাঁহার এইরূপ আচরণের খুব প্রশংসা করিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "সর্বদা ভগবচ্চিন্তা এবং কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ, ইহাই ঠিক ঠিক ত্যাগীর ধর্ম; আর প্রকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্য ভিন্ন ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, বিড়ম্বনাই সার হয়।"

রঘুনাথ চৈতন্যদেবকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করিয়া চলিতেন, তাঁহার সম্মুখে এমন সঙ্কোচের সহিত অবস্থান করিতেন যে বিশেষ কথাবার্তা বলিতেও সাহসী হইতেন না। নিজের সাধনভজন, জীবনযাপন সম্বন্ধে, তাঁহার শ্রীমুখের বাণী ও অভিপ্রায় শুনিবার জন্য রঘুনাথের অন্তরে প্রবল আগ্রহ হওয়ায় সেই আকাঙ্ক্ষা স্বরূপের কাছে নিবেদন করিলেন। একদিন, চৈতন্যদেবের নিকট দামোদর ও রঘুনাথ দুইজনেই উপস্থিত। সুযোগ বুঝিয়া দামোদর স্বরূপ রঘুনাথের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলে চৈতন্যদেব হাসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন, "এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব স্বরূপ যতদূর জানেন আমি তত জানি না , তুমি স্বরূপের নিকটেই শিক্ষা কর, ক্রমে ক্রমে সমস্তই জানিতে পারিবে।" দামোদর স্বরূপ রঘুনাথকে ইঙ্গিত করিলে তাঁহার সাহস হইল,—তখন রঘুনাথ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিবার জন্য অতিশয় কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিলে চৈতন্যদেবের অন্তর প্রসন্ন হইল। তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে[১] গ্রাম্যবার্তা না কহিবে[২]।
ভাল না খাইবে[৩] আর ভাল না পরিবে[৪]॥
অমানী মানদ[৫] কৃষ্ণনাম সদা লবে[৬]।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা[৭] মানসে করিবে[৮]॥"*

কঠোর বৈরাগী রঘুনাথ, চৈতন্যদেবের মহামূল্য উপদেশসকল কায়-মনোবাক্যে পালন করিতে লাগিলেন। রথযাত্রা নিকটবর্তী হইলে গৌড়ের ভক্তগণ পুরী আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে আবার মিলিত হইলেন,—আবার প্রেমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। ভক্তগণসঙ্গে চৈতন্যদেবের মিলন, নৃত্যগীত-কীর্তন, মহোৎসব, মহাপ্রসাদ গ্রহণাদি দেখিয়া রঘুনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণ রঘুনাথকে দেখিয়া এবং তাঁহার অহর্নিশ ধ্যান-ধারণা, ভজন-সাধন ও কঠোর ত্যাগ-

* এই বাক্যটি চৈতন্যদেবের শিক্ষার সারসংক্ষেপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের কৃপালাভের আশায় যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভজনে মনোনিবেশ করিতে চান, ইহা তাঁহাদের রক্ষাকবচ। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুযায়ী ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা গেল। গ্রাম্যকথা—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন নিয়াই সাধারণ লোক জীবনযাপন করে এবং ঐ সকল বিষয়ই সর্বদা আলোচনা করে। এই আলোচনাতে যোগ দিলে—(১) শুনিলে কিংবা (২) বলিলে মন বহির্মুখ হয়, ভোগতৃষ্ণা বাড়ে। এজন্য ভজনশীলের পক্ষে এইসব কথাবার্তা বলা উচিত নহে। (৩) ভাল খাওয়া–পরার দিকে মন থাকিলে চিত্ত একাগ্র হয় না। সর্বদা ঐজন্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা থাকে। উত্তম খাবার খাইলে রজোগুণের বৃদ্ধি ও কামক্রোধাদির বেগ বেশী হয়। (৪) উত্তম পোশাক–পরিচ্ছদ ধারণ করিলে ভোগবিলাসে মন যায়, অভিমান–অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়াই ভজনের অনুকূল। (৫) অহঙ্কার-অভিমানই জীবের ভববন্ধন-রজ্জু; এই পাশ ছেদন করিবার একমাত্র উপায় নিজেকে অজ্ঞানতিমিরাবৃত অন্ধ ভবার্ণবে নিমজ্জিত সর্বাপেক্ষা দীনহীন জানিয়া সকলকে, এমনকি নগণ্য ব্যক্তিকেও সম্মান প্রদর্শন করা। "সর্ব জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' (৬) কৃষ্ণনাম বা পরমেশ্বরের যে কোন নাম ইষ্টমন্ত্ররূপে জপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া তাঁহাতে ভক্তিপ্রেম জন্মে, তাঁহার কৃপালাভ হয়। (৭) ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা—সশক্তিক স্বীয় ইষ্টদেবকে গুরু ও শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী তাঁহার চিন্ময়ধামে সেবাই ভক্তের কাম্য। ঐশ্বর্যলেশবিহীন, মাধুর্যপরিপূর্ণ চিন্ময় ভগবদ্ধামই ব্রজ। (৮) মানসে করিবে—শান্ত–দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই পঞ্চরসের মধ্যে যেটি তাঁহার ভাবানুকূল, তদনুযায়ী ইষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হইয়া ভক্ত নিজের বাহ্যিক দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, স্বীয় স্বরূপ অন্তরাত্মা চিদংশকে, সেই সম্পর্কানুরূপ মূর্তবিগ্রহ বলিয়া ভাবনা করিবেন এবং তদাশ্রয়ে মনে মনে ইষ্টের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপায় এই মায়িক প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া স্বীয় ভাগবতী তনুতে চিন্ময় নিত্যলীলাধামে প্রবিষ্ট হইবেন।

বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের যাত্রাপথের ব্যয়-নির্বাহকারী শিবানন্দ সেনের নিকট রঘুনাথ জানিতে পারিলেন, তাঁহার পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত। তাঁহারা খোঁজ করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহারা অতিশয় দুঃখে কাল কাটাইতেছেন। মা-বাপের দুঃখের কাহিনী শুনিয়াও রঘুনাথের চিত্তে বিক্ষেপ জন্মিল না; তিনি পরম শান্তিধাম পুরীতে থাকিয়াই শ্রীভগবানের পাদপদ্মচিন্তায় এবং ভজনে নিরত রহিলেন। গুণ্ডিচাবাড়ী-মার্জন, রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্বে ভক্তগণ সহ চৈতন্যদেব পূর্ব-পূর্ব বৎসরের ন্যায় আনন্দ করিলেন। সেই সকল শুভদিনে তাঁহার অত্যদ্ভুত ভাবাবেশ ও অপূর্বলীলা দেখিয়া রঘুনাথ নিজের শ্রবণ, নয়ন, প্রাণ ও মন সার্থক বোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আনন্দোৎসবের মধ্যে চারিমাস কাটিয়া গেল; গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় লইয়া স্বদেশে ফিরিলেন। শিবানন্দ গৃহে পৌঁছিবার পরেই রঘুনাথের খবর লইবার জন্য হিরণ্য-গোবর্ধনের লোক আসিয়া উপস্থিত। রঘুনাথের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে কিনা—ইত্যাদি সঠিক খবর জানিবার জন্য অতিশয় মিনতি করিয়া তাঁহাকে পত্র দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া শিবানন্দের অন্তর বিগলিত হইল। লোকের নিকট তিনি রঘুনাথের সমস্ত খবর ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন। শিবানন্দ জানাইলেন, পুরীধামে রঘুনাথের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইয়াছে। তিনি ভালই আছেন এবং চৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে বাস করিয়া ভগবদ্ভজনে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার অন্তরে কঠোর বৈরাগ্য গৃহে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। গভীর রাত্রে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথের রাজবেশ-পুষ্পাঞ্জলি দর্শনান্তে সিংহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হন; সেখানে অযাচিত ভাবে লোকে যে মহাপ্রসাদ দেয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন।

"রাত্রিদিন করে তিঁহো নাম সংকীর্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্বণ॥"

যাহা হউক, পুত্রের খবর পাইয়া মা-বাপের প্রাণে কিছুটা শান্তি আসিলেও খাওয়া-থাকার কঠোরতার বিষয় জানিয়া, অতিশয় উদ্বেগ জন্মিল। তাঁহারা দুইজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণকে চারিশত মুদ্রা সঙ্গে দিয়া, শিবানন্দ

সেনের নিকট পাঠাইলেন এবং ইহাদিগকে পুরী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। উদ্দেশ্য—ইহারা পুরীতে থাকিয়া রঘুনাথের সেবা করিবে। শিবানন্দ লোকদিগকে ফেরত পাঠাইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন আগামী রথযাত্রায় পুরী যাইবার কালে তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। এখন এইভাবে লোক পাঠান অসম্ভব। পর বৎসর রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে রঘুনাথের পিতামাতা দুইজন ভৃত্য এবং একজন পাচক ব্রাহ্মণকে চারিশত মুদ্রা সহ পুরী পাঠাইলেন। তাহারা পুরীতে অবস্থান করিয়া মনিবের অভিপ্রায়ানুযায়ী রঘুনাথের সুখ-সুবিধার জন্য নানাভাবে চেষ্টা আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাত্যাগী রঘুনাথ তাহাদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্রও সেবা-সহায়তা গ্রহণ করিতেন না। তিনি পূর্বের ন্যায় কঠোরভাবেই জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

চারিমাস পুরী বাস করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিলেন, কিন্তু সেই ভৃত্য ও পাচক স্বীয় প্রভুর ইচ্ছাপূরণের জন্য পুরীতেই বাস করিতে লাগিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই রঘুনাথকে কাকুতি-মিনতি করিত—তাহাদের সেবা-গ্রহণের জন্য। কিন্তু রঘুনাথ অটল রহিলেন; তাঁহার বৈরাগ্য হ্রাস হইল না। এইভাবে কিছুকাল গত হইলে পর, পিতামাতার অভিপ্রায় ও অর্থব্যয় সার্থক করিবার জন্য তিনি প্রতিমাসে আট পণ মাত্র কড়ি ব্যয়ে দুইদিন মহাপ্রসাদ কিনিয়া চৈতন্যদেবকে ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর তিনি চৈতন্যদেবের সেবা করিয়া, পিতামাতার অর্থের কিঞ্চিৎ সদ্ব্যয় করিয়া-ছিলেন, কিন্তু নিজের জন্য কখনও কিছু গ্রহণ করেন নাই। দুই বৎসর এইরূপ করিবার পর, অন্তরের ভাব পরিবর্তন হইল। চৈতন্যদেবের সেবার জন্যও এইভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে নিবৃত্ত হইলেন। রঘুনাথের ভিক্ষাদান বন্ধ হইলে একদিন চৈতন্যদেব স্বরূপদামোদরের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথের অন্তরের কথা স্বরূপের নিকট গোপন থাকিত না। তিনি উত্তর দিলেন, "এই ভাবে আপনার সেবা করিয়া রঘুনাথের আর তৃপ্তি বোধ হয় না, বাড়ীর লোকের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিতে মনে বিষম সঙ্কোচ জন্মে। তাঁহাদের সম্পর্ক ষোল আনা ত্যাগ করিবার জন্যই রঘুনাথ আপনাকে ভিক্ষা-দান বন্ধ করিয়াছে।" রঘুনাথের অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া চৈতন্যদেবের খুব আনন্দ হইল। তিনি তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ ভালই করিয়াছে। তাহার বাপ-জ্যেঠা ঘোর বিষয়ী। সাধু ব্রাহ্মণ গরীব দুঃখীকে বহু দান ও নানাবিধ সৎকর্ম করিলেও, বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত। অত্যধিক বিষয়াসক্ত লোক নিষ্কামভাবে দান করিতে পারে না। ঐহিক-পারত্রিক সুখভোগ ও স্বীয় দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যেই তাহারা দান করে। এই জন্য ইহাদের

অন্ন অশুদ্ধ। এইরূপ লোকের দান অশুদ্ধ, ইহাদেব অন্নগ্রহণ করিলে ভগবানের দিকে মন যায় না.—ভজনে বিঘ্ন হয়। এতদিন শুধু রঘুনাথের মন দেখিয়া কিছু বলি নাই। ত্যাগী ভজনশীলের পক্ষে এইরূপ প্রতিগ্রহ বড়ই অনর্থকর। রঘুনাথ ভগবানেব কৃপায় ইহা বুঝিতে পাবায় খুব ভালই হইল।"

কিছুকাল পবে. রঘুনাথ রাত্রে সিংহদ্বাবে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে জানাইলেন. "এখন রঘুনাথকে আর সিংহদ্বাবেও দেখা যায় না।" গোবিন্দের বাক্যে তাঁহাব মনে কৌতূহল জন্মিল। পবদিন স্বরূপের নিকট ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে. তিনি সহাস্যে বলিলেন. "সিংহদ্বারে বহু পরিচিত লোক যাতায়াত করেন, তাঁহারা রঘুনাথকে দেখিতে পাইয়া খুব যত্নপূর্বক ভিক্ষা দেন; এই জন্য রঘুনাথ এখন আর সিংহদ্বারে ভিক্ষা করেন না। মধ্যাহ্নকালে ছত্রে গিয়া ভিক্ষা করেন। মুখে কোন কথা নাই, ছত্রে যেমন পান সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবদ্‌ভজন করিতেছেন।

রঘুনাথেব বিবেক-বৈরাগ্য দেখিয়া সহর্ষে,-

"প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বাব।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।"

এইভাবে ছত্রে কিছুকাল ভিক্ষা করিবাব পব রঘুনাথের তাহাও আর ভাল লাগিল না। লোকসঙ্গ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিবাব জন্য ছত্রে যাওয়া বন্ধ করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইবার পর. যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আনন্দবাজারের[১] দোকানদারগণ প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দেয়। পুরীতে অনেক তেলেঙ্গী[২] গাভী আছে, তাহারা সেই সকল পচা মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে। কিন্তু যেগুলি বেশী পচিয়া যায়. তাহা গোরুও খাইতে পারে না. দেওয়ালের পাশেই পড়িয়া থাকে। ছত্রে যাওয়া বন্ধ করিয়া, গভীর রাত্রিতে সকলেব অগোচরে রঘুনাথ সেই পচা মহাপ্রসাদ কুড়াইয়া লইয়া আসিতেন এবং নিজের কুঠিয়াতে আসিয়া চুপি চুপি তাহা খুব করিয়া জল দিয়া ধুইতেন। বারবার ধুইবার পর উপরের পচা ভাগ চলিয়া গিয়া ভিতরের শক্ত অংশ যাহা পাওয়া যাইত. তাহাই লবণ-সংযোগে খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। রঘুনাথ কিছুকাল এইভাবে কাটাইবার পর স্বরূপ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং তিনি উহা গোবিন্দকে জানাইলেন। ক্রমে গোবিন্দের

---

১ পুরীতে যেখানে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়।

২ দক্ষিণদেশীয়।

মুখ হইতে উহা চৈতন্যদেবের কর্ণগোচর হইল। অতীব বিস্মিত হইয়া তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একদিন গভীর রাত্রে স্বরূপকে সঙ্গে লইয়া রঘুনাথের কুঠিয়ায় উপস্থিত হইলেন।

রঘুনাথ মহাপ্রসাদ ধুইয়া, তাহাতে লবণ মিশাইয়া সম্মুখে রাখিয়া ইষ্টদেবকে সমর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ চৈতন্যদেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুদ্রিত নয়ন উন্মীলন করিয়া স্বরূপের সঙ্গে প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তর পুলকে পূর্ণ হইল। রঘুনাথ প্রেমে বিহ্বল হইয়া চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন: —উভয়ের চক্ষে প্রেমাশ্রুধারা। পরে প্রেমিক সন্ন্যাসী সম্মুখস্থ পাত্রে সেই মহাপ্রসাদ দেখিয়া তাহা হইতে স্বহস্তে একমুষ্টি উঠাইয়া মুখে দিলেন এবং তাঁহার নিকট অতিশয় সুস্বাদু ও পরিতৃপ্তিকর বোধ হওয়ায় উল্লসিত অন্তরে বলিলেন, "এমন অমৃত তুমি একা লুকাইয়া লুকাইয়া খাও! আমাদের দাও না!" এই কথা বলিয়াই আর এক মুঠা উঠাইবার জন্য যেমন হাত বাড়াইলেন, স্বরূপ অমনি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ইহা তোমার উপযোগী নহে। আর খাইলে দেহ অসুস্থ হইবে।" স্বরূপ মুঠার প্রসাদ কাড়িয়া লইলেন, আর খাইতে দিলেন না। এজন্য চৈতন্যদেবের খুব ক্ষোভ হইল। তাহার পর বার বার এই অদ্ভুত প্রসাদের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"নিত্য কত রকম প্রসাদ খাই, কিন্তু এমন সুস্বাদ ত কোন প্রসাদে পাই না।" রঘুনাথের নিষ্ঠা ভক্তি ও ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখিয়া উভয়ের খুব আনন্দ হইল। তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতরূপে কৃপা ও স্নেহ-আশীর্বাদ প্রদান করিয়া তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন।

"গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্তা শুনিল।
আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিল॥
কাঁহা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও কেন।
এই বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ॥
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাঢ়ি নিলা॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই॥
এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥"

একসময়ে শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী তীর্থপর্যটনান্তে পুরী আসিয়া ব্রজভূমির পুণ্যস্মৃতিস্বরূপ এক গোবর্ধনশিলা ও একগাছি গুঞ্জা[১]

---

১ কুঁচ

মালা, চৈতন্যদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাল উহা তাঁহার নিকট পরম আদরযত্নে রক্ষিত ছিল। রঘুনাথের নিষ্ঠাভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া, উপযুক্ত অধিকারী বুঝিয়া, সেই প্রিয় বস্তু দুইটি তাঁহাকে দান করিয়া,—

"প্রভু কহে, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তব কৃষ্ণ প্রেমধন॥
এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
দুই দিকে পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"

চৈতন্যদেবের নিকট হইতে গোবর্ধনশিলাসহ গুঞ্জামালা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাপূজার সাত্ত্বিক বিধান প্রাপ্ত হইয়া, রঘুনাথের উল্লাসের সীমা রহিল না। তিনি অমূল্যনিধি জ্ঞানে পরম আগ্রহে উহা কুঠিয়াতে লইয়া গিয়া প্রাণ-মন ঢালিয়া তদ্গতচিত্তে সেবাপূজা আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথের সৌভাগ্য দেখিয়া দামোদর স্বরূপও খুব খুশী হইয়াছিলেন এবং সেবাপূজার জন্য,—

"এক বিতস্তি দুই কাপড় পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি॥"

মহাত্যাগী ভক্ত রঘুনাথ এইরূপে আড়ম্বরহীন অপূর্ব সাত্ত্বিক সেবাপূজা করিয়া অন্তরে পরম আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

"জলতুলসীর পূজায় তার যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥"

এইরূপে কিছুকাল সেবাপূজা চলিবার পর, একদিন স্বরূপ রঘুনাথকে বলিলেন,—

"অষ্টকৌড়ির[১] খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম।"

স্বরূপের অভিপ্রায়ানুযায়ী তদবধি গোবিন্দ প্রত্যহ অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ যোগাইতেন এবং প্রেমে পুলকিত রঘুনাথ তাহা গোবর্ধনধারীকে নিবেদন

১ পূর্বে দেশে কড়ির প্রচলন ছিল। কড়ির হিসাব—চারি কড়াতে এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি, চার বুড়িতে এক পণ, ষোল পণে এক কাহন। এক কাহন বর্তমানে ষোল আনা অর্থাৎ এক টাকা।

করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেন। রাজৈশ্বর্যে প্রতিপালিত যুবক রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্য, অদ্ভুত তিতিক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা ও সাধনভজনে নিষ্ঠা দেখিয়া লোক বিস্মিত হইত। শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয়পূর্বক দামোদর স্বরূপের উপদেশানুযায়ী, তিনি নিজ জীবনকে নিয়মিত করিয়া, ত্যাগ-তপস্যার চরম আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড সেও নহে কোনদিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না ছিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাইয়া আপনাকে করে নির্বেদন॥"

এইভাবে রঘুনাথ কঠোর সাধনভজনে ডুবিয়া থাকিয়া পুরীতে বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায়, স্বরূপের সঙ্গে তাঁহাকে সেবা করিবার সুযোগও রঘুনাথের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর স্বরূপ যে কয়দিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন রঘুনাথ তাঁহার সেবা করিয়া পুরীতেই বাস করেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর তিনি ব্রজে অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষ সময়েও তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ-তপস্যার কথা শুনিয়া বিস্ময় জন্মে।

"অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করি লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে করে নিত্য প্রণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিনসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্ধ সপ্ত-প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥"

চৈতন্যদেব যেসময়ে কাশীধামে গিয়াছিলেন সেই সময়ে পরমভক্ত তপন মিশ্রের পুত্র, বালক রঘুনাথের মনে ভগবদ্ভক্তির বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন। ভক্তিমান পিতামাতার যত্নে সৌভাগ্যবান পুত্রের উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে সেই বীজ অংকুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হইতেছিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া রঘুনাথ সংসারে বীতস্পৃহ হইলেন এবং ভগবদ্ভজনে কাল কাটাইবার আশায় পুরীতে চৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া তাঁহার খুব আনন্দ হইল; পরমানন্দে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। রঘুনাথের অন্তরের ভাব-ভক্তিও শতগুণে বর্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচয় হইল ভট্ট রঘুনাথ, এবং সপ্তগ্রামবাসী রঘুনাথের নাম হইল দাস রঘুনাথ। ভট্ট রঘুনাথ কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বরও সুমিষ্ট ছিল। ভক্তপণ্ডিত রঘুনাথ সুমধুর স্বরে, সুললিত ছন্দে, যখন শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সেই পীযূষধারা পান করিয়া উপস্থিত সকলের মন ভক্তিরসাপ্লুত হইত। চৈতন্যদেবও তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠে, বিশুদ্ধ রাগে, তাল-মান-লয়ে গভীর ভাবোদ্দীপক গীতি, কবিতা, নাটক ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিতেন। এই ভাবে পরমানন্দে আট মাস গত হইল। পুরীতে বাস করিয়া এবং চৈতন্যদেবের সংসর্গ ও উপদেশানুযায়ী সাধন-ভজনে অগ্রসর হইয়া, রঘুনাথের অন্তরের বৈরাগ্যভাব দিনে দিনে প্রবলাকার ধারণ করিল। তিনি সংসার-সম্পর্ক চিরকালের মত ছেদন করিয়া চৈতন্যদেবের পাদমূলে পুরীতেই বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে সম্মতি দিলেন না। ঘরে গিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে বুঝাইয়া বলিলেন, "যদি সংসার করিবার ইচ্ছা না থাকে, বিবাহ করিও না। যতদিন পিতামাতা বর্তমান আছেন ততদিন গৃহে থাকিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা কর এবং ভক্তপাশে ভাগবতাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভগবদ্ভজনে কাল কাটাও। তাঁহাদের দেহান্ত হইলে পর বাড়ীঘর ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিও। কিছুকাল পরে আবার পুরী আসিও।"[১]

---

১ "অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিও বলি নিষেধ করিল॥
বৃদ্ধ পিতামাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥"

চৈতন্যদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনাপূর্বক আশীর্বাদ লইয়া রঘুনাথ কাশীতে ফিরিয়া গেলেন, এবং পিতামাতার সেবা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভজনে মনোনিবেশপূর্বক কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার দেহত্যাগ হইলে প্রায় চারি বৎসর পরে রঘুনাথ পুনরায় পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া, পরমস্নেহে ভক্তিমার্গের উচ্চতত্ত্বসমূহ, সাধ্যসাধন-প্রণালী শিক্ষা দিয়া ও সাধনভজন করাইয়া তত্ত্বজ্ঞ আচার্যরূপে গঠন করিলেন এবং পরে প্রচারকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ব্রজভূমে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ব্রজে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া ভট্ট রঘুনাথের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইল; এবং তাঁহাদের ন্যায়ই কঠোরভাবে ত্যাগবৈরাগ্য-পূর্ণ জীবনযাপন করিয়া তিনি সাধনভজনে কাল কাটাইতে থাকিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবন ও উপদেশে বহু জীবের জীবন সুশীতল হইয়াছিল। চৈতন্য-দেব-প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ 'ছয় গোস্বামী'র অন্যতম "দাস রঘুনাথ ও ভট্ট রঘুনাথ এই দুই মহাশয়।" রঘুনাথ ভট্টেরই বিশেষ অনুগত শিষ্য অম্বরাধিপতি মানসিংহ, বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর সুবিশাল প্রস্তর-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে আনীত লোহিত প্রস্তরে নির্মিত সেই অপূর্ব কারুকার্যখচিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

এইভাবে ভক্তমণ্ডলীসহ পুরীতে থাকিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়া এবং প্রেম-ভক্তি মার্গের প্রচারকরূপে শ্রীরূপ, সনাতন, দাস রঘুনাথ, ভট্ট রঘুনাথ প্রভৃতি আচার্যগণের জীবনগঠনপূর্বক চৈতন্যদেব তৎপ্রবর্তিত ধর্মসংঘের গোড়াপত্তন করিলেন।

দশম অধ্যায়

সন্ন্যাসীর আদর্শ

শাস্ত্র ও আচার্যগণের মতানুসারে না চলিয়া, ধর্মপথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়া কঠিন, এইজন্য চৈতন্যদেব সর্বদাই প্রাচীন পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত ও আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্বে প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিয়া আচার্য বল্লভ ভট্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানকালে একবার রথযাত্রার সময় বল্লভ ভট্ট সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে বল্লভ ভট্ট সর্বদাই চৈতন্য দেবের নিকট যাতায়াত করিতেন; উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া শাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন। চৈতন্যদেবের মুখে ভক্তি ও ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্চ সিদ্ধান্ত-সমূহ শুনিয়া এবং রথযাত্রাদি উপলক্ষ্যে তাঁহাতে অপূর্ব প্রেম-ভক্তির বিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবস্থা প্রত্যক্ষ করিযা ভট্টের মনে তাঁহার প্রতি খুব উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছিল।

একদিন প্রসঙ্গকালে ভট্ট তাঁহার অন্তরেব সেই ধারণা অনুযায়ী চৈতন্য-দেবের সম্মুখেই তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভট্ট শতমুখে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বর্তমান কালে একমাত্র আপনিই ভক্তিমার্গের পথপ্রদর্শক। আপনাকে দেখিয়া লোকে প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তি শিক্ষা করিতেছে। আপনার দ্বারাই জগতে ভক্তিযোগের প্রচার হইল।" বল্লভ ভট্ট এইরূপ যশোকীর্তন আরম্ভ করিলে চৈতন্যদেবের পক্ষে উহা অসহ্য বোধ হইল। তিনি ভট্টের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আপনার এইরূপ প্রশংসার যোগ্য নহি। আমি ভক্তিমার্গের কিছুই জানিতাম না। সর্বপ্রথমে আচার্য অদ্বৈতের সংসর্গে ভক্তিযোগের দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয় এবং শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে ভক্তিরসের মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারি। প্রভুপাদ নিত্যানন্দের সংসর্গে ভক্তির গভীরতা ও ভাবরাজ্যের পরিচয় পাই। ষড়্‌দর্শনবেত্তা মহাপণ্ডিত সার্বভৌম আমায় ভক্তি-ভগবৎতত্ত্ব শিক্ষা দেন। রসিক-চূড়ামণি রামানন্দ রায়ের কাছে রসমার্গের ভজনপ্রণালী এবং প্রেমিক-শিরোমণি দামোদর স্বরূপেব নিকট ব্রজদেবীগণের কামগন্ধহীন শুদ্ধপ্রেম, মধুররসের আস্বাদ পাই। আর প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনামকীর্তনকারী ভক্তকুলতিলক হরিদাস ঠাকুরের কাছে নামমাহাত্ম্য শিক্ষা করি।"

চৈতন্যদেবের মুখে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মহিমার কথা শুনিয়া বল্লভাচার্যের মনে বিস্ময় জন্মিল। রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণের নৃত্য-গীত, সংকীর্তন এবং ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিলেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম ও মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। চৈতন্যদেব ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সঙ্গলাভে ভট্টের মনে খুব আনন্দ হইল। চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহার পার্ষদমণ্ডলীরও অতুলনীয় ত্যাগ, তপস্যা ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় পাইয়া ভট্ট মোহিত হইলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সকলেই একত্র সমবেত হইলেন, খুব নৃত্যগীত সংকীর্তন হইল। ভট্ট প্রচুর মহাপ্রসাদ আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই অত্যুৎকৃষ্ট প্রসাদ দিয়া সমবেত ভক্তগণকে পরম সমাদরে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করাইলেন এবং চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গী সন্ন্যাসীদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। এইরূপে চৈতন্যদেবের সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তির মাধুর্য আস্বাদন-সহকারে পরমানন্দে কিছুকাল পুরী বাস করিয়া বল্লভাচার্য তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

ইহার অনেকদিন পর আর একবার বল্লভাচার্য রথযাত্রা দর্শন ও চৈতন্য-দেবের সঙ্গলাভ করিবার জন্য পুরী আসিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ আচার্য শ্রীধর স্বামী-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাই চৈতন্যদেব প্রামাণ্য ও সম্প্রদায়ানুমোদিত মনে করিতেন, এবং নিজে যেমন উহার সমাদর করিতেন তেমনই অপরকেও ঐ টীকার সহায়েই ভাগবতের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। শ্রীধর স্বামী গীতা-ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার এবং ভক্তিমার্গের প্রচারক। আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া, তিনি সর্বত্রই তাঁহার টীকাতে নির্বিশেষ অদ্বয়তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবৎতত্ত্ব ও উপাসনার প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণের পরমাদরণীয়। কিন্তু সুন্দর ও সুললিত হইলেও উহার কঠিন ভাষা ও দুরূহ তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। এজন্য পরম কারুণিক টীকাকার শ্রীধর শ্রুতিস্মৃতি অনুযায়ী অতি সহজসরল ভাষায় উহার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার টীকা সেইজন্য সকলের নিকটই অতি প্রিয়। বল্লভ ভট্ট ছিলেন শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরোধী। এজন্য বল্লভাচার্য শ্রীধরের টীকা পছন্দ করিতেন না। মহাপণ্ডিত বল্লভাচার্য শ্রীধরের ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং ভাগবতের এক টীকা লিখিতে-ছিলেন। চৈতন্যদেবকে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনাইতেই এইবার তাঁহার পুরী আসার উদ্দেশ্য। ইহপরকালে ভোগসুখের জন্য সকাম কর্মউপাসনার হেয়ত্ব প্রতিপাদক, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের মোহতিমিরাবরণের অপসারক, স্ব-স্বরূপাব-

বোধক পরমেশ্বরের নিত্য শুদ্ধ নির্গুণ নির্বিকার তত্ত্ব এবং সগুণ সাকার ভক্তবৎসল রূপ ও মনোহর লীলাকথায় পূর্ণ পরমহংসসংহিতা 'শ্রীমদ্ভাগবত' পরমহংসাগ্রণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী মহারাজের পরম আদরের বস্তু ছিল। তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদুপাসনা প্রচার এবং পরিপুষ্টির জন্য তিনি ইহার বহুল পঠনপাঠন আকাঙ্ক্ষা করিতেন, এবং ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীধর স্বামীর টীকা সহায়ে নিজেও সদাসর্বদা ভাগবতামৃত পাঠ করিতেন। স্বকৃত ভাগবতটীকা চৈতন্যদেবকে পড়িয়া শুনাইতে বল্লভাচার্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও উহাতে শ্রীধরের ব্যাখ্যার খণ্ডন করা হইয়াছে জানিয়া তিনি শুনিতে চাহিলেন না। বল্লভাচার্য শ্রীধরের টীকার দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—

"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পরি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥"

বল্লভ ভট্টের কথায় চৈতন্যদেবের মনে বিরক্তি জন্মিল।

"প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

বল্লভ ভট্ট ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না, চৈতন্যদেবকে স্বীয় লেখা শুনাইবার জন্য বারংবার জিদ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না, অগত্যা ভট্ট ভক্তগণকে স্বীয় গ্রন্থ শুনাইতে চাহিলেন। চৈতন্যদেব যে গ্রন্থ শুনিতে অনিচ্ছুক ভক্তগণ তাহা শুনিবেন কেন? কেহই তাহা শুনিতে সম্মত না হওয়ায় ভট্ট মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

ভট্ট প্রত্যহই চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ তত্ত্বালোচনা হয়। গ্রন্থ শুনাইতে না পারিলেও তিনি কথাপ্রসঙ্গে সুযোগ পাইলেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য স্বীয় মতামত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর নিকটে ভট্টের যুক্তিতর্ক স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইত। বল্লভাচার্য কোন প্রকারেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় সখা গদাধরপণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া নিত্যই ভাগবত পাঠ করিতেন। মহাপণ্ডিত হইলেও গদাধর খুব নম্র, বিনয়ী ও অতিশয় কোমলস্বভাব। সহজে কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করা কিংবা কোন প্রকারে মনে ব্যথা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। বল্লভ ভট্ট নিরুপায় হইয়া অবশেষে গদাধরের শরণাপন্ন হইলেন এবং তিনি ভট্টের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। গদাধরের হৃদয়ের ভাব চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হইলেও

তাঁহার সহিত রহস্য করিবার জন্য এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন। জীবন গেলেও গদাধর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চৈতন্যদেবের অপ্রীতিকর কোন কিছু করিতে চাহিতেন না। অপরের মুখে তাঁহার রোষের কথা জানিয়া গদাধরের প্রাণ উড়িয়া গেল, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল। বল্লভ ভট্টকে বিদায় দিয়া গদাধর বিনয়বচনে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে বেশী মেলামেশা প্রভুর অভিপ্রেত নহে।" বল্লভভট্ট শেষে আর গত্যন্তর না দেখিয়া চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকট অকপটে স্বীয় অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভট্টের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন নরম হইল। তিনি ভট্টকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন—"পাণ্ডিত্যের অহংকার করা ভাল নহে, শাস্ত্র-সম্প্রদায় ও প্রাচীণ আচার্যগণের মত খণ্ডন করিয়া পাণ্ডিত্যবলে নিজের ইচ্ছামত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলে তাহা লোকের নিকট গ্রহণীয় হয় না। শ্রীধর স্বামীর অনুযায়ী ভাগবত ব্যাখ্যা কর এবং ভগবানের ভজনে মন দাও। তাহাতে নিজের ও অপরের কল্যাণ হইবে।"

চৈতন্যদেবের সঙ্গগুণে, সদুপদেশে এবং শিক্ষামূলক শাসনে বিবেকের উদয় হওয়ায় বল্লভাচার্যের অন্তর পরিবর্তিত হইল। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎপরে বল্লভ ভট্ট পূর্বের ন্যায় সমস্ত ভক্তবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। মহোৎসব-দিনে চৈতন্যদেব গদাধরের সঙ্গে পরিহাস করিবার জন্য পূর্বের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করাতে গদাধরের মনে বিষম ত্রাস উপস্থিত হইল। সরলপ্রাণ গদাধর উহাতে বাস্তবিকই অতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া পড়িলেন দেখিয়া, চৈতন্যদেব তাঁহাকে অভয় দিয়া শান্ত করিলেন। তখন পণ্ডিতের যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। দিনে দিনে অধিক আকৃষ্ট হইয়া বল্লভ ভট্ট চৈতন্যদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিত্য বারংবার ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেও তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। পরে ভট্টকে অতিশয় আগ্রহান্বিত দেখিয়া যুগলকিশোর-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ভট্ট নিষ্কাম অহৈতুকী প্রেম-ভক্তিপথের উপাসক হইয়া ভজনে নিরত হইলেন।

ভিন্ন সম্প্রদায়ের বলিয়া পরিচয় দিলেও বল্লভাচার্যের অনুবর্তীদিগের ভিতরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ন্যায় প্রেম-ভক্তিরই প্রাধান্য। বল্লভাচার্যপ্রণীত শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে টীকা আছে তাহাতেও জগৎকারণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে 'অদ্বয়তত্ত্ব' বলা হইয়াছে। ইহা অদ্বৈতবাদী, দশনামী সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। কারণ বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়গুরু মূল বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত ও ভজনপ্রণালী ভিন্ন প্রকার।

সেই সময়ে দেশে সংস্কৃত ভাষা ও কাব্যসাহিত্যের বিশেষ চর্চা ছিল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দেবভাষায় কবিতা রচনা করিয়া স্বয়ং আনন্দ লাভ করিতেন, এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিবৃন্দকে শুনাইয়া রসাস্বাদন করাইতেন। এখনও শাস্ত্রালোচনাকারী প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে এইরূপ নির্দোষ বিমলানন্দ উপভোগের প্রথা কিছু কিছু বর্তমান রহিয়াছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং মহাপণ্ডিত তত্ত্বদর্শী আবার তাঁহার সঙ্গীরাও তদনুরূপ। সেইজন্য স্বকৃত কবিতা গ্রন্থাদি তাঁহাকে শুনাইয়া গ্রন্থের দোষগুণ বিচার, সংশোধন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য অনেক লেখকের আগ্রহ হইত। তিনিও সুযোগ-সুবিধামত ঐ সকল পাঠ ও শ্রবণ করিয়া লেখকগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য সহায়ে সুন্দর লালিত্যপূর্ণ ভাষায় রচনা করিলেই কাব্য উৎকৃষ্ট হয় না। দুরূহ তত্ত্বকে,—সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বিষয়কে ছন্দোসহায়ে সুললিত মাধুর্যপূর্ণ ভাষার সাহায্যে অপরের হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করা কবির কাজ হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত শাশ্বত সত্যের অবিরোধী হওয়া প্রয়োজন। সুমধুর ভাষায় আবৃত করিয়া অশাস্ত্রীয় অসংগত সিদ্ধান্ত প্রচার করিলে উহাতে সমাজের ও নিজের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাই অজ্ঞ লেখকের লেখায় অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অপসিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে খুব কষ্ট হইত। এজন্য শেষে নিয়ম হইয়াছিল কোন নূতন লোকের রচনা প্রথমে আলঙ্কারিক পণ্ডিত ধীমান দামোদর স্বরূপ পড়িয়া দেখিবেন এবং তাঁহার অনুমোদিত হইলে পরে চৈতন্যদেবকে শোনানো হইবে।

একদা বঙ্গদেশীয় জনৈক পণ্ডিত স্বরচিত কবিতা চৈতন্যদেবকে শুনাইবার জন্য পুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই প্রশংসা করিলেন। চৈতন্যদেবের মহিমা বর্ণনা করিয়া লিখিত তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া অনেক ভক্তেরই আনন্দ হইল। কিন্তু স্বীয় কবিতা চৈতন্যদেবকে শুনাইবার জন্য কবির মনে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তিনি তাহা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন না। চৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত ভাগবতাচার্যের সঙ্গে উক্ত কবির বিশেষ পরিচয় ছিল। ভাগবতাচার্য কবির অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য দামোদর স্বরূপকে বিশেষ অনুরোধ আরম্ভ করিলেন; কারণ দামোদর অনুমোদন করিলেই চৈতন্যদেব উহা শুনিতে সম্মত হইবেন। ভাগবতাচার্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, দামোদর সম্মতি দিলে নির্দিষ্ট দিনে ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে গ্রন্থপাঠের আয়োজন হইল। কবিবর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পাঠ করিলেন,—

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।

প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥"

দামোদরের অনুমতিমতে কবি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, "পদ্ম-পলাশলোচন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেহী আত্মারূপে অভিন্ন, যিনি স্বর্ণবর্ণরূপ ধারণ করিয়া, অসংখ্য জড়প্রকৃতি মনুষ্যের চৈতন্য সম্পাদিত করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তোমার মঙ্গল বিধান করুন।" শ্লোকের ভাষা ও ভাব শুনিয়া উপস্থিত অনেকেই উচ্চপ্রশংসা করিলেন। কিন্তু দামোদর স্বরূপের বদনমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি বিরক্তির সহিত কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥
পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায় ॥
পূর্ণানন্দ চিৎ স্বরূপ জগন্নাথ রয়।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥
দুই ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে এই তার রীতি ॥
আর এই করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপদেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥"

মঙ্গলাচরণ-শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া দামোদর বিরক্ত হইলেন এবং কঠোর বাক্যে কবিকে তাহার কবিতার দোষ দেখাইয়া দিলেন। দামোদর অনেক শাস্ত্র, বাক্য ও যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন "জীবের ন্যায় ঈশ্বরের দেহ ও দেহী আলাদা বস্তু নহে। ঈশ্বরতত্ত্বে দেহ-দেহী ভাব নাই। জীবের দেহ প্রাকৃত, দেহী চিৎস্বরূপ (চৈতন্য)। ঈশ্বরের দেহ ও স্বরূপ এক বস্তু চিদানন্দ। অতিশয় সূক্ষ্ম, গভীর অর্থপূর্ণ তত্ত্বকথা শুনিয়া সকলেরই বিস্ময় জন্মিল। ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বীয় অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া কবির লজ্জার সীমা রহিল না। তিনি মহা অপরাধীর ন্যায় সসঙ্কোচে নতশিরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া দামোদরের মনে সহানুভূতি জন্মিল। তিনি সহৃদয়তা প্রকাশপূর্বক আশ্বাস দিয়া তাঁহার কবিতাকে দোষহীন করিয়া স্বয়ং অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। দামোদর শ্লোকের শ্লেষ অর্থ বাহির করিলেন তাহার মর্ম এইরূপ—

"এক অদ্বয়তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ—স্থাবর-ব্রহ্ম জগন্নাথ এবং জঙ্গম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এই দুইরূপে সংসারাসক্ত জড়বুদ্ধি মানুষকে ত্রাণ করিতেছেন।"

দামোদরের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যাকৌশল দেখিয়া সকলেই সুখী হইলেন। দামোদর বুঝাইয়া বলিলেন,—

"জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডয়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাইয়া।
সব লোক নিস্তারিলা জঙ্গমব্রহ্ম হইয়া॥"

স্বরূপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া কবির হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। উপলব্ধিমান তত্ত্বদর্শী আচার্যের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া কবি ক্রমে ক্রমে চৈতন্যদেবেরও কৃপা লাভ করিলেন। সন্ন্যাসি-চূড়ামণির সংসর্গে তাঁহার অন্তরে প্রবল বিবেকবৈরাগ্য সঞ্চার হইল। তিনি পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের খ্যাতিলাভের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। কবিবর শেষে সর্বত্যাগী হইয়া নীলাচলে চৈতন্যদেবের চরণসমীপেই বাস করিতে থাকেন এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া ভক্তি-পথে ভগবানের দিকে অগ্রসর হন।

রায় রামানন্দের এক অনুজ রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ মালজাঠা নামক স্থানের শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন; তাঁহার নাম ছিল গোপীনাথ পট্টনায়ক। অমিতব্যয়ী গোপীনাথ প্রজার নিকট হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করিলেও রাজকর ষোল আনা দিতে পারিতেন না। প্রতিবৎসর কিছু কিছু বাকী পড়িয়া ক্রমে তাঁহার নিকট দুই লক্ষ কাহন রাজকোষের প্রাপ্য হইল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার এই সকল দেখাশুনা করিতেন। তিনি গোপীনাথের নিকট হইতে বাকী রাজস্ব কোন মতে আদায় করিতে না পারিয়া শেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুরীতে লইয়া আসিলেন। পাওনা আদায়ের জন্য গোপীনাথকে নানাপ্রকার উৎপীড়নের ভয় দেখানো হইল। গোপীনাথের অনেক ঘোড়া ছিল, তিনি অনন্যোপায় হইয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার ঘোড়াগুলি উচিত মূল্যে রাজ সরকারে লওয়া হউক। আর বাকী পাওনা পরে ধীরে ধীরে আদায় করিবেন। বড় রাজকুমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য অন্য এক রাজকুমারকে আনা হইল। তিনি ঐ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ঘোড়াগুলি ভাল করিয়া দেখিয়াও তিনি উচিত মূল্যাপেক্ষা অনেক কম দাম নির্দেশ করাতে গোপীনাথের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। সেই রাজপুত্রের এক মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিতে বলিতে ঘাড় বাঁকাইতেন। ক্রুদ্ধ

গোপীনাথ তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়ার দাম এত কম হইবে কেন? আমার ঘোড়া ত ঘাড় বাঁকায় না। এই দামে ঘোড়া দিতে পারিব না।" গোপীনাথের বাক্যে রাজপুত্রগণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইলেন এবং গোপীনাথকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে গুরুতর অপরাধীকে উচ্চ চাঙ্গের (মঞ্চের) উপর চড়াইয়া রাখা হইত। নীচে মধ্যস্থলে ধারাল খড়্গ পাতা থাকিত এবং উপর হইতে অপরাধীকে সেই খড়্গের উপর ফেলিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইত। ইহার নাম 'চাঙ্গে-চড়ান'। ক্রুদ্ধ রাজপুত্রগণ ঘোরতর অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল, চারিদিকে ভীষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ভক্তগণ এই ব্যাপারে অতিশয় দুঃখিত হইয়া চৈতন্যদেবকে সমস্ত জানাইলেন। তাঁহার অতিশয় প্রিয় অন্তরঙ্গ রামানন্দ এবং সেবক বাণীনাথের সহোদর গোপীনাথের বড়ই দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ভক্তগণ অনেক হাহুতাশ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব গোপীনাথের প্রতি কোনপ্রকার সহানুভূতি ত দেখালেনই না, বরং গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজাকে তাঁহার ন্যায্য পাওনা না দিয়া ইচ্ছামত আপনার ভোগবিলাসে যে ব্যয় করে তাহার এইরূপ পরিণাম হওয়া স্বাভাবিক।" ইহার পরে আবার কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত আসিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে চৈতন্যদেবকে জানাইলেন, "গোপীনাথের গোষ্ঠীবর্গ সকলকেই রাজসৈন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এবং গোপীনাথকে শীঘ্রই চাঙ্গের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া কাটা হইবে।" এই ভয়ানক সংবাদেও তিনি কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি কিংবা দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার উদাসীনতা দেখিয়া ভক্তগণের বড়ই আশ্চর্য মনে হইল। তাঁহারা ভরসা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার শুভ ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে রামানন্দের গোষ্ঠীবর্গ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। এখন তাঁহাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া তাঁহারা কাতরভাবে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অনুগত। তাঁহাদের এইরূপ ভীষণ সঙ্কটসময়ে আপনার এইভাবে উদাসীন থাকা ভাল দেখায় না।" ভক্তগণের মনোভাব বুঝিয়া চৈতন্যদেবের অন্তরে বিস্ময় জন্মিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমাদের কি ইচ্ছা, আমি রাজার নিকট গিয়া গোপীনাথের দায়ের জন্য ভিক্ষা মাগি?"

"শুনি মহাপ্রভু কহেন সক্রোধ-বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সব যাইব রাজ-স্থানে॥
তোমা-সবার এই মত রাজঠাঞি যাইয়া।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া॥

পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা দিবে কেন দুই লক্ষ কাহন॥"

রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে যেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহাতে ভক্তগণের আশা ছিল, তিনি চেষ্টা করিলে গোপীনাথ অতি সহজেই রক্ষা পাইবেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না; বরং স্পষ্টই বলিলেন—"আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়।" চৈতন্যদেব কোন প্রকারে স্বীয় ধর্ম সন্ন্যাসাশ্রমের মর্যাদা কিছু মাত্র লঙ্ঘন করিয়া বিষয় সম্পর্কে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না। ভক্তগণ অতিশয় কাতরভাবে গোপীনাথের রক্ষার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে শেষে তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা তাহাকে রক্ষা করিতে চাও, তবে সকলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও; একমাত্র তিনিই 'হয়কে নয়'—'নয়কে হয়' করিতে সমর্থ।"

এদিকে রাজার প্রিয় অমাত্য হরিচন্দন, কুমারগণের কঠোর ব্যবস্থায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা ভাল করিয়া বিবৃত করিলেন, এবং অতি বিশ্বস্ত পদস্থ ব্যক্তি ভবানন্দ রায়ের পুত্র, রামানন্দ রায়ের সহোদর গোপীনাথের শাস্তি সম্বন্ধে বিবেচনা ও তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। হরিচন্দন রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "গোপীনাথের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই রাজ-অনুগত, ইহাদের উপর এরূপ কঠোর দণ্ড শোভা পায় না। তা ছাড়া গোপী-নাথের নিকট যে পাওনা বাকী রহিয়াছে, সে বাঁচিয়া থাকিলে যেকোন ভাবেই হউক তাহা আদায় করা সম্ভব হইবে। প্রাণে মারিলে তো কিছুই লাভ হইবে না।" হরিচন্দনের কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের বিষয় আমি কিছুই জানি না। তাহার নিকট ধন পাওনা, আমার ধন প্রয়োজন; প্রাণ লইয়া কি হইবে?" রাজা হরিচন্দনকে রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া গোপীনাথের প্রাণদণ্ড রহিত করাইলেন এবং হরিচন্দনের মধ্যস্থতায় বাকী পাওনা আদায়েরও সুব্যবস্থা হইল। গোপীনাথ ও তাঁহার গোষ্ঠীবর্গ মুক্ত হইলেন।

গোপীনাথের ব্যাপারে ও ভক্তগণের ব্যবহারে চৈতন্যদেবের মনে খুব বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি পুরীতে বাস করা এইরূপ ঝঞ্ঝাটপূর্ণ হইবে দেখিয়া আলালনাথে নির্জনে গিয়া থাকাই মনস্থ করিলেন। তিনি তখন তাঁহার পরম অনুগত ভক্ত ও জগন্নাথের সেবক কাশী মিশ্রের উদ্যানে একান্তে অবস্থিত কুটীরে আপনভাবে বাস করিতেন। কাশী মিশ্র অনুক্ষণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা করিতেন। তিনি কাশী মিশ্রকে স্বীয়

অন্তরের কথা জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ মিশ্র, এই ভবানন্দ রায়ের বহু গোষ্ঠী, ইহাদের জন্য আমার এখানে থাকা দায় হইয়াছে। ইহারা রাজার চাকর, অথচ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজার ধন আত্মসাৎ করে—কাজেই রাজা দণ্ড দিবে ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? অথচ এই সকল বিষয় নিয়া লোকে আমায় বিরক্ত করিতে আসে। এইজন্য মনে করিতেছি আলালনাথে গিয়া বাস করিব। স্থানটি বড়ই নির্জন। সেখানে গেলে এই সকল হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে না।"

"ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জনবাসী।
আমা দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি॥"

তাঁহার কথা শুনিয়া কাশী মিশ্রের অন্তরেও খুব দুঃখ হইল। তিনি তাঁহাকে পুরীতেই বাস করিবার জন্য কাতরভাবে বারংবার প্রার্থনা করিলেন এবং ভক্তগণের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। গোপীনাথের ঘটনা সম্বন্ধে সেদিনকার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গের প্রতি আপনার বিশেষ স্নেহ-অনুকম্পার কথা ভাবিয়াই উক্ত ঘটনা আপনাকে নিবেদন করা হইয়াছিল। এবং এখনও সকলের বিশ্বাস, আপনার কৃপাতেই গোপীনাথ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।" কাশী মিশ্র চৈতন্যদেবকে আশ্বস্ত করিয়া আবার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ভবিষ্যতে আর কেহ কখনও আপনার নিকট কাহারও সাংসারিক কথা বা সমস্যা উত্থাপন করিবে না। আপনি এখানেই ইচ্ছানুরূপ নির্জনবাস করিয়া দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

মহাশৌর্যবীর্যপরাক্রমশালী হইলেও মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ও দেবদ্বিজ-ভক্ত। পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ তাঁহার কুলগুরু ভগবদ্‌ভক্ত ষট্‌কর্মান্বিত ব্রাহ্মণ কাশী মিশ্রের গৃহে নিত্য গমন করিয়া স্বহস্তে মিশ্রের পাদসম্বাহনাদি সেবা করিতেন এবং মিশ্রমুখে মন্দিরের ব্যাপার, শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবাপূজা, নিত্যনৈমিত্তিক পর্ব-উৎসব, লীলাকথাদি শুনিতেন। গোপীনাথের হাঙ্গামার পরেই একদিন মহারাজ ঐভাবে কাশী মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন। অবসরমত মিশ্র চৈতন্যদেবের পুরীত্যাগের ইচ্ছা মহারাজকে জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মিশ্রের কথায় মহারাজের মনেও অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল। প্রতাপরুদ্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এমন মহাপুরুষ যদি অসুবিধাবশতঃ পুরীত্যাগ করিতে বাধ্য হন তবে আমার রাজত্বে ধিক্‌।" কাশী মিশ্রকে বিশেষ অনুনয়সহকারে সন্ন্যাসীকে পুরীতে রাখিবার জন্য বলিয়া মহারাজ বিমর্ষচিত্তে প্রাসাদে ফিরিলেন এবং আসিয়াই গোপীনাথের খোঁজখবর লইতে আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের মুখে তিনি শুনিতে পাইলেন অমিতব্যয়ী হইলেও গোপীনাথ ভক্তলোক। ভোগবিলাসের জন্য কিছু কিছু ব্যয় করেন সত্য, কিন্তু দেবতা-সাধু-ব্রাহ্মণ-অতিথি-অভ্যাগত-গরীব-দুঃখীর সেবাতেই তাঁহার বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়। এবং এই সকলে অজস্র ব্যয় করেন বলিয়াই রাজকোষের দায় শোধ করিতে পারেন না। গোপীনাথের এইরূপ সদ্ব্যয়ের কথা শুনিয়া রাজার মনে খুব আনন্দ হইল। ইহার পর তিনি আরও যখন শুনিলেন যে, সেদিন প্রাণদণ্ডের জন্য চাঙ্গে তুলিয়া রাখা হইলেও ভগবদ্ভক্ত গোপীনাথ কিছুমাত্র বিমর্ষ হন নাই, তন্ময়চিত্তে ভগবানের নাম জপ করিতে-ছিলেন। তখন রাজার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গোপীনাথের সমস্ত খবর শুনিয়া তাঁহার উপর রাজার আক্রোশ চলিয়া গেল। বরং তিনি সমধিক প্রসন্ন হইলেন। প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে ডাকাইয়া নিকটে আনিলেন এবং বিশেষ সম্মানের চিহ্ন রাজকীয় শিরবস্ত্র স্বহস্তে উপহার দিয়া বলিলেন, "তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হইল, এবং পূর্বের সমস্ত দেনাও রেহাই দেওয়া হইল। অদ্য হইতে তোমার প্রাপ্য দ্বিগুণ হইবে। নিয়মিতভাবে রাজকর আদায় করিয়া নিজ বিত্ত ইচ্ছামত সৎকর্মে ব্যয় করিও। এখন হইতে সাবধানে থাকিবে রাজকোষে যেন দেনা না হয়।" অশ্রুপূর্ণ নয়নে গলবস্ত্রে গোপীনাথ রাজার চরণতলে পড়িয়া স্বীয় অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবার অঙ্গীকার করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

গোপীনাথ গৃহে ফিরিয়া এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তাঁহার পরিবারস্থ সকলের মনে অতীব বিস্ময় জন্মিল। কোথায় দেনার দায়ে অপমান, প্রাণদণ্ড আর কোথায় রাজসম্মান ও বিত্তলাভ! বৃদ্ধ পিতা ভবানন্দ রায়, যাঁহাকে চৈতন্যদেব 'পাণ্ডুরাজ' নামে অভিহিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন, এই খবর শুনিয়াই রামানন্দ রায় প্রমুখ পঞ্চপুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া চৈতন্য-দেবের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতঃ হইলেন। বৃদ্ধ সজলনয়নে করজোড়ে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আপনার কৃপাতেই গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। এখন আবার রাজানুগ্রহ সম্মান ও বিত্তলাভ হইল।" চৈতন্য-দেব তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাতেই সমস্ত, আমা হইতে কিছু নহে।" ভবানন্দ রায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! সংসার বড়ই অনর্থের হেতু। রামানন্দ, বাণীনাথ আপনার শ্রীচরণ-আশ্রয়ে পরমানন্দে শান্তিতে আছে, বাকীগুলিকেও আপনার চরণপ্রান্তে আশ্রয় দিয়া রাখিলে আমি নিশ্চিন্ত হইব।" রায়ের কথায় তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সকলেই বৈরাগী হইলে তোমার বহু গোষ্ঠীকে অন্ন দিবে কে?" তৎপরে তিনি রায়ের পুত্রগণকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিলেন, "রাজার ধন কখনও নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিও না। রাজার প্রাপ্য সর্বদা নিয়মিতভাবে

আদর করিয়া নিজ প্রাপ্য সৎকর্মে ব্যয় করিবে। কখনও অসদ্ব্যয় করিও না। তাহাতে ইহকালে ও পরকালে সর্বত্রই দুঃখভোগ করিতে হয়।" তাঁহার উপদেশে রায়ের পুত্রগণের স্বভাব ও মনের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছিল।

সন্ন্যাসি-চূড়ামণির কাঞ্চন সম্পর্ক ত্যাগ সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় তিনি এই অলৌকিক মহিমাপূর্ণ সন্ন্যাসীর সেবা ও প্রীতির জন্য যে-কোন প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কঠোর তপস্বী কামকাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবক ভগবদ্ভক্ত বলিয়া রাজার উপর স্নেহপ্রীতি রাখিলেও ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য কখনও রাজমুখাপেক্ষী হন নাই। এমনকি তাঁহার আশ্রিত ভক্ত গৃহীদিগের পক্ষেও বিষয়সুখের লালসায় রাজানুগত্য তিনি অতিশয় গর্হিত মনে করিতেন। এই বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠকগণ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগের ভাব ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির কথা বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য অদ্বৈতের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে চৈতন্যদেবের মধুর সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। আচার্য যেমন চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে সদা ভক্তি-প্রেম অর্পণ করিতেন, চৈতন্যদেবও তেমনি আচার্যদেবকে সাক্ষাৎ মহেশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। একবার রথযাত্রার সময়ে পুরীতে অবস্থানকালে, আচার্য একদিন পুষ্পচন্দন উপহারাদি দ্বারা চৈতন্যদেবকে পূজা করিলে পর তিনিও সেই পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন লইয়া আচার্যকে শিবজ্ঞানে পূজা করিলেন। এমনকি শিবভক্তিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া উল্লসিত অন্তরে শিবের স্তবপাঠ, গালবাদ্য এবং বগল বাজাইয়া আনন্দে নৃত্য করিলেন।

সুরসিক আচার্য মধ্যে মধ্যে প্রেমরস উপভোগ করিবার আশায় চৈতন্য-দেবের বিরক্তি উৎপাদন করিবার জন্য তৎপ্রচারিত ভক্তিমার্গের বিরোধী যুক্তি-তর্ক সহায়ে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা ও প্রচার আরম্ভ করিতেন। অপর লোকেরা তাঁহার অন্তরের গুপ্তভাব বুঝিতে না পারিয়া মনে করিত—ইনি চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধমতাবলম্বী। তখন অনেকে দুঃখিত হইয়া চৈতন্যদেবকে এই বিষয়ে জানাইলে তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক শান্ত করিতেন এবং আচার্যের উপর কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া তাঁহাকে শাসন করিতেন। ক্রোধের ভান করিয়া চৈতন্যদেব শাসন করিলেই আচার্যের প্রাণের আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হইত। তিনি প্রেমে উতলা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিতেন। এমনকি কখনও কখনও সেই প্রেমানন্দে বাহ্যহারা হইতেন। এইভাবে চৈতন্যদেবকে আপনার রূপে পাইবার এবং তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিবার জন্য আচার্যের কপট বিরুদ্ধভাবাবলম্বন বরাবরই চলিত। অন্তরঙ্গ ভক্তগণও সেই আনন্দরস বিশেষ-ভাবে উপভোগ করিতেন। কিন্তু বাহিরের লোকেরা বুঝিতে না পারিয়া

অন্যরূপ ধারণা করিত। সন্ন্যাসগ্রহণান্তে চৈতন্যদেবের নীলাচলে বাসকালে আচার্য তাঁহাকে দর্শন করিবার আশায় প্রতি বৎসর রথযাত্রায় নীলাচলে আসিতেন। এমনকি শেষ জীবনে বৃদ্ধ শরীরেও এতদূর পায়ে হাঁটিয়া বিদেশ-যাত্রার কষ্ট গ্রাহ্য করিতেন না।

কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্যের একজন অতি অনুগত সেবক ছিলেন। ভগবদ্‌ভাবে বিভোর, বিষয়রক্ষায় উদাসীন আচার্যের গৃহ-সংসারের সুচারুরূপে রক্ষার জন্যই, ভগবদিচ্ছায় বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বস্ত অনুগত সেবক জুটিয়াছিল নিশ্চয়। আচার্য-পরিবারের সেবা, তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ বিশ্বাসের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল। শেষ বয়সে উপার্জনের অক্ষমতায় হউক কিংবা ব্যায়াধিক্যের জন্যই হউক, অদ্বৈত আচার্য কোন সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টা করিয়াও সেই ঋণ শোধ করিতে না পারায় বিশ্বাসের মনে বিষম ভাবনা হইল। সেই সময়ে রথোপলক্ষে আচার্য পুরী আসিলে বিশ্বাসও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। পুরী বাস করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের দান, ধ্যান ও মহত্ত্বের কথা কমলাকান্ত বিশেষভাবে অবগত হইলেন। ক্রমে চৈতন্যদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রতি রাজার অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং তাঁহাদের সেবার জন্য অপরিসীম আগ্রহের কথাও বিশ্বাসের কর্ণগোচর হইল। বিশ্বাস এতদিনে ঋণশোধের পথ খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি আচার্যের ঋণমোচনের জন্য রাজার নিকট তিনশত মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া, আচার্যের মাহাত্ম্যপূর্ণ এক সুদীর্ঘ পত্র রাজাকে লিখিয়া বসিলেন।

ঘটনাক্রমে সেই পত্রের কথা চৈতন্যদেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি যখন শুনিলেন, বিশ্বাস রাজার নিকট আচার্যের জন্য ধন প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। কমলাকান্ত স্বীয় পত্রে অদ্বৈতাচার্যের মহিমা খ্যাপন করিবার জন্য আচার্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার পত্রের ভাষা ও ভাব শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচার্য ঈশ্বর নিশ্চয় ইহাতে সন্দেহ নাই, তবে ঈশ্বরের দীনতা প্রকাশ করিয়া অর্থ ভিক্ষা অতিশয় গর্হিত কর্ম।" রাজার নিকট অর্থ প্রার্থনা করায় কমলাকান্তের প্রতি চৈতন্যদেবের অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। তিনি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া গোবিন্দকে আদেশ করিলেন "বিশ্বাসকে এখানে আর আসিতে দিও না। আমি আর তাহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না।" ভক্তগণের পক্ষে প্রভুর বিরক্তিভাজন ও দর্শনলাভে বঞ্চিত হওয়া সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি, গোবিন্দের মুখে তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া বিশ্বাসের প্রাণ ধড়ফড় করিতে লাগিল, স্বীয় নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া বিশেষ সন্ত্রস্ত হইলেন। অনুতপ্ত বিশ্বাস, প্রতিকারের অন্য কোন উপায় না

দেখিয়া শেষে প্রভু আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন। তাহার মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আচার্যের অন্তরেও অসহ্য ক্ষোভের সঞ্চার হইল। তিনি দুঃখিতচিত্তে বিশ্বাসকে প্রথমে এইরূপ নিন্দনীয় কার্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। পরে প্রভুভক্ত সহজ-সরলবুদ্ধি কমলাকান্ত প্রভুর জন্যই এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে, নিজের বিন্দুমাত্র স্বার্থ ইহাতে নাই ভাবিয়া অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ায় তাহাকে ভরসা দিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

অর্থভিক্ষার জন্য বাহিরে বিষম বিরক্তির ভাব দেখাইলেও, চৈতন্যদেবের অন্তরে বিশ্বাসের প্রতি তাহার অতুলনীয় প্রভুভক্তির জন্য বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। কয়েকদিন পরে সুযোগ বুঝিয়া আচার্য একদিন কমলাকান্তকে লইয়া গিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিলেন এবং বিনয়প্রকাশপূর্বক বিশ্বাসের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করাইলেন। আচার্যের বাক্যে তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া চৈতন্যদেব বিশ্বাসকে ভবিষ্যতে সাবধান থাকিবার জন্য বলিয়া দিলেন।

"প্রভু কহে বাউলিয়া বিশ্বাস ঐছে কাহে কর।
আচার্যের লজ্জা ধর্ম হানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ী অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নয় কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্মকীর্তি হানি।
ঐছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥"

মনকে ভগবদ্‌বিমুখ করে বলিয়া, কাঞ্চন সংস্রব ও ধনৈশ্বর্য হইতে সন্ন্যাসি-চূড়ামণি স্বয়ং যেমন সর্বদা দূরে থাকিতেন এবং ভক্তগণকেও বিশেষ সাবধান করিতেন; তেমনই কামাসক্তি হইতেও চিত্তকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রাখার জন্য, কামিনী-সংস্রবও সর্বতোভাবে পরিবর্জন করা তাঁহার অন্যতম প্রধান শিক্ষা ছিল। তিনি এই বিষয়ে স্বয়ং সাবধান থাকিতেন, অপরকেও সাবধানে রাখিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ছোট হরিদাসের ঘটনা হইতেই ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য আরও দুই-তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পুরী আসিতেন। কোন কোন ভক্তের পরিবার এবং অন্যান্য আত্মীয়া ভক্তিমতী মহিলাগণও চৈতন্যদেবকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতেন। ঐ সকল ভক্তিমতী মহিলাগণের অনেকেই প্রাচীনা, এবং তাঁহার পূর্বপরিচিতা। বহুকষ্ট স্বীকারপূর্বক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া

জননীসদৃশ স্নেহশীলা ঐ সকল ভদ্রললনা পুরীতে আসিতেন শুধু তাঁহারই দর্শনের আশায়। চৈতন্যদেব নিজেও ইঁহাদের উপর খুব প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন এবং অনেককে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেই কি হয়, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়মভঙ্গ করিয়া তিনি ঐ সকল পরম পবিত্রা পুণ্যচরিত্রা নারীদিগকে নিকটে আসিতে দিতেন না। দূর হইতে দর্শন-প্রণাম করিয়াই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ঐ সকল জননীগণ বহু যত্ন করিয়া স্বদেশ হইতে অনেক প্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতেন সত্য, কিন্তু স্বহস্তে তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার উপায় ছিল না। ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষায় ঐরূপে আনীত নানা দ্রব্য রন্ধন নিজেরা করিতেন বটে, কিন্তু স্বহস্তে পরিবেশন করিতে পারিতেন না, পতিপুত্রের হাত দিয়াই তাঁহাকে খাওয়াইতে হইত। এইরূপ ঘটনা কত ঘটিয়াছে তাহার সীমা নাই। এমনকি আচার্য-গৃহিণী, শ্রীবাসপত্নী প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহাকে ছোটবেলা হইতে পুত্রবৎ বাৎসল্য-ভাবে দেখিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না।

নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর পার্শ্বে পরমেশ্বর নামক জনৈক মোদকের বাস ছিল। মোদকদম্পতি বালক নিমাইকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের স্নেহ ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া নিমাই সর্বদা তাঁহাদের ঘরে যাতায়াত করিতেন, এবং তাঁহারাও মনের সাধে নানা প্রকার ভাল ভাল মিঠাই তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার পরেও মোদক-দম্পতীর অন্তর হইতে সেই স্নেহের টান মুছিয়া যায় নাই। একবার তাঁহারা বহু আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় পুরীতে উপস্থিত হন। বহুদিন পরে পরমেশ্বরকে দেখিয়া চৈতন্যদেবের মনে হর্ষের উদয় হইল, তিনি তাঁহার কুশল সমাচারাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আদরযত্ন করিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে বৃদ্ধ মোদকের প্রাণ গলিয়া গেল, হৃদয়ে স্নেহ উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ উল্লসিত হইয়া জানাইল, 'মুকুন্দার মা' (মোদকপত্নী)-ও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মোদকের প্রাণে আশা ছিল তিনি 'মুকুন্দার মা'-কেও কাছে ডাকিয়া পূর্বের ন্যায় আদর-আপ্যায়ন করিবেন,—কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। 'মুকুন্দার মা'র নাম শুনিয়াই তিনি সঙ্কোচ বোধ করিলেন, কাজেই বৃদ্ধা মোদকপত্নীকেও দূর হইতেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

পরবর্তীকালে ভগবদ্ভাবেই অধিকাংশ সময় বিভোর থাকায় বাহ্য জগতের সম্পর্ক—লৌকিক ব্যবহারও যখন কঠিন হইয়া পড়িল, তখনও তিনি স্ত্রীলোকের সম্পর্ক হইতে সর্বদাই দূরে থাকিতেন। সেই সময়ে একদিন অপরাহ্ণে বেড়াইবার সময়ে সমীপবর্তী উদ্যান হইতে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। সুমধুর কণ্ঠে বিশুদ্ধ তাল-মান-লয়ে গীত জয়দেব

গোস্বামী-বিরচিত গীতগোবিন্দের পদ কর্ণে প্রবেশ করায় চৈতন্যদেবের মন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া ভাবে বিভোর হইল। তিনি সঙ্গীতের মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে ছুটিয়া চলিলেন। "কে গাহিতেছে? কোথায় গাহিতেছে?" এ সকল কথা চিত্তে জাগিল না। গোবিন্দ ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। ভাবে বিভোরচিত্ত চৈতন্যদেব ছুটিয়া চলিলে গোবিন্দও পিছনে পিছনে দৌড়াইলেন। রাস্তা ভাল নহে, আশেপাশে কাঁটা জঙ্গল, কিন্তু চৈতন্যদেব এমন তন্ময়ভাবে ছুটিয়াছেন যে ঐ সকল বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য হইতেছে না। একটু অগ্রসর হইয়া গোবিন্দ বুঝিলেন স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। কোন দেবদাসী উপবনে বসিয়া গাহিতেছে। চৈতন্যদেব তখন অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ পিছন হইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কণ্ঠ বোধ হইতেছে।" প্রজ্বলিত অগ্নিতে সলিল প্রক্ষেপের ন্যায় স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া উদ্দীপ্তভাব তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়া গেল। গোবিন্দ নিকটে গিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "কোন দেবদাসী গাহিতেছে বলিয়া মনে হয়।" ভাববিহ্বল অবস্থায় নিকটস্থ হইলে, এমন সুমধুর প্রেমসঙ্গীত শুনিয়া গায়ককে প্রেমালিঙ্গন করার সম্ভাবনা ছিল; সেইজন্য গোবিন্দ সাবধান করিয়া দেওয়াতে তাঁহার প্রতি চৈতন্যদেবের মন অতিশয় প্রসন্ন হইল।

> "প্রভু কহে গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন।
> স্ত্রীপরশ হইলে হইত আমার মরণ॥
> এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
> গোবিন্দ কহেন জগন্নাথ রাখেন মুই কোন ছার॥
> প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা।
> যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥"

"জিতং সর্বং জিতে রসে"—রসনেন্দ্রিয় সংযম থাকিলে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করা সহজ। চৈতন্যদেব সেইজন্য আহার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিচার-বিবেচনা করিয়া চলিতেন। "ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ" সম্প্রদায়গুরু আচার্য শঙ্করের এই উপদেশ তিনি আজীবন প্রাণপণে পালন করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পর ভিক্ষান্ন ছাড়া তিনি অন্য কোন আহার গ্রহণ করেন নাই, এমনকি স্বীয় রুচি-অভিলাষানুযায়ী আহারের জন্য কখনও কোনপ্রকার আয়োজন উদ্যোগ কিংবা কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় না। আহার সম্বন্ধে তাঁহার খুবই সংযম ছিল। বিশেষ অন্তরঙ্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে পড়িয়া কদাচিৎ তাঁহাদের অভিলাষানুযায়ী কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিলেও সদাসর্বদা 'রুখা-শুখা' সুলভ অনাড়ম্বর ভক্ষ্য দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণেরা অভিলষিত দ্রব্য স্বগৃহে রন্ধন করতঃ কখনও কখনও ভিক্ষা দিতেন বটে,

কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও প্রধান ভক্ষ্য ছিল। সেজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন তাঁহার ভিক্ষার জন্য কেহ চারি পণ কৌড়ির (এক আনার সমান) বেশী মূল্যের মহাপ্রসাদ আনিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণেতর ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রসাদ কিনিয়া ভিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে কেহ তাঁহার ভিক্ষার ব্যয়বাহুল্য না করেন, সেই জন্যই এইরূপে মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে সকল বস্তুই সুলভ ছিল সন্দেহ নাই; তাহা হইলেও ঐ চারিপণ কৌড়ির মহাপ্রসাদ দ্বারা সেবকদ্বয় ও স্বয়ং তিনি—এই তিন জনের উদরপূর্তি কঠোরতার চূড়ান্ত বলা যায়।

শ্রীরামচন্দ্র পুরী নামক শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য পুরীতে আসিয়া একদা উপস্থিত হন। নিজগুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর গুরু-ভ্রাতা জানিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ভক্তি-প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ মাধবেন্দ্র স্বামীর শিষ্য হইলেও রামচন্দ্র শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন। ভক্তিমার্গ ও ভগবদ্-উপাসনাতে তাঁহার খুব বিশ্বাস-নিষ্ঠা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে মাধবেন্দ্র পুরী অন্তিমশয্যায় শায়িত হইয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ব্যাকুল ভাবে যখন ভগবানের নাম লইতেছিলেন রামচন্দ্র তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিদ্ হইয়া কেন করহ রোদন॥"

অজ্ঞ শিষ্যের ধৃষ্টতা দেখিয়া মাধবেন্দ্রের অন্তরে খুব দুঃখ হইল। তিনি রামচন্দ্রের মুখ দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে দূরে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভগবানের প্রিয়ভক্ত মাধবেন্দ্র তাঁহার পাদপদ্মে চিরমিলিত হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

নিজেকে তত্ত্বজ্ঞানী মনে করিয়া গর্বিত রামচন্দ্র অন্যের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দা প্রচার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাহিরের চালচলনে তাঁহার খুব বৈরাগ্যের ভাব দেখা যাইত। বাসস্থানের কোন ঠিকঠিকানা নাই—'যেখানে রাত সেখানে কাত'। ভিক্ষাও 'যখন যেমন জুটে'। এইরূপে বাহ্যিক 'বিরক্ত্' রামচন্দ্র পুরীতে আসিয়াই চৈতন্যদেবের দোষ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুই বাহির করিতে সক্ষম হইলেন না। একদিন সকালবেলা রামচন্দ্র চৈতন্য-দেবের কুঠিয়াতে গিয়াছেন। তিনিও পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ রামচন্দ্রের নজরে পড়িল চৈতন্যদেবের কুঠিয়ার ভিতরে ছোট ছোট পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এতদিন পরে রামচন্দ্র নিন্দা করিবার সূত্র পাইলেন, গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "গতরাত্রে নিশ্চয়ই এখানে মিষ্টি পড়িয়াছিল, তাহা না হইলে পিপীলিকা

আসিবে কেন!" রামচন্দ্র সূত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন—"আহারে সংযম না থাকিলে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না, সংযমী ব্যক্তি কখনও মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করেন না, চৈতন্য সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করে! ইঁহার ইন্দ্রিয় কিরূপে সংযত থাকিবে?"

"সন্ন্যাসী হইয়া কর মিষ্টান্ন ভোজন।
এইভাবে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥"

এইরূপ বলিতে বলিতে রামচন্দ্র দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং চারিদিকে চৈতন্যদেবের নিন্দা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চৈতন্যের আহারে সংযম নাই অতএব ইন্দ্রিয়সকলও অতিশয় প্রবল বলিয়া রামচন্দ্র তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিলেন।

লোকমুখে ঐ সকল কথা চৈতন্যদেবের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি গোবিন্দকে আদেশ করিলেন, "অদ্য হইতে ভিক্ষার জন্য মহাপ্রসাদ যেন কম আনা হয়। পূর্বে যাহা বরাদ্দ ছিল এখন তাহার চতুর্থাংশ ব্যয় হইবে। অল্প মূল্যের প্রসাদ ও সামান্য ব্যঞ্জন, ইহার অন্যথা হইলে গ্রহণ করিব না।" আদেশ পাইয়া গোবিন্দের অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের স্বভাব তাঁহার ভালরূপে জানা ছিল, যেমন কথা তেমনি কাজ—কাজেই দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিলেন। সেইদিন ভিক্ষার জন্য জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের মুখে চৈতন্যদেবের কঠোর আজ্ঞার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। তাহার অন্তরে কতদিনের প্রবল সাধ সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া ভিক্ষা দিবেন। আজ এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া হৃদয় অবসন্ন হইল,—কিন্তু কি করিবেন? প্রতিকারের পথ নাই, অগত্যা নিরুপায় হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী অল্প পরিমাণ মহাপ্রসাদই কিনিয়া আনিলেন এবং সেবক গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের সহিত চৈতন্যদেব তাহা দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তদবধি সেইরূপ অত্যল্প মহাপ্রসাদেরই নিত্য ব্যবস্থা হইল। গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে পেট ভরিয়া খাইবার জন্য বলিয়া কহিয়া অন্যত্র পাঠাইলেও চৈতন্যদেব নিজে আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। এই ভাবে আহার কমিয়া যাওয়াতে কয়েকদিনের মধ্যেই চৈতন্যদেবের দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার এইরূপ অর্ধাশন দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। সেবক ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণও চক্ষের জল ফেলিয়া অর্ধাশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

লোকমুখে চৈতন্যদেবের স্বল্পাহারের খবর পাইয়া রামচন্দ্র একদিন দেখিতে আসিলেন এবং স্বচক্ষে তাঁহার ক্ষীণ ও দুর্বল দেহ দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র

তখন শুভানুধ্যায়ীর ভানে বিজ্ঞের ন্যায় চৈতন্যদেবকে অন্যভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ।
যৈছে তৈছে কর মাত্র উদর ভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধরম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয়ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধি হয় জ্ঞানযোগ॥"

চৈতন্যদেব পূর্বের ন্যায় বিনীতভাবে অতিশয় সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন, "আমি আপনার শিষ্যস্থানীয়, আমার বহু ভাগ্য যে আপনি এইভাবে আমাকে সৎশিক্ষা দিতেছেন।"

"প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেও এই ভাগ্য আমার॥"

রামচন্দ্র তাঁহার বাক্য-ব্যবহারে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ভিক্ষাব পরিমাণ বাড়াইলেন না। স্বল্পাহারেই দিন কাটিতে লাগিল। দেহ ক্রমশঃ অধিকতর কৃশ ও দুর্বল হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। পরে একদিন শ্রীমৎ পরমানন্দজী মহারাজ আসিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ আরম্ভ করিলেন আহারের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য। পরমানন্দজী রামচন্দ্রের স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র নিন্দুকস্বভাব। উহার কথায় মিছামিছি এভাবে দেহ-নির্যাতন করা ও ভক্তগণের প্রাণে দুঃখ দেওয়া ঠিক হইতেছে না।" অতি বিনীতভাবে রামচন্দ্রকে সমর্থন করিয়া—

"প্রভু কহেন সবে কেন পুরীকে কর রোষ।
সহজ ধর্ম কহেন তেঁহো তাঁর কিবা দোষ॥
যতি হইয়া জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥"

পরমানন্দ স্বামীকে চৈতন্যদেব খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং সর্ববিষয়ে মান্য করিয়া চলিতেন। তাঁহার আদর-অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আহারের পরিমাণ কিছু বাড়াইতে স্বীকৃত হইলেন। সেইদিন হইতে দুইপণ কৌড়ির অর্থাৎ পূর্বে যাহা ছিল তাহার অর্ধেক ভিক্ষার পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রপুরী তীর্থপর্যটনে অন্যত্র গমন করিলে ভক্তগণের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। তাঁহারা ভিক্ষার পরিমাণ বাড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল না। এখন হইতে বরাবরের জন্য দুই পণ কৌড়ির মহাপ্রসাদই বরাদ্দ রহিল। তবে অন্তরঙ্গ গৃহস্থ ভক্তগণের অনুরোধে কখনও কখনও তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য কিছু ব্যতিক্রম করিতে হইত। তিনি তাঁহাদের প্রস্তুত ও পরমাগ্রহে প্রদত্ত জিনিস সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেন না,—কিছু কিছু গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার অনাড়ম্বর লঘুপাক আহার্যদ্রব্যে বিশেষ প্রীতির পরিচয় দিবার জন্য আমরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। রথযাত্রার কালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পাথেয়াদি যিনি বহন করিতেন সেই ধনী জমিদার শ্রীযুক্ত শিবানন্দ সেনের বালক পুত্র,—চৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত, চৈতন্যদাস একবার পিতার সঙ্গে পুরীতে আসিয়াছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তেরা সকলেই প্রিয় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন এবং সেইজন্য যথাসাধ্য আয়োজন-উদ্যোগ ও উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সংগ্রহে ত্রুটি করিতেন না। ধনী জমিদার শিবানন্দ সেনের ত কথাই নাই। ঐ উদ্দেশ্যে সেনদম্পতি কত ভাল ভাল জিনিস বাংলা দেশ হইতেই কষ্ট স্বীকার পূর্বক আনয়ন করিতেন; আবার কত কি পুরীতেই সংগৃহীত হইত। ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য চৈতন্যদেব ঐ সকল বস্তু নামে মাত্র গ্রহণ করিলেও বেশী পছন্দ করিতেন না। শিবানন্দের বালক পুত্র চৈতন্যদাস একদিন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। বয়স অল্প হইলেও চৈতন্যদেবের রুচি ও স্বভাব বালক বিলক্ষণরূপে অবগত ছিল। চৈতন্যদাস তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য পিতামাতার ন্যায় কোন প্রকার উদ্যোগ আড়ম্বর করিল না। তখন গ্রীষ্মকাল, তাঁহার বিশেষ রুচিকর হইবে বুঝিয়া বালক জগন্নাথের 'পান্তা' মহাপ্রসাদ, কাগজি লেবু, আদাকুচি, লবণ, তৎসহ বড়িভাজা ব্যবস্থা করিয়াছিল। এইরূপ সরল অনাড়ম্বর, শরীরমনের তৃপ্তিদায়ক, সহজপাচ্য ভক্ষ্য দেখিয়া চৈতন্যদেবের আনন্দের সীমা রহিল না। অতিশয় তৃপ্তির সহিত বালকের ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন, এবং আহারান্তে বালকের বিবেচনাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এই বালকই ঠিক ঠিক আমার অন্তর বুঝিতে পারিয়াছে।"

চৈতন্যদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ কিরূপ কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন, আহার-বিহারে তাঁহাদের কিরূপ সংযম ছিল এ-সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চৈতন্য-দেবের বাল্যসখা ও প্রিয় সঙ্গী, বিনয়-নম্রতা ও ভক্তিপ্রেমের প্রতিমূর্তি গদাধরের কথা পাঠকগণের অবশ্যই মনে আছে। পরমপ্রেমিক কঠোর বৈরাগী ব্রহ্মচারী গদাধর পুরীর দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রকিনারে অতি নির্জন স্থানে

একটি কুঠিয়ায় থাকিয়া ভগবদ্‌ভজনে নিরত ছিলেন। গদাধরের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণভাবে আড়ম্বরবর্জিত ছিল,—নিতান্ত সহজ-সরলভাবে 'যদৃচ্ছা-লাভসন্তুষ্ট' থাকিয়া কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনযাপন করিতেন। চৈতন্য-দেবের সাহচর্যে, ত্যাগ-তপস্যার আনন্দে ও ভগবদনুভূতির উল্লাসে তাঁহার অন্তর সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার এবং স্নিগ্ধ মধুর বাণী সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিত। সমুদ্রস্নানান্তে কখনও কখনও চৈতন্যদেব গদাধরের কুঠিয়ায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনাদি করিতেন। একদিন এইরূপে স্নানান্তে তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। চৈতন্যদেব মৃদুমধুর হাস্যে গদাধরকে মোহিত করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, অদ্য তোমার এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করিব।" অপ্রত্যাশিত এই আবদারে গদাধরের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষম ভাবনার উদয় হওয়াতে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের সঞ্চার হইল। হায়! প্রাণাধিক প্রিয়তম আজ নিজে যাচিয়া খাইতে আসিয়াছেন। ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু তাঁহাকে কি দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন? অতি অকিঞ্চন তিনি, তাঁহার কুঠিয়ায় ত কিছুই নাই। যাঁহাকে সাধ্যসাধনা করিয়াও লোকে পায় না, শত চেষ্টা করিয়া বহু কষ্টে অতি দুর্লভ উপাদেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াও লোকে যাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পায় না, তিনি আজ দুয়ারে দাঁড়াইয়া স্বয়ং ভিক্ষা চাহিতেছেন। কিন্তু কি দিবেন? তাঁহাকে দেওয়ার মত বস্তু ভিক্ষুক ব্রহ্মচারীর কুঠিয়ায় কি থাকিতে পারে!

ভাবে প্রেমে বিভোর গদাধর চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিকটবর্তী বাগান হইতে কিছু শাক সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়া রাঁধিলেন। কুঠিয়াতে একটি বেগুন ছিল, কচি নিমপাতা আনিয়া নিম-বেগুন ভাজা করিলেন, আর সমীপবর্তী তেঁতুল বৃক্ষের পাতা দিয়া একটু অম্বল হইল। এদিকে চৈতন্য-দেবের প্রবল ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তিনি গদাধরকে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করিবার জন্য তাগাদা দিতে লাগিলেন। গদাধর অতিশয় বিনম্রবচনে তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেও, তিনি যেন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিজেই পাতা লইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বারংবার ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। গরীব-দুঃখীর উপযোগী অতি সামান্য দ্রব্য তাঁহার পাতে দিতে গদাধরের অন্তর দুঃখে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে, গদাধর প্রেমিক সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিলেন। সেই পবিত্র শাক-অন্নের অপূর্ব পবিত্র সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেব তাহার খুব প্রশংসা করিতে করিতে পরমতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন; এবং গদাধরের আনন্দ বর্ধন

করিয়া স্বয়ং প্রত্যেক জিনিস চাহিয়া লইলেন। এই সকল সামান্য উপকরণ তাঁহার নিকট অতিশয় পবিত্র, সাত্ত্বিক ও পরমপ্রীতিদায়ক বোধ হইল; এবং হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "এমন সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন কখনও খাইতে পাই না।" পরমানন্দে ভোজন সমাপ্ত করিয়া চৈতন্যদেব গদাধরকে রহস্য করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! এমন ভাল রান্না কোথায় শিখিলে? গত জন্মে তুমি বোধ হয় বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী ছিলে। এমন ভাল ভাল জিনিস রাঁধিয়া চুপি চুপি নিজে খাও, আমাকে দাও না! এখন মধ্যে মধ্যে তোমার কুঠিয়াতে ভিক্ষা করিতে আসিব।" চৈতন্যদেবের প্রীতি-ভালবাসাতে গদাধরের নেত্র হইতে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই অদ্ভুত ভিক্ষার কথা শুনিয়া ভক্তগণও বিমোহিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের রসনেন্দ্রিয়ের সংযম সম্বন্ধে শোনা যায়, সার্বভৌম তাঁহার জিহ্বাতে চিনি দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শুষ্ক বালির মত চিনি তাঁহার জিহ্বা হইতে ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল—বিন্দুমাত্র রসস্পর্শ হয় নাই।

আহারের ন্যায় পোশাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধেও চৈতন্যদেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দেহের আরাম, ভোগবিলাস তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছিলেন। এজন্য স্নেহশীল ভক্ত অন্তরঙ্গগণের প্রাণ দুঃখে ফাটিয়া যাইত। তাঁহারা তাঁহার দেহকে অতিশয় যত্নে রক্ষা করিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ-উপরোধ বিশেষ রক্ষা করিতে পারিতেন না। এই বিষয়ে পণ্ডিত জগদানন্দের কাহিনী শুনিলেই পাঠক তাঁহার চরিত্র বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবেন। জগদানন্দ গদাধরের ন্যায়ই চৈতন্যদেবের বাল্যসখা ও চিরসঙ্গী। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পর জগদানন্দও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পুরী আসিয়া বাস করিতে থাকেন। জগদানন্দ গদাধরের ন্যায়ই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্যাশ্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে গদাধর যেমন ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া বরাবর পুরীবাস করিয়াছিলেন জগদানন্দ সেরূপ করেন নাই। জননী ও ভক্তগণের খবরাদি লইবার জন্য চৈতন্যদেব কখনও কখনও জগদানন্দকে গৌড়ে পাঠাইতেন। আবার পণ্ডিত অন্য এক সময়ে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্যটনেও গিয়াছিলেন। নিজে ত্যাগ-তিতিক্ষা সাধন-ভজনে জীবন যাপন করিলেও জগদানন্দ চৈতন্যদেবের অত্যধিক কঠোরতা পছন্দ করিতেন না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চৈতন্যদেবের অতিশয় কঠোরতাপূর্ণ সন্ন্যাসজীবন, আহারে বিহারে অত্যধিক সংযম ও কড়াকড়ি নিয়ম দেখিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তিনি সদাসর্বদা তাঁহাকে ভাল খাওয়াইতে পরাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু আদর্শ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী অধিকাংশ সময়েই জগদানন্দের ঐ সকল চেষ্টা সফল হইতে দিতেন না।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী যে মূল্যবান বস্ত্র মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অভিলাষানুযায়ী চৈতন্যদেবকে নন্দ-উৎসবের সময় দেওয়া হইত তাহা তিনি মস্তকে স্পর্শ করিয়া গ্রহণ করিলেও নিজে কখনও ব্যবহার করেন নাই। শ্রীমৎ পরমানন্দ পুরীকে তিনি গুরুবৎ মান্য করিতেন এবং সর্বদা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। পুরীজীর অভিপ্রায়মত সেই বস্ত্র নবদ্বীপে শচীদেবীর নিকট প্রেরিত হইত। কেহ কেহ অনুমান করেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্দেশ্যেই পুরীজি মহারাজ ঐ মূল্যবান বস্ত্র শচীদেবীর নিকট পাঠাইতে বলিয়া থাকিবেন। কারণ, ঐরূপ মূল্যবান সুন্দর বস্ত্র বৃদ্ধার উপযোগী নহে এবং সুন্দর বস্ত্র বধূকে দিয়া শাশুড়ীর অধিক আনন্দ হয়। প্রথমে গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীবাসের হাতেই মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র-ডোরি পাঠানো হইত। পরে দামোদর পণ্ডিতের সঙ্গে পাঠাইতেন। আবার কখনও কখনও জগদানন্দের সঙ্গেও প্রেরিত হইত বলিয়া জানা যায়।

একবৎসর জগদানন্দ চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রসাদী বস্ত্র, মাল্য-চন্দন ও মহাপ্রসাদ লইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন। শচীদেবীকে প্রণাম করতঃ জগদানন্দ ঐসকল প্রসাদী দ্রব্য দিয়া তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কুশলসমাচারাদি নিবেদন করিলেন। পুত্রের সমাচার পাইয়া শচীর আনন্দের সীমা রহিল না। জগদানন্দকে পুত্রবৎ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কয়েকদিন নিকটে রাখিলেন এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাসী নিমাইয়ের খবরবার্তা শুনিয়া বৃদ্ধা প্রাণ জুড়াইলেন। জগদানন্দ নবদ্বীপ ও নিকটবর্তী স্থানসমূহ ভ্রমণ করতঃ ভক্তগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিলেন এবং চৈতন্য-দেবের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ-চন্দনাদি দিয়া সকলকে তাঁহার প্রীতি-ভালবাসাদি জানাইলে তাঁহার প্রাণ পুলকিত হইল। জগদানন্দ শান্তিপুরে গিয়া আচার্যের সহিত মিলিত হইয়া, তৎপরে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তাঁহার আবাসস্থানে গমন করিলেন। যাইবার পথে বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করিয়া সকলকেই চৈতন্যদেবের কুশলসমাচার জানাইয়া আনন্দিত করিলেন। এইরূপে শ্রীবাসাদি সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে জগদানন্দের মিলন হইল। তাঁহার নিকট হইতে চৈতন্যদেবের কুশলবার্তা ও তৎপ্রেরিত মহাপ্রসাদাদি পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। জগদানন্দ এই-ভাবে কিছুকাল গৌড়দেশে অবস্থান করিয়া, চৈতন্যদেবের জন্য জননীর স্নেহাশীর্বাদ ও ভক্তগণের ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম-নিবেদন-উপহারাদি লইয়া পুরী ফিরিয়া আসিলেন।

ফিরিবার পথে পরমভক্ত বৈদ্যকুলতিলক শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে কয়েক-দিন থাকিয়া জগদানন্দ চৈতন্যদেবের জন্য বায়ুশান্তিকর সুস্নিগ্ধ চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইলেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিশেষ যত্নে উক্ত তৈল খুব

চমৎকার সুগন্ধও করা হইল। কঠোর সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও রাত্রিজাগরণাদির ফলে দেহে স্বভাবতঃই বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি হয় এবং তাহার পরিণামে সুনিদ্রাও হয় না; দেহ কৃশ ও দুর্বল হয়। চৈতন্যদেবের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া জগদানন্দের প্রাণে বিষম দুঃখ হইত। সেই জন্যই এই সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইয়া কলসীতে পূর্ণ করিয়া লোকের মাথায় দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। উদ্দেশ্য,—অতিশয় স্নিগ্ধকর এই তৈল ব্যবহার করিয়া চৈতন্যদেবের কঠোর সাধনভজনজনিত বায়ুর প্রকোপ শান্ত হইবে, শরীর সুস্থ থাকিবে, দেহকান্তি সুন্দর হইবে। পুরীতে আসিয়া পোঁছিয়া জগদানন্দ সেই তৈল-পূর্ণ কলসী চৈতন্যদেবের সেবক গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই তৈল অল্প অল্প করিয়া প্রত্যহ প্রভুর মস্তকে দিও। ইহাতে বায়ুপিত্ত শান্ত থাকে।" জগদানন্দের অভিপ্রায়ানুযায়ী গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে এই কথা নিবেদন করিলে গম্ভীর ভাবে—

> "প্রভু কহে, সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
> তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
> জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
> তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥"

পরদিন জগদানন্দ আসিয়া গোবিন্দের নিকট খবর লইয়া যখন জানিলেন, চৈতন্যদেব তৈল মাথায় দিতে অস্বীকৃত হইয়া উহা শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য দিতে বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হওয়াতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

জগদানন্দের অন্তর গোবিন্দ ভালরূপে জানিতেন, তিনি তাঁহার মনোব্যথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কয়েকদিন পরে আবার চৈতন্যদেবকে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, "একটু তেল মাথায় মাখিলে পণ্ডিতের মনোরথ পূর্ণ হয়।" গোবিন্দের অন্যায় আবদারে চৈতন্যদেবের মনে বিরক্তির সঞ্চার হইল। সন্ন্যাসি-চূড়ামণি তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্যে সেবককে তিরস্কার করিলেন।

> "শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচন।
> মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দন॥
> এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
> আমার সর্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥
> পথে যাইতে তেল গন্ধ মোর যে পাইবে।
> দারী[১] সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥"

১ দারী—দার-পরিগ্রহকারী; বিবাহিত; স্ত্রীসঙ্গী।

গোবিন্দ আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। ইহার পরদিন জগদানন্দ আসিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় প্রেমভাবে বলিলেন, "জগদানন্দ, সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করা সন্ন্যাসীর পক্ষে বড়ই নিন্দনীয়,—কাজেই উহা আমার ব্যবহার করা চলিবে না। তুমি বহুকষ্ট করিয়া দূর দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছ। উহা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় দান কর। তাঁহার প্রদীপ জ্বলিলে তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।" জগদানন্দের অন্তরে এই সুমিষ্ট বাক্যও শেলসম বিদ্ধ হইল। কত কষ্ট করিয়া তৈল আনিয়াছেন—তাঁহার মাথায় মাখিলে শরীর স্নিগ্ধ হইবে বলিয়া, আর তিনি বলেন তৈল মাথায় দিলে লোক বলিবে চরিত্রহীন সন্ন্যাসী। তিনি আদর করিয়া কোথায় মাথায় মাখিবেন, না উল্টা সমঝিয়া বলিতেছেন, "জগন্নাথের প্রদীপে জ্বালাও।" জগদানন্দের আর সহ্য হইল না। "কে বলিল তোমার জন্য তৈল আনিয়াছি?" জগদানন্দ অভিমানভরে চৈতন্যদেবকে এই কথা বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে তৈলের কলসী বাহিরে আনিয়া সক্রোধে উঠানে ছুড়িয়া ফেলিলেন। মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইল। তৈল চারিদিকে গড়াইয়া চলিল। অশ্রু বিসর্জন করিয়া জগদানন্দ সেই তৈলের উপর দিয়াই ছুটিয়া গেলেন। জগদানন্দ কুটিরে গিয়া দরজায় খিল দিয়া পড়িয়া রহিলেন,—স্নানাহার বন্ধ।

পরের দিন ভক্তগণের মুখে চৈতন্যদেবের নিকট জগদানন্দের খবর পৌঁছিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার বাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেব অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু জগদানন্দ কোন জবাব দিলেন না, দরজাও খুলিলেন না। তখন তাঁহাকে খুশী করিবার অন্য উপায় না পাইয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, 'জগদানন্দ, অদ্য আমি তোমার এখানেই ভিক্ষা করিতে আসিব, শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন ও সমুদ্রস্নান করিয়া আসিতেছি। তাড়াতাড়ি ভিক্ষার ব্যবস্থা কর।" 'সাধুর রাগ জলের দাগ'—জগদানন্দের মন খুশী হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং চৈতন্যদেবের চরণে প্রণত হইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন এবং সুমিষ্ট বাক্য ও ব্যবহারে তাঁহার প্রাণমন মোহিত করিলেন। তখন জগদানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি হৃষ্টচিত্তে করজোড়ে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন এবং স্বয়ং স্নান সারিয়া রন্ধনে ব্যাপৃত হইলেন। মনের আনন্দে জগদানন্দ সেদিন নানাপ্রকার জিনিস রন্ধন করিলেন এবং যথাসময়ে চৈতন্যদেব ভিক্ষা করিতে আসিলে তাঁহাকে ইচ্ছানুযায়ী পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। আজ ভয়ে চৈতন্যদেব খাইবার সময়ে বিশেষ ওজর-আপত্তি করিলেন না, জগদানন্দের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সমস্তই গ্রহণ করিতে হইল। প্রিয়তমকে স্বহস্তে রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়াইয়া জগদানন্দের

অন্তর আনন্দে উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল। তৈলের জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখ রহিল না,—সে-সব কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। নিজে ভিক্ষা গ্রহণান্তে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আহারে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলে জগদানন্দ জানাইলেন, রন্ধনের সহায়ক ও সেবক গোবিন্দাদিকে প্রসাদ দিবার পরে তিনি গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে না খাওয়াইয়া কুঠিয়ায় ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জগদানন্দ ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে দিলেন না। তাড়াতাড়ি কুঠিয়ায় গিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জগদানন্দের আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারায় চৈতন্যদেবকে আহারান্তে বিশ্রামের জন্য স্বীয় কুঠিয়ায় ফিরিয়া আসিতে হইল বটে, কিন্তু তিনি গোবিন্দকে বিশেষভাবে বলিয়া আসিলেন, পণ্ডিতের ভোজন স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া তাঁহাকে খবর দিয়া আসিবার জন্য।

সকলকে পেট ভরিয়া প্রসাদ খাওয়াইয়া সর্বশেষে জগদানন্দ স্বয়ং প্রসাদ খাইতে বসিলেন, এবং বসিয়াই গোবিন্দকে তাড়া দিয়া পাঠাইলেন, কুঠিয়ায় গিয়া প্রভুর পদসেবা করিবার জন্য। নিজের জন্য জগদানন্দের কোন চিন্তা নাই, প্রভুর সুখের জন্যই সদাসর্বদা ব্যস্ত। গোবিন্দ কুঠিয়াতে ফিরিয়া চৈতন্যদেবকে সব খবর দিলেন। জগদানন্দ প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন শুনিয়া চৈতন্যদেবের মন নিশ্চিন্ত হইল। চৈতন্যদেবের প্রতি জগদানন্দের অপরিসীম প্রেমভক্তি দেখিয়া ভক্তগণের মনে বিস্ময় জন্মিল।

চৈতন্যদেবের সুখভোগে অনিচ্ছা আর জগদানন্দের সেবার জন্য আগ্রহ উভয়ই বিস্ময়জনক। শেষ সময়ে যখন ভগবদ্‌ভাবে দিবানিশি বিভোর থাকায় আহারনিদ্রার ব্যতিক্রমে চৈতন্যদেবের দেহ অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তখন সেই পবিত্র দেহকে আরামে রাখিবার জন্য জগদানন্দের উদ্বেগ ও চেষ্টার সীমা ছিল না। চৈতন্যদেব সেই সময়ে কুঠিয়ার মেঝেতে কলার 'শরলা' বিছাইয়া শয়ন করিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের 'শরলা' শব্দে ঠিক কোন বস্তু বুঝায় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কাহারও মতে কলাগাছের মাঝের কাঁচপাতার নাম 'শরলা', যাহা সরল দণ্ডের ন্যায় প্রথমে বাহির হয়। ভগবদ্-বিরহে উত্তপ্ত দেহে এইরূপ সুশীতল মসৃণ কোমল পত্রে শয়ন করা আরামপ্রদ। আবার অন্যেরা বলেন—'শরলা' কলাগাছের শুকনা খোলা, প্রাচীন যুগের মুনিঋষিগণের বৃক্ষবল্কলের ন্যায় উহা শয্যার উপকরণরূপে চৈতন্যদেব ব্যবহার করিতেন। 'শরলা' যে জিনিসই হউক না কেন উহা সুখকর শয্যা নিশ্চয়ই নহে। উহাতে শয়ন করিয়া তাঁহার ক্ষীণ কোমল দেহে কষ্ট হয় ভাবিয়া জগদানন্দ অতীব দুঃখিত ছিলেন। ক্রমশঃ যখন দেহ আরও কৃশ হইয়া পড়িল তখন জগদানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতিকারের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। নূতন মিহি কাপড় গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া উৎকৃষ্ট শিমুলতুলা দিয়া

বালিশ ও গদি প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, "শয়নের কালে উহা বিছাইয়া দিও।" শুধু গোবিন্দের দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া জগদানন্দ স্বরূপ দামোদরকেও বিশেষ অনুরোধ করিলেন,—বলিয়া কহিয়া চৈতন্যদেবকে গদি বালিশ ব্যবহার করাইবার জন্য। পণ্ডিতের আদেশমত গোবিন্দ গদি বালিশ বিছাইয়া রাখিলেন। যথাসময়ে শয়ন করিতে আসিয়া গদি বালিশ দেখিয়া চৈতন্যদেবের বিস্ময় জন্মিল। ব্যস্ত হইয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল শয্যাদি কোথা হইতে আসিল? আর এখানেই বা বিছান হইয়াছে কেন?" গোবিন্দ করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "কঠিন ভূমিতে শয়ন করিয়া আপনার কোমল দেহে কষ্ট হয়, সেই-জন্য জগদানন্দ পণ্ডিত আপনার শুইবার জন্য এই নরম বিছানা তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিয়াছেন।" জগদানন্দের নাম শুনিয়া চৈতন্যদেব বিশেষ কিছু বলিলেন না, পাছে আবার কি কাণ্ড করিয়া বসেন। আস্তে আস্তে বিছানাকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া চৈতন্যদেব নিত্যকার মত সেই কলার 'শরলা'তেই মেঝের উপর শয়ন করিলেন। দামোদর স্বরূপ চৈতন্যদেবের অন্তরের ভাব-স্বভাব বিশেষ রূপেই জানেন; তথাপি জগদানন্দের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যে তাঁহাকে বলিলেন, "পণ্ডিত এত কষ্ট করিয়া আনিয়াছেন, একদিনও ঐ বিছানায় শয়ন না করিলে তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইবে।" স্বরূপের কথায় দুঃখিত হইয়া,—

"প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলি বালিস মস্তকমুণ্ডন॥"

দামোদর স্বরূপ আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

পরদিন গোবিন্দের মুখে, চৈতন্যদেব গদি বালিশ ব্যবহার করেন নাই ও করিবেন না শুনিয়া পণ্ডিতের হৃদয় দুঃখে অভিমানে পূর্ণ হইল। জগদানন্দ প্রতিকারের অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে স্বরূপকে ধরিয়া বসিলেন। চৈতন্যদেবের দেহের অবস্থা দেখিয়া স্বরূপেরও এইজন্য চিন্তা হইয়াছিল। তিনি মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া বহু পরিমাণে শুকনা কলাপাতা সংগ্রহ করিলেন এবং তাহা নখে চিরিয়া খুব সরু সরু করিয়া. চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত পুরাতন বহির্বাস—গৈরিক বস্ত্রদ্বারা ওয়াড় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভর্তি করিলেন। এইরূপে শুকনা কলাপাতার দ্বারাই 'ওড়ন পাড়ন' তৈয়ার হইল। দামোদর স্বরূপের বিশেষ অনুরোধে ও আগ্রহে চৈতন্যদেব তদবধি তাহাতেই শয়ন করিতেন। ভক্তগণ এই ব্যবস্থায় কিঞ্চিৎ সুখী হইলেও জগদানন্দের মনের খেদ মিটিল না।

চৈতন্যদেবের প্রতি জগদানন্দের প্রীতি ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা জানা যায়। চৈতন্যদেব কাশী-বৃন্দাবন যাত্রাকালে বলভদ্র ভট্টাচার্য ও ভৃত্য-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যান নাই। বিশেষ আগ্রহান্বিত থাকিলেও জগদানন্দ সেইজন্য যাইবার সুযোগ পান নাই। পরে জগদানন্দ ঐ সকল তীর্থাদি দর্শনের জন্য চৈতন্যদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সহজ-সরল পণ্ডিতের পক্ষে ঐ সকল দুর্গম দূরদেশে যাওয়া বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া চৈতন্যদেব প্রথমে অনুমতি দেন নাই। কিন্তু জগদানন্দ বহু চেষ্টা করিয়া শেষে তাঁহার অনুমতি লাভ করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাবধান করিয়া পথঘাট সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়া আশীর্বাদ করিলে জগদানন্দ পুরী হইতে যাত্রা করিয়া পথে নানা তীর্থ দর্শন করিতে করিতে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সনাতন তথায় অবস্থান করিতে-ছিলেন। উভয় উভয়কে পাইয়া অতীব খুশী হইলেন এবং চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সনাতন মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। জগদানন্দ একদিন তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ কবিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বিধিপূর্বক সন্ন্যাস কিংবা গৈরিক ধারণ না করিলেও প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার তপস্যা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা দেখিয়া মনে হইত, ইনি প্রকৃষ্ট বিদ্বৎ সন্ন্যাসী[১]। সেই সময়ে তদঞ্চলে মুকুন্দদেব সরস্বতী নামে জনৈক সন্ন্যাসী বিরাজ করিতেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্বতঃই সনাতনকে একখানা গৈরিক বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সনাতন সেই গৈরিক বস্ত্র মাথায় বাঁধিয়া জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা করিতে গমন করিলেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ী অপর সন্ন্যাসীপ্রদত্ত গেরুয়া বস্ত্র মাথায় বাঁধিয়াছেন দেখিয়া ক্রোধে পণ্ডিতের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। পণ্ডিত এই জন্য তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া ভাতের হাঁড়ি উঠাইয়া মারিতে আসিলেন। তখন সনাতন সলজ্জ ভাবে করজোড়ে পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট আমি এইরূপ ব্যবহারই আশা করিয়াছিলাম। আপনার কৃপায় আমার জ্ঞান লাভ হইল।"

আমাদের মনে হয় সন্ন্যাসী মুকুন্দদেব সনাতনকে ভালবাসিয়া তাঁহার মাধুকরী ভিক্ষার সুবিধার জন্যই গৈরিক বস্ত্র দিয়াছিলেন। কারণ সাদা-কাপড়ে লোকে কাঁচা ভিক্ষা—আটা ডাল ইত্যাদি দেয়, গৈরিকধারীকেই পাকা জিনিস—রুটি ভাত ইত্যাদি ভিক্ষা প্রদান করে। সেইজন্য ব্রহ্মচারী, গোঁসাই

১ সন্ন্যাস দুই প্রকার---বিদ্বৎ ও বিবিদিষা। জ্ঞান হইলে পর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী; আর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বলা হয় বিবিদিষা সন্ন্যাসী।

ও অন্যান্য অনেক 'সাদা-কাপড়ী' সাধু মাথায় গৈরিক বস্ত্র বাঁধিয়া সন্ন্যাসিগণেরই ন্যায় রন্ধিত দ্রব্য মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া থাকেন। এই প্রথা এখনও উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত দেখা যায়। তবে নিজেই ইচ্ছামত বস্ত্র গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া পরিধান কিংবা মাথায় বাঁধা নিয়ম নহে,—ইহা কোন গৈরিকধারী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুর নিকট হইতে গ্রহণ করাই রীতি। সনাতনের পক্ষে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য বা পক্বান্ন ভিক্ষায়- মাধুকরীর সুবিধার জন্যই সন্ন্যাসী তাঁহাকে যোগ্য পাত্র বুঝিয়া, গৈরিক বস্ত্র দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যাঁহার নিকট হইতে গেরুয়াবস্ত্র গ্রহণ করা হয়—প্রকারান্তরে তাঁহাকে সম্প্রদায়গুরু স্বীকার করাও সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে এবং গৈরিক প্রদানকারীর সম্প্রদায় ও চেলারূপে পরিচয়ও হইয়া যায়। কাজেই চৈতন্যদেবের প্রিয় অন্তরঙ্গ সনাতনের মাথায় অপরের গেরুয়া দেখিয়া জগদানন্দের ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া গৈরিকের উপর পণ্ডিতের ভীষণ আক্রোশ ছিল কারণ এই সর্বনাশা গেরুয়ার জন্য আজ তাঁহার প্রাণের দেবতা "সোনার প্রতিমা ধুলায় গড়াগড়ি যায়।"

গৌড়ীয় ভক্তগণ চৈতন্যদেবের জন্য প্রতিবৎসর নানারূপ খাদ্যদ্রব্য লইয়া পুরীতে যাইতেন একথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পানিহাটী-নিবাসী ভক্ত রাঘব পণ্ডিত ও তাঁহার ভক্তিমতী ভগিনী বিশেষভাবে সংগ্রহ করিয়া এবং পৃথক পেটিকাতে ভালরূপে গুছাইয়া সম্বৎসরের উপযোগী নানা দ্রব্য প্রতিবৎসর পাঠাইতেন। উহা 'রাঘবের ঝালি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ পেটিকাটি স্বহস্তে শীলমোহরাঙ্কিত করিয়া শিবানন্দ সেন পরম যত্নে পুরীতে লইয়া যাইতেন—উহা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ বাহক নিয়োগ করা হইত। আবার পৃথক তদারক করিবার লোকও নিযুক্ত থাকিত। এই ঝালি প্রতি বৎসর পুরীতে লইয়া গিয়া তিনি গোবিন্দের হাতে সমঝাইয়া দিতেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে এই ঝালির যে বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলে সেই সময়কার 'সুজলা সুফলা সোনার বাংলার সুখী অধিবাসীদের' ভোজন পরিপাটির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘকালস্থায়ী খাদ্যদ্রব্য খই, চিড়ামুড়ি, তিল, নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে মাখাইয়া কত ভাবে কত প্রকার যে সুস্বাদু দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা পাঠাইতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু ইহাই নহে, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার খুঁটিনাটি দ্রব্য পাঠাইতেও ত্রুটি করিতেন না। জলবায়ুর দোষে ভিক্ষার অনিয়মে গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজনের ফলে পেটে আম জন্মিলে, তাহার প্রতিকারকল্পে 'সুক্তা' রাঁধিয়া ও থলিতে ভর্তি করিয়া শুকনা নালতে (পাট) পাতার গুঁড়া পাঠাইতেন। এইরূপে নূতন কাপড়ে তৈয়ারী ছোটবড় বহু থলিতে বহু দ্রব্য পূর্ণ থাকিত। চৈতন্যদেবের গঙ্গাভক্তি ছিল অসাধারণ,—

সেজন্য রাঘবভগিনী গঙ্গাগর্ভ হইতে ভাল গঙ্গামৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া উহাকে জলে গুলিয়া মিহি কাপড়ে ছাঁকিয়া—বালি-কাঁকরশূন্য করিতেন। পরে অতি সাবধানে সেই তরল মৃত্তিকা শুকাইয়া শক্ত হইয়া আসিলে সুন্দরভাবে ছোট ছোট অঙ্গুলিপ্রমাণ গুটি তৈয়ার করিয়া ভালরূপে শুকাইতেন এবং থলিয়াতে পুরিয়া সম্বৎসরের ব্যবহারের জন্য পাঠাইতেন। গোবিন্দ সেই 'রাঘবের ঝালি' বিশেষ যত্নে নিজের কাছেই রাখিতেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী চৈতন্যদেবের সেবায় লাগাইতেন। সন্ন্যাসিচূড়ামণি আবার কখনও কোন দ্রব্য গোবিন্দের নিকট হইতে নিজেই চাহিয়া লইয়া ব্যবহার করিতেন। আশ্রিত, প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের শ্রম সার্থক ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার দিকে তাঁহার এরূপ দৃষ্টি ছিল যে তাহা অবর্ণনীয়। অসংখ্য ভক্ত তাঁহাকে এইভাবে ভগবৎ-বিগ্রহ-জ্ঞানে হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিলেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরভিমান। বাহ্যিক আড়ম্বর ও মান-যশঃ-প্রতিষ্ঠা ভগবানের পথের বিষম অন্তরায় বলিয়া তিনি ঐ সকলকে স্বয়ং অতিশয় ঘৃণা করিতেন এবং অতি হেয় বুদ্ধিতে সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিবার জন্য ভক্তগণকেও উপদেশ দিতেন।

প্রথমবার রথের পূর্বে গুণ্ডিচাবাড়ী মার্জনাকালে 'ধোয়াপাখলার' সময়ে জনৈক গৌড়ীয় ভক্ত, তাঁহার শ্রীচরণে জল ঢালিয়া দিয়া, সেই পাদোদক পান করিয়াছিল। একে চৈতন্যদেব কাহাকেও পাদোদক দিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাহাতে আবার শ্রীমন্দিরে এইরূপে পদধৌত করা মহা অপরাধ। অজ্ঞ ভক্তের এই ব্যাপারে তাঁহার মনে অতিশয় ব্যথা জন্মিল। দুঃখিতচিত্তে বিমর্ষভাবে স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার গৌড়ীয়ার কাণ্ড দেখ।" স্বরূপ রুষ্ট হইয়া সেই গৌড়ীয়াকে গলাধাক্কা দিয়া মন্দিরের বাহির করিয়া দিলেন এবং এইরূপ অপকর্মের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। সে বেচারী নিজের দুষ্কৃতির জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইল এবং অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। একটু পরেই চৈতন্যদেবের মন নরম হইলে স্বরূপ তখন সেই ভক্তটিকে এমন আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়া সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করাইলেন। এই ঘটনাতে অন্যান্য ভক্তগণেরও শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা বুঝিয়া চরণামৃত ও ভুক্তাবশেষ প্রসাদ গ্রহণের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত থাকিলেও কেহ আর সহজে অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার ভুক্তাবশেষ পাত্র সেবকেরই প্রাপ্য ছিল। বিশেষ অনুগৃহীত কোন ভক্তের প্রতি কখনও কৃপা হইলে তাঁহার অনুমতিমতে গোবিন্দ উহা সেই ভক্তকে দিতেন, অন্যের পাইবার উপায় ছিল না। এই সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তানুগ্রহের একটি মনোরম কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

কালিদাস নামে জনৈক ভক্ত চৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি-সম্পর্কে খুড়া ছিলেন। বৃদ্ধ ভক্ত কালিদাসের এক অদ্ভুত স্বভাব ছিল ভগবদ্‌ভক্তের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাওয়া। হিরণ্য-গোবর্ধন দাসের জ্ঞাতি; কাজেই সমাজে কালিদাস নিছক নগণ্য ছিলেন না নিশ্চয়। তবে, তিনি সামাজিক মর্যাদা গৌরবখ্যাতির কোন ধার ধারিতেন না। কোন ভগবদ্‌ভক্তের নাম শুনিলেই তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য কালিদাসের প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত। তিনি ভক্তের জাতিকুল বিচার করিতেন না। সেই সময়ে গৌড় অঞ্চলে 'ঝড়ু' নামক একজন ভুঁইমালী জাতীয় ভক্ত ছিলেন। উচ্চ ভাবভক্তির জন্য লোকের নিকট তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল 'ঝড়ু-ঠাকুর'। ভক্ত-প্রসাদলোভী কালিদাস 'ঝড়ু-ঠাকুরের' প্রসাদ প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বীয় নীচ জাতিকুলে জন্মের কথা বলিয়া অতিশয় বিনয়-সহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। কালিদাস 'ঝড়ু-ঠাকুরের' স্ত্রীর নিকটেও তাঁহার প্রসাদ পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া সফলকাম হন নাই। পরে কালিদাস মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কতকগুলি সুমিষ্ট আম্র লইয়া গিয়া 'ঝড়ু-ঠাকুরের' সেবার জন্য তাঁহার স্ত্রীর হাতে দিলেন এবং স্বয়ং ঝড়ুঠাকুরের ঘরের পাশে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার আহারাদি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ঝড়ুঠাকুর আহারে বসিলে তাঁহার স্ত্রী কালিদাস-প্রদত্ত সুমিষ্ট আম্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে খাওয়াইলেন; এবং খাওয়া শেষ হইলে অন্যান্য উচ্ছিষ্টের সঙ্গে আমের আঁঠিও বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাসের বাসনা পূর্ণ হইল, আগ্রহ-সহকারে সেই উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি কুড়াইয়া লইয়া তিনি চুষিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিনের সাধ,—ঝড়ুঠাকুরের প্রসাদ, এইভাবে গ্রহণ করিয়া কালিদাসের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।

ভক্ত কালিদাস পুরীতে আসিলে, চৈতন্যদেবের প্রসাদ পাইবার জন্য তাঁহার অন্তরে খুব উৎকণ্ঠা জন্মিল। কিন্তু উৎকণ্ঠা হইলে কি হইবে, উহা পাওয়া বড় কঠিন। বৃদ্ধ কালিদাস নিরস্ত হইবার লোক নহেন। ভগবানের নিকট অন্তরের প্রার্থনা জানাইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব প্রাতঃকালে যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, তখন সেবক গোবিন্দের হাতে জলপূর্ণ কমণ্ডলু থাকিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে, সিংহদ্বারের উত্তর পার্শ্বে কপাটের অন্তরালে বাহিরে নীচু জায়গায় পা ধুইয়া ভিতরে গিয়া, প্রথমে নৃসিংহদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাওয়া চৈতন্য-দেবের অভ্যাস ছিল। তাঁহার সেই পাদোদক গ্রহণ করা ত দূরের কথা (তাঁহার চক্ষুর গোচরে) কেহ উহা স্পর্শ করিতেও সাহস পাইত না। কালিদাস একদিন সকালবেলা চৈতন্যদেবের অনুগমন করিয়া সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি পদ ধৌত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি পাতিয়া বৃদ্ধ

সেই পাদোদক গ্রহণ করিয়া পান করিলেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার কালিদাস পাদোদক পান করিলে পর চৈতন্যদেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আর কখনও হাত পাতিও না।" কালিদাস অবনতমস্তকে সেই আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। বৃদ্ধ ভক্তের অন্তর ও স্বভাব চৈতন্যদেবের বিশেষরূপে জানা ছিল। সেই জন্যই তাঁহাকে নিরাশ করেন নাই। শুধু ইহাই নহে, বৃদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ষোল আনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য একদিন গোবিন্দকে বলিয়া ভুক্তাবশেষ পাত্রও তাঁহাকে দেওয়াইয়াছিলেন। ভক্ত আশ্রিতগণেব প্রতি তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি থাকিলেও যাহাতে লোকের নিকট গৌরব প্রকাশ পায়, কিংবা অন্তরে অভিমান-অহঙ্কারেব সঞ্চার হইতে পাবে, এমন কোন কার্য বা চালচলন তাঁহার চরিত্রে দেখা যাইত না। তাঁহার ব্যবহার সর্বদাই অতিশয় বিনয়নম্রতাপূর্ণ ছিল।

অসংখ্য ভক্ত, সমাজের গণ্যমান্য বিদ্বান বুদ্ধিমান বহু লোক, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বর মনে করিয়া গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাতে কখনও কোনরূপ গৌরব কিংবা অহঙ্কারের ভাব প্রকট হয় নাই। সংসারের অধিকাংশ লোক যে মান-যশঃ-খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত তিনি উহাকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। ভক্তগণ ও অপব লোক তাঁহাকে যে ভাবেই দেখুক না কেন, তিনি নিজেকে সর্বদা ভগবানের পদাশ্রিত প্রেমভক্তি-অভিলাষী নিঃসম্বল সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। এমনকি তাঁহাব সম্মুখে কেহ কিছু বাড়াইয়া বলিলে দৃঢ়রূপে প্রতিবাদ করিতেন। বল্লভাচার্যের প্রসঙ্গে আমরা ইহা দেখিয়াছি, এখানে আর একটি ঘটনাব উল্লেখ করিলে পাঠক ইহাব বিশেষ প্রমাণ পাইবেন।

একবার রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহার দর্শনে উল্লসিত হইয়া তাঁহার নামে জয়ধ্বনি দিতে আরম্ভ করেন। ভক্তগণের মুখে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় নাম সংযুক্ত জয়ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া স্বরূপের দ্বারা ভক্তগণকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করাইলেন। তাঁহার চিত্তে অসন্তোষ জন্মিয়াছে বুঝিতে পারিয়া স্বরূপের উপদেশে ভক্তগণ ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দেখাদেখি সমাগত অসংখ্য জনতা উল্লসিত হইয়া তখন তাঁহাব নামে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্বরূপ ব্যাপার দেখিয়া মুচ্কি হাসি হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব জনতাকে বাধা দেওয়া সম্ভব নহে বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজের কুঠিয়ায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট উহা এতই বিসদৃশ ও অপ্রীতিকর বোধ হইয়াছিল!

তাঁহার নিরভিমানিতা ও দীনহীন ভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন নিম্নলিখিত ঘটনায় পাওয়া যাইবে। চৈতন্যদেব প্রত্যহ ভোরবেলা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের শঙ্খ-

ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন করিয়া মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিতেন।

"হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল॥"

সাধারণতঃ তিনি মণিকোঠায় প্রবেশ করিতেন না, নাটমন্দিরের পূর্বপ্রান্তে গরুড়স্তম্ভের পাশে দণ্ডায়মান থাকিয়া পশ্চিমাস্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখচন্দ্রের দিকে তৃষিত চাতকের ন্যায় তাকাইয়া থাকিতেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই মনের গতি অন্তর্মুখী হইত, বাহ্য জগৎ ভুলিয়া চিত্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে লীন হইয়া যাইত। এইরূপে ভাববিহ্বল শ্রীচৈতন্য গরুড়স্তম্ভে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কখনও নেত্রদ্বয় হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইয়া মন্দিরতলে গড়াইয়া পড়িত; আবার কখনও নানারূপ অদ্ভুত ভাবের বিকাশ, কখনও বা অন্তর্দশাতে (জড়সমাধিতে) প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চল বা নিস্পন্দ হইয়া যাইতেন। সকালবেলার অভিষেক-পূজো-ভোগের পর আরাত্রিকের শব্দে তাঁহার বাহ্যস্ফূর্তি হইলে আরাত্রিক দর্শন ও প্রণামাদি করিয়া কুঠিয়াতে ফিরিতেন।

একদিন এইরূপে সকালবেলা মন্দিরে গিয়া গরুড়স্তম্ভের পাশে স্থির নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সেদিন মন্দিরে খুব ভিড় হইয়াছে, অনেকেরই দর্শনাদির সুবিধা হইতেছে না। পর্বাদি উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে দর্শনার্থীর ভিড় যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই এই ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব লোকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া যেরূপে পারে দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনাভিলাষিণী একটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক সম্মুখের জনতার জন্য দর্শন করিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে গরুড়স্তম্ভের পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া স্তম্ভ ধরিয়া নিকটে নিশ্চলাবস্থায় দণ্ডায়মান চৈতন্য-দেবের স্কন্ধে পায়ের ভর দিয়া, মাথা উঁচু করিয়া স্ত্রীলোকটি দর্শন করিল, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথের দর্শনলাভে পরম উল্লসিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। উল্লাসশব্দে তাহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অনেকেই একসঙ্গে হায় হায় করিয়া উঠিলেন। গোবিন্দ তন্ময়চিত্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন,—লোকের হৈচৈ শুনিয়া চমকিত হইয়া চৈতন্য-দেবের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবামাত্র এই অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। তিনি মাথায় হাত দিয়া অতিশয় অস্থিরচিত্ত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে নীচে নামাইতে অগ্রসর হইলেন। ততক্ষণে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি হাতের ইশারায় গোবিন্দকে নিষেধ করিলেন।

"উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাইয়া।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
'আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন'॥"

মুহূর্তপরেই স্ত্রীলোকটি ভূমিতে অবতরণ করিল এবং চৈতন্যদেবের দিকে চাহিয়া স্বীয় অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বারংবার ক্ষমা চাহিতে লাগিল। চৈতন্যদেব তাহার ভক্তিভাব ও ব্যাকুলতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তোমার এত আর্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা।" সান্ত্বনা ও অভয়প্রদানপূর্বক বিদায় দিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দের নিকট স্ত্রীলোকটির শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুলতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনুমন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইঁহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয়॥"

চৈতন্যদেবের হৃদয় কতদূর অভিমানশূন্য ছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে বিচার করিলে আর একটি বিষয়ও বুঝিতে পারা যায়। ভগবদ্‌ভাবে চিত্ত তন্ময় হইলে, জীবের অন্তরে 'স্ত্রী' বা 'পুরুষ' অভিমানের অর্থাৎ 'আমি স্ত্রীলোক, কিংবা আমি পুরুষ' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিরও বিলয় ঘটে। সেইজন্যই স্ত্রীলোকটি স্কন্ধে উঠিয়া দাঁড়াইলেও চৈতন্যদেবের চিত্তে কোনপ্রকার সংশয় বা বিক্ষেপ জন্মে নাই।

অসংখ্য ভক্তের নিকট অতুল সম্মান পাইলেও এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর ব্যবহারে কখনও অহঙ্কার-অভিমানের ভাব প্রকাশ পাওয়া তো দূরের কথা বরং অপরের সঙ্গে, বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত জ্ঞানিগুণী ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সুবিনীত ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। নিজের গৌরবহানির ভয়ে লোকে অপরের প্রশংসা শুনিলে ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকে: স্বীয় অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তি যাহাতে অপরের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, সেইজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের চরিত্র ছিল অতি মহৎ। তিনি চিরকাল স্বয়ং যেমন স্বীয় জাতি-কুল-সম্প্রদায়-আশ্রমাদির গৌরব উপেক্ষা করিয়া সর্ব-সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত-সজ্জন সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও পরমাদরে গ্রহণ করিতেন, ঠিক তেমনই যাহাতে অন্য সকলেও করেন সেই

জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। তিনি সম্মুখে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তগণের উচ্চ-প্রশংসা করিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন। এমনকি কোন কোন সময়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিবিশেষকে স্বয়ং উপদেশ না দিয়া, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অন্য যোগ্য ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এখানে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক জনৈক পণ্ডিত সদাচারী ভক্ত ব্রাহ্মণ, চৈতন্যদেবের নিকট ভক্তিমার্গের উচ্চতত্ত্ব ও সাধনভজন প্রণালী জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। মিশ্রকে উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। তিনি রামানন্দ রায়ের নাম করিয়া ভক্তিতত্ত্বে তাহার উচ্চ অধিকারের কথা বলিয়া মিশ্রকে রায়ের নিকট হইতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিতে বলেন। অগত্যা, মিশ্র তাঁহার আদেশ অনুযায়ী রায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলিবার জন্য একদিন রায়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রায় তখন বাটীতে ছিলেন না। ভৃত্যের নিকট অনুসন্ধান করিয়া মিশ্র জানিতে পারিলেন রায় নির্জন বাগানবাটীতে বসিয়া দুইটি কিশোরী দেবদাসীকে নৃত্যগীত ও অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেছেন। ভৃত্য তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক বসিবার আসন প্রদান করিল এবং করজোড়ে জানাইল, একটু অপেক্ষা করিলেই রায়ের সঙ্গে দেখা হইবে, তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন। মিশ্র অপেক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু দেবদাসীকে নৃত্যগীত-অভিনয়াদি শিক্ষা দেওয়ার কথা শুনিয়া মনে বিরক্তি জন্মিল, এবং এরূপ লোকের নিকট চৈতন্যদেব কেন পাঠাইয়াছেন ভাবিয়া পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিসহকারে মিশ্রের চরণবন্দনাপূর্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করিলেন। মিশ্র তাঁহার নিকট স্বীয় অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলেন না। অপর প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপাদি করিয়া বিদায় লইলেন। মিশ্রের অন্তরে খুবই দুঃখ জন্মিয়াছিল, পরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি রায়ের সহিত দেখাসাক্ষাতের বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। মিশ্র তখন বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন, "রায় দেবদাসীগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে ব্যস্ত থাকায় আলাপ-আলোচনার সুবিধা হয় নাই। আর এমন লোকের নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে প্রবৃত্তিও আমার হয় নাই।" চৈতন্যদেব মিশ্রের অন্তরের কথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে রায়ের উচ্চভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "রায় দেবদাসী-গণের প্রতি,—

'সেব্যভাব আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসী ভাব করে আরোপণ॥'

ভক্ত রামানন্দ স্বকৃত নাটক, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে ঠিক ঠিক ভাবে অভিনয় করাইবার জন্য, দেবদাসীগণকে (শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রেয়সী জ্ঞানে) সেবা মনে

করিয়া স্বয়ং দাসীভাবে অভিনয়, নৃত্যগীত, ও কথাবার্তা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানী রামানন্দের নির্বিকারচিত্তে ইহাতে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য হয় না। এইরূপ ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। ইঁহারাই প্রেমভক্তির প্রকৃত আচার্য,—আমি নিজে রায়ের নিকট ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করি। যদি তোমার প্রেমভক্তিতত্ত্ব জানিবার জন্য বাস্তবিকই আগ্রহ জন্মিয়া থাকে তবে তাঁহার নিকট পুনবায় যাও এবং 'আমি পাঠাইয়াছি' বলিয়া উল্লেখ করিও।" মুক্তকণ্ঠে রামানন্দের প্রশংসা করিয়া, চৈতন্যদেব উপস্থিত ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতিব নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থিব হয় কোন জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥
একে দেবদাসী আর সুন্দবী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি॥
নির্বিকাব দেহমন কাষ্ঠপাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকাব।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ[১] তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥"

চৈতন্যদেবের মুখে রায়ের বিশেষ প্রশংসা ও অত্যদ্ভুত সেবার কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বিস্ময় জন্মিল। মিশ্রের অন্তরে রায়ের মহিমা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া চৈতন্যদেব ভাগবত হইতে শুকদেবের বাণী আবৃত্তি করিলেন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩৩।৪০

---

১ অপ্রাকৃত দেহ—প্রাকৃত (বাহ্যিক) দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়া সাধনার ফলে সিদ্ধ ভক্তের ভাবনানুযায়ী অপ্রাকৃত (চিন্ময়) দেহানুভব (স্ফুরণ) হইয়া থাকে।

—ভগবান বিষ্ণু ব্রজবধূগণের সহিত যে সমস্ত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে যিনি তাহা শ্রবণ, অথবা বর্ণন করেন, ভগবানে তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয়, এবং হৃদ্‌রোগ কাম অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়।

রায়ের অন্তরের ভাব ও উচ্চ অবস্থার কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং চৈতন্যদেবেব উপদেশানুযাযী পরে আর এক দিন তাঁহাব আলয়ে গমন করিলেন। মিশ্র সেদিন সকাল সকাল উপস্থিত হইয়া রায় বাগানে যাইবার পূর্বেই দেখা করিলেন এবং চৈতন্যদেবের নাম করিযা স্বীয় অভিপ্রায জানাইলেন। তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেও বায নিজে শূদ্র হইযা ব্রাহ্মণকে তত্ত্বকথা শুনাইতে প্রথমে সম্মত হইলেন না। পুবে মিশ্র অতিশয় আগ্রহ দেখাইয়া বারংবার অনুরোধ করাতে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবাব আশায় এবং চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে, মিশ্রের অভিলাষানুযায়ী প্রেমভক্তির তত্ত্ব বলিতে আবম্ভ করিলেন। তাঁহাব মুখে ভক্তিতত্ত্ব, ভাগবততত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণলীলা ও রাগমার্গের সম্যক পরিচয় পাইয়া মিশ্রের আনন্দেব সীমা রহিল না। ভগবৎপ্রসঙ্গে ও তত্ত্বালাপে রায় ও মিশ্র দুজনেই এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে উভয়েরই দেশকালেব জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। অত্যধিক বেলাতে প্রসঙ্গ শেষ করিয়া মিশ্র নিজেকে কৃতার্থ মানিয়া চৈতন্যদেবের অনুকম্পার কথা স্মবণপূর্বক তাঁহার চরণোদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম করিলেন, এবং রায়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইলেন, পরে যখন চৈতন্যদেবেব সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তখন মিশ্র শতমুখে রাযেব প্রশংসা কবিয়াছিলেন।

"মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহনে না যায়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণ-ভক্তি-রসময়॥"

এইভাবে চৈতন্যদেব সর্বদা ভক্ত মহাত্মাগণের মাহাত্ম্য সর্বদা কীর্তন করিতেন এবং তাঁহাদের বিশেষ সদ্‌গুণ-মাধুর্যরস নিজে যেমন আস্বাদন করিতেন, অপরকেও সেইরূপ করিতে উৎসাহ দিতেন। শুধু যে মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, প্রাণপণে সেবা করিয়াও ঐ সকল ব্যক্তিকে সদাসর্বদা সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তবে তিনি এই নশ্বর দেহ ও ক্ষণিক সুখভোগের হেতু রূপরসাদিকে কখনও সংসারের সার-সর্বস্ব মনে করিতেন না। সকলেই যাহাতে সেই নিত্য সত্য অবিনশ্বর আনন্দময় শ্রীনন্দনন্দনের কৃপায় চির আনন্দের অধিকারী হয় তজ্জন্যই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেন এবং সেই উদ্দেশ্য লাভের সহায়করূপেই

জীবনযাত্রা, ভরণপোষণ ও গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র আবশ্যকতা মনে করিতেন। তাঁহার নিকটে ও আশেপাশে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বৈরাগী, ত্যাগী, ভক্ত গৃহস্থ সজ্জন সর্বদা বাস করিতেন। তাঁহাদের সকলের সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। শ্রীমৎ পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ: দামোদর স্বরূপ, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণ; হরিদাস, রঘুনাথ প্রভৃতি ত্যাগি-ভক্তগণ; গোবিন্দ, কাশীশ্বর প্রভৃতি সেবকগণ;—যাঁহারা সর্বদা কাছে কাছে থাকিতেন, এবং শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি যাঁহারা সাময়িকভাবে আসিয়া থাকিতেন, তাহা ছাড়া রথযাত্রা ও অন্য সময়ে সমাগত ভক্তমণ্ডলী,— সকলেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সম্বন্ধে অনেক ঘটনাই পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিবার জন্য আরও দুই-একটি কাহিনীর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

শেষ সময়ে তিনি যখন ভগবদ্‌বিরহ-ভাবের স্ফুরণে রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন, অথচ বাহ্যিক দেশ-কালের জ্ঞান থাকিত না, সেই সময়ে ভক্তগণ অতি যত্নে তাঁহার দেহ রক্ষা করিতেন। তখন শঙ্কর নামক জনৈক সেবক তাঁহার পায়ের কাছে রাত্রে শয়ন করিয়া থাকিতেন, যাহাতে তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেই টের পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব কোন কোন দিন শেষ-রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইতেন, খালি গায়ে শঙ্কর শুইয়া আছেন আর ভোরের হাওয়াতে শীত বোধ হওয়ায় গায়ের লোম শিহরিয়া উঠিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার অন্তর স্নেহসিক্ত হইত। মাতা যেমন বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইয়া পুত্রকে অঞ্চলাবৃত করেন, ঠিক তেমনই ভাবে প্রেমিক সন্ন্যাসী সেবকের দেহ স্বীয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া দিতেন। স্বল্পনিদ্র শঙ্কর কখনও কখনও তাঁহার শ্রীকর-কমলস্পর্শে জাগ্রত হইয়া এই অদ্ভুত ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমাশ্রুতে ভাসিতেন।

চৈতন্যদেবের প্রধান সেবক গোবিন্দ ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার অনুগমন করিতেন এবং কি উপায়ে প্রভুর দেহ রক্ষা ও আরাম হইবে, গোবিন্দের ইহাই ছিল ধ্যানজ্ঞান। দ্বিপ্রহরে ভিক্ষাগ্রহণান্তে যখন চৈতন্যদেব বিশ্রাম করিতেন তখন গা-হাত-পা-কোমর টিপিয়া তাঁহার দেহকে আরাম-আয়াস দেওয়া গোবিন্দের নিত্যকর্ম ছিল। সদাসর্বদা নৃত্যগীত-কীর্তনে এবং ভাবের আবেশে শরীরে যে গ্লানি ও অবসাদ উপস্থিত হইত, সুদক্ষ সেবক গোবিন্দ, তাঁহার দেহের সেই অবসন্নতা দূর করিতে তৎপর থাকিতেন।

একদিন এইরূপে সংকীর্তনে অধিকক্ষণ নৃত্যগীত-কীর্তন ও ভাবাবেশে তাঁহার শরীর অত্যধিক ক্লান্ত ছিল, সেই জন্য ভিক্ষার পর কুঠিয়ায় গিয়া দরজার সম্মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইয়া সেইখানেই

শুইয়া পড়িলেন,—আসনে গেলেন না। গোবিন্দ সেবা করিতে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন, এবং মৃদুস্বরে তাঁহাকে আসনে গিয়া ভাল করিয়া শুইবার জন্য বলিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব কোন সাড়া দিলেন না আসনেও গেলেন না। গোবিন্দ অগত্যা ভিতরে যাইবার পথ দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তাহাতেও কোন জবাব পাইলেন না। তাঁহার দেহের গভীর অবসন্নতা বুঝিয়া গোবিন্দের অন্তর দুঃখে পূর্ণ হইল, কাজেই আর কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে সাহসী হইলেন না, অথচ সেবা করিয়া ক্লান্তি দূর করিবেন, তাহারও উপায় দেখিলেন না। কুঠিয়ার ভিতরে যাইবার উপায় নাই দরজার সম্মুখেই তাঁহার পবিত্র দেহ শায়িত। গোবিন্দ অতিশয় ব্যস্ত হইলেন এবং অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া চৈতন্যদেবের দেহে একখানি গামছা ঢাকা দিয়া লঙ্ঘন করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দ ভিতরে গিয়া অতিশয় যত্নের সহিত পদসেবাদি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহের ক্লান্তি দূর হওয়ায় গভীর নিদ্রাবেশ হইল। প্রভুর দেহের শান্তি বুঝিয়া গোবিন্দের প্রাণও ঠাণ্ডা হইল, তিনি আনন্দিত হইয়া শান্তভাবে কুঠিয়ার একপাশে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। চৈতন্যদেবের নিদ্রা বরাবরই অল্প, কিছুক্ষণ পরেই জাগরিত হইলেন এবং গোবিন্দকে এরূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া হইয়াছে কিনা। গোবিন্দ মস্তক নাড়িয়া ইংগিতে জানাইলেন, এখনও হয় নাই। চৈতন্যদেব অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং অধিক বেলা পর্যন্ত না খাওয়াতে অতীব দুঃখিত হইয়া জানিতে চাহিলেন, "এতক্ষণ পর্যন্ত না খাইয়া এরূপভাবে বসিয়া থাকিয়া কষ্টভোগ করার কারণ কি?" গোবিন্দ প্রথমে চুপ করিয়া ছিলেন। পরে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, বিনীতভাবে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "দরজায় আপনি শুইয়া আছেন সেজন্য বাহির হওয়ার পথ ছিল না। তাই একটু সময় অপেক্ষা করিয়াছি, না খাওয়ার জন্য কিছুই কষ্ট হয় নাই।" চৈতন্যদেব সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "যেভাবে আসিয়াছিলে, সেইভাবে গেলে না কেন?" গোবিন্দ প্রভুর সেবার জন্য প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের সুখের জন্য তাহা করিবেন কিরূপে? তিনি কিছু না বলিয়া চুপ করিলেও তাঁহার অন্তরের ভাব জ্ঞাত হইয়া, তাহার সেবা, নিষ্ঠা ও আন্তরিক ভক্তিপ্রেম দেখিয়া চৈতন্যদেবের মন খুব প্রসন্ন হইল। কিন্তু এরূপভাবে অধিক বেলা পর্যন্ত না খাইয়া উপবাসে বসিয়া থাকার জন্য অতীব দুঃখিত হইলেন, এবং ভবিষ্যতে এইরূপ উপবাসে নিজের দেহকে কষ্ট দিয়া সেবা করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার সেবার জন্য গোবিন্দ কোনপ্রকার কষ্টই গ্রাহ্য করিতেন না বরং প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইত, অদ্য আবার স্নেহের শাসনে মৃদু

মধুর ভর্ৎসনাতে অন্তরে অধিক আনন্দের উদ্ভব হইল। সেবকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার এইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদাই দেখা যাইত। তাঁহার চরিত্রে একদিকে যেমন সন্ন্যাসের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময় জন্মে, অন্যদিকে তেমনই মানবহৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিসমূহের—শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি ভালবাসা, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতির অত্যুচ্চ বিকাশ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। গর্ভধারিণী জননী, দীক্ষাগুরু[১], শিক্ষাগুরু[২], আচার্যগুরু[৩] ও পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও পূজনীয়গণের সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার; স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, হরিদাস, সার্বভৌম, শ্রীবাস, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতির সহিত প্রীতি-ভালবাসা; এবং শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সেবকগণের উপর স্নেহবাৎসল্যের পরিচয় আমরা বহু পাইয়াছি। এখন তাঁহার সাধুভক্তি ও সাধুসেবার চূড়ান্ত নিদর্শন পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে।

হরিদাস ঠাকুর অথবা যবন হরিদাস পুরীতে আসিয়া অবধি একদিনের জন্যও অন্যত্র যান নাই। তিনি সুদীর্ঘকাল পুরীতে চৈতন্যদেবের নির্দেশ অনুসারে তাঁহারই আবাসস্থানের নিকট অবস্থান করিয়া হরিনাম-কীর্তনে ও ভগবদ্‌ভজনে কালাতিপাত করেন। চৈতন্যদেব প্রত্যহ তাঁহার কুঠিয়াতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভালমন্দ খোঁজখবর লইতেন, মন্দির হইতে প্রাপ্ত ভাল ভাল প্রসাদ আনিয়া দিতেন এবং স্বীয় সেবকদ্বারা নিত্য তাঁহার নিকট মহাপ্রসাদ পৌঁছাইয়া দিতেন। হরিদাস পুরীতে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বয়সও খুব বেশী হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহার নিত্য নিয়মিত ভজন,—প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ বরাবর করিতেন। শেষ সময়ে একদিন গোবিন্দ প্রসাদ দিতে আসিয়া দেখিলেন হরিদাস শুইয়া ধীরে ধীরে হরিনাম করিতেছেন। গোবিন্দ তাঁহাকে উঠিয়া বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেও তিনি উঠিলেন না, প্রসাদও গ্রহণ করিলেন না। মস্তকে স্পর্শ করাইয়া প্রসাদ ফিরাইয়া লইবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন গোবিন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু হরিদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। দুঃখিতচিত্তে গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেবকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া চৈতন্যদেবের মনে অতীব বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। ব্যস্ত হইয়া তিনি উপস্থিত ভক্তগণসহ হরিদাসের কুঠিয়ায় গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকটে গিয়া দেহের কুশল-সমাচার জানিতে

---

১ দীক্ষাগুরু—ইষ্টমন্ত্রদাতা।

২ শিক্ষাগুরু—সাধন-ভজন প্রণালীর উপদেশদাতা।

৩ আচার্যগুরু—উপনয়ন ও সন্ন্যাস সংস্কার সম্পাদনকারী।

চাহিলেন। হরিদাস অতি বিনীতভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেহ ভালই আছে, মন-বুদ্ধি ভাল নয়।" চৈতন্যদেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন-বুদ্ধির কি হইয়াছে?" হরিদাস বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন "আজ জপের সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই।" চৈতন্যদেব হরিদাসকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "এখন বেশী বয়স হইয়াছে, শরীর দুর্বল ও অক্ষম। পূর্বের ন্যায় আর সংখ্যা পূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই; এই বয়সে যতটুকু পারা যায় তাহাই যথেষ্ট।"

চৈতন্যদেব সমাগত ভক্তগণের নিকট হরিদাসের নামজপে নিষ্ঠা ও ভগবদ্-ভক্তির খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে হরিদাস অতিশয় সংকোচ বোধ করিয়া করজোড়ে ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন—

"হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্মে রত মুই অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হৈতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও তুমি যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া[১]॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোরে চিত্তে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদ হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তবে আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে॥"

---

১ অদ্বৈতাচার্য তাঁহার পিতার সাংবাৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ভোজ্যপাত্র হরিদাসকে খাওয়াইয়াছিলেন।

হরিদাসের অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী পরদিন সকালবেলা দর্শন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় লইলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে বিশিষ্ট ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব তাড়াতাড়ি হরিদাসের কুঠিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কারণ তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাল বোধ হয় নাই। হরিদাসের অভিপ্রায়ানুযায়ী তাঁহাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া হরিসংকীর্তন আরম্ভ হইল। স্বরূপ দামোদর, সার্বভৌম প্রভৃতি সমস্ত বিশিষ্ট ভক্তগণই সমবেত হইয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের লইয়া পরমানন্দে হরিদাসের চতুর্দিকে বেড়িয়া ঘুরিয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কীর্তনের পর হরিদাসের প্রার্থনানুযায়ী তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলে হরিদাস তাঁহার চরণযুগল প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। হরিদাসের দৃষ্টি তাঁহার বদনকমলে নিবদ্ধ হইল এবং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' সুমধুর এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জরকে পরিত্যাগ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে ভীষ্মদেবের ন্যায় চৈতন্য-সম্মুখে হরিদাসের ইচ্ছামৃত্যু-বরণ দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। উল্লসিত অন্তরে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করিয়া তাঁহারা নাচিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব স্বয় হরিদাসের দেহ কোলে তুলিয়া লইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া সেই পবিত্রদেহ বহন করিয়া সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হইল। হরিদাসের দেহ সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া চৈতন্যদেব উক্তি করিলেন, "সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা।" পরে স্নাত-পবিত্র দেহকে বস্ত্র-মাল্যচন্দনে সাজাইয়া সমুদ্রকিনারে বালুকা-গর্ভে সমাহিত করা হইল। চৈতন্যদেব স্বয়ং অগ্রণী হইয়া এই সকল কার্য সুসম্পন্ন করিলেন এবং স্বহস্তে হরিদাসের পবিত্র দেহ বালি ঢাকা দিয়া ভক্তগণের সহায়তায় সমাধির উপর বেদী রচনা করিয়া বেদীর চারিদিকে বেড়া দেওয়াইলেন। তৎপরে ভক্তগণসহ সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিয়া সেই পরম পবিত্র স্থান সমাধিক্ষেত্র[১] প্রদক্ষিণান্তে কীর্তন করিতে করিতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্যদেব 'আনন্দবাজারে' আসিয়া মহাপ্রসাদের দোকানের সম্মুখে আঁচল পাতিয়া, দোকানদারগণের নিকট হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের (ভাণ্ডারার) জন্য স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা চাহিলেন,—

"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥"

১ হরিদাস ঠাকুরের সমাধি পুরীর প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান।

দোকানের সম্মুখে এইভাবে চৈতন্যদেবকে দণ্ডায়মান দেখিয়া দোকানীগণ নিজেদের ধন্য মনে করিল এবং আনন্দে অধীর হইয়া দোকানের সমস্ত প্রসাদ উঠাইয়া দিতে উদ্যত হইল। দামোদর স্বরূপ এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলেন এবং ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া মধ্যস্থ হইলেন। স্বরূপ নিজেই প্রসাদ ভিক্ষার ভার লইয়া চৈতন্যদেবকে কুঠিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেক দোকানীর নিকট হইতে অল্প অল্প গ্রহণ করিয়া সব রকম প্রসাদের দুই বোঝা পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দুইজন লোকের মাথায় তুলিয়া দিলেন। রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথও বহু প্রসাদ লইয়া আসিলেন। কাশী মিশ্রও অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন।

এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবে প্রচুর প্রসাদের আয়োজন হওয়াতে চৈতন্যদেবের মন অতিশয় প্রফুল্ল হইল। সমস্ত ভক্তগণকে বসাইয়া চারিজন সহকারী সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই পরিবেশন আরম্ভ করিলেন এবং এক এক জনের পাতে অনেক পরিমাণ প্রসাদ দিতে লাগিলেন। স্বরূপ আবার অগ্রসর হইলেন এবং অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং পরিবেশনের ভার লইলেন। ভক্তগণের ভোজন দেখিবার জন্য চৈতন্যদেব তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অভুক্ত রাখিয়া ভক্তগণের প্রসাদ মুখে দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। সঙ্গী সন্ন্যাসিগণ সহ তাঁহাকে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে কাশী মিশ্র নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মিশ্র তাঁহাদের জন্য প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসিগণকে লইয়া পৃথক পংক্তিতে চৈতন্যদেব ভক্তগণের সম্মুখেই বসিলেন।

"আপনি কাশী মিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥
আকণ্ঠ পুরিয়া সবার করাইল ভোজন।
দেহ দেহ বলি প্রভু বলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবাইকে পরাইল প্রভু মাল্যচন্দন॥"

একাদশ অধ্যায়

আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা
ভক্তিমার্গের চরম অনুভব—গোপীপ্রেমাস্বাদন
লীলা সংবরণ

চৈতন্যদেব কি ভাবে সাধুসেবা করিতেন, সাধুগণের প্রতি তাঁহার কতদূর প্রীতিভক্তি ছিল হরিদাস ঠাকুরের বৃত্তান্ত হইতে তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়। সমীপাগত সকলের প্রতিই এইরূপ ব্যবহার তিনি চিরকাল করিয়াছেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না, বরং তিনি অনধিকারীর পক্ষে সংসার ত্যাগ দোষাবহ মনে করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেও এমন অনেক অতি উচ্চকোটীর মহাত্মা ছিলেন, যাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। তিনি ঐ সকল ব্যক্তিগণকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন তাহার নিদর্শনও পাঠক পাইয়াছেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের গৌরববৃদ্ধির জন্য, আদর্শ গৃহস্থের জীবন দেখাইবার জন্য পরিশেষে তিনি যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন এক্ষণে আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

সনাতন ধর্মের, বিশেষতঃ প্রেমভক্তিমার্গের সংরক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে এই প্রেমিক সন্ন্যাসিপ্রবর একদিকে যেমন শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথাদি সংসারত্যাগী দ্বারা বৈরাগী (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, তেমনি অন্যদিকে আবার গৃহস্থ ভক্ত পার্ষদগণের দ্বারা অনুরূপ বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া তৎপ্রচারিত ধর্মের সম্যক পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করেন। জগতে ত্যাগীর সংখ্যা অত্যল্প,—অধিকাংশ মনুষ্যই গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করে। সেইজন্য দুর্বল জীবকে অভয় দিবার, সুগম পথ দেখাইবার জন্য পরবর্তী কালে তিনি আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন।

যাঁহাকে তিনি অগ্রজতুল্য সম্মান করিতেন, আবার যিনি অনুজের ন্যায় সর্বদা তাঁহার আদেশপালনে তৎপর থাকিতেন, সেই পরম দয়াল অবধূতশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে বাস করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত প্রচারে—ভক্তিমন্দাকিনীর প্রবল বন্যায় বঙ্গদেশ ডুবুডুবু হইয়াছিল, একথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু প্রতি বর্ষেই রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ-সঙ্গে নীলাচলে আসিতেন এবং চৈতন্যদেবের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতেন। সেই সময়ের নৃত্যগীত-কীর্তন-প্রসাদগ্রহণাদি আনন্দোৎসবের কথা পাঠকের স্মরণ আছে। এইভাবে কয়েক

বৎসর যাতায়াতের পর একবার অবধূতশ্রেষ্ঠ রথযাত্রায় আসিলে ন্যাসিচূড়ামণি তাঁহাকে নিভৃতে লইয়া আপনার অন্তরের গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "প্রভুপাদ! গৃহস্থাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি,—অন্য তিন আশ্রমের অবলম্বনস্থান। সদ্গৃহস্থ না হইলে, চরিত্রবান ধার্মিক পুত্রকন্যা না জন্মিলে ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিবে কে? আপনাকে আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আপনিই এই গুরুভার উত্তোলন করিতে সমর্থ।"

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবধূতের পক্ষে দারপরিগ্রহ ও গৃহস্থাশ্রমে বাস শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হইলেও যিনি বাল্যকাল হইতে স্বাধীন সিংহের ন্যায় উন্মুক্ত ধরাতলে বিচরণ করিতেছেন, তাহার পক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গৃহপিঞ্জরে বাস করা কত কঠিন! কিন্তু এই আপনভোলা নির্বিকার আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী স্বীয় সুখসুবিধার কথা ভাবিয়া কখনও চৈতন্যদেবের আদেশ পালন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রেমিক-শিরোমণি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইলেন এবং বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বড়গাছিয়া-নিবাসী বিশিষ্ট ভক্ত পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের ভক্তিমতী কন্যাদ্বয় শ্রীমতী বসুধা ও শ্রীমতী জাহ্নবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সূর্যদাস স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবায় আপনার নন্দিনীদ্বয়কে দান করতঃ নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছিলেন। সাধুভক্ত-পাপীতাপীর আশ্রয়স্থল শ্রীপাট খড়দহে আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া অবধূত গৃহী সাজিলেন, এবং দেবীদ্বয় সর্বপ্রকারে তাঁহার অনুগামিনী হইয়া সহধর্মিণী নাম সার্থক করিলেন। জীবের শিক্ষার নিমিত্ত যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যৌবনে গৃহের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করিয়াছেন, তিনিই আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট গৃহস্থকে গার্হস্থ্যাশ্রমের আদর্শ দেখাইবার জন্য এক প্রৌঢ় অবধূতকে গৃহী সাজাইলেন! নিত্য আনন্দময় প্রভু নিত্যানন্দের আনন্দ সর্বত্রই; তাঁহার কাছে সংসার ও অরণ্য উভয়ই সমান ছিল। তাঁহার বংশধরগণ এখনও বর্তমান এবং খড়দহ তীর্থস্থানরূপে গণ্য। প্রভু নিত্যানন্দ এবং আচার্য অদ্বৈতের বংশধরগণ এবং অন্যান্য গোস্বামীরা চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিমার্গের সংরক্ষণ ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মের ও বৈদিক ভক্তিমার্গের প্রচার। যাহার জন্য তিনি জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, ভক্তগণের ভালবাসার ডোর ছিন্ন করিয়া পরে কাঙাল সাজিয়াছিলেন, সেই মহদুদ্দেশ্যে,—'জীবের শিক্ষা'র পথ দেখাইয়া তিনি স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের রচিত গ্রন্থাবলী হইতেই আমরা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম ও দার্শনিক মতামতের কথা জানিতে পারি।

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নানাবিধ সৃষ্ট পদার্থসমূহে তাঁহার নানাপ্রকার ভাব ও রূপের প্রকাশের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন 'কাল' ও 'ক্ষেত্র'-সমূহেও তাঁহার বিশেষ লীলাবিগ্রহসমূহ প্রকট রহিয়াছে। দুর্বল জীবের প্রতি কৃপা এবং ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্যই লীলাময়ের এই বিচিত্র লীলাখেলা। বিশেষ বিশেষ 'কালে' এবং বিশেষ বিশেষ 'ক্ষেত্রে' অনুভূতিসম্পন্ন মহাত্মারা এইরূপে ভগবানের যে সকল চিদ্‌বিভূতি উপলব্ধি করেন তাহাই স্থূল মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। পুণ্যভূমি ভারতের সর্বত্রই এইরূপ বিশেষ বিশেষ 'কাল' ও 'ক্ষেত্র'সমূহকে প্রাচীনকাল হইতেই মান্য করিয়া আসা হইতেছে। সময়ে সময়ে দেশের রাজনীতি ও ধর্মের সাময়িক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকলেরও বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটে সন্দেহ নাই। ক্ষমতাদৃপ্ত মানব স্বীয় গৌরববৃদ্ধির জন্য কখনও কখনও ঐ সকল পবিত্র পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে সত্য কিন্তু তাহা নিতান্তই ক্ষণিক। সাময়িকভাবে ঐ সকল প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র ও ধর্মভাব অপ্রকট হইলেও করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় ঐশ্বরিক বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষসকল জন্মগ্রহণ করিয়া যুগোপযোগিভাবে এই সকল লুপ্ত শাস্ত্র ও তীর্থাদির পুনরুদ্ধার করেন এবং ঐ সকল মহাপুরুষগণের জন্ম, কর্ম এবং সাধনা দ্বারা নূতন নূতন 'কাল' (লগ্ন) ও ক্ষেত্রের মহিমাও প্রকট হয়। চৈতন্যদেবের জীবনালোচনা করিলে এই বিষয় সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীশ্রীপুরীধাম ভারতের সর্বজনমান্য অতি প্রাচীন প্রধানতম তীর্থক্ষেত্রের অন্যতম। পরমেশ্বর পরমাত্মা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিভিন্নকালে বিভিন্ন ভক্তের নিকট কত ভাবে প্রকট হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; অনুসন্ধিৎসু হইলেও স্থূলদৃষ্টি ঐতিহাসিক ঐজন্যই শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্বরূপনির্ধারণ করিতে গিয়া দিশাহারা হন। চৈতন্যদেব স্বয়ং পুরীর মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতা 'দ্বারকানাথ'-রূপে দর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের উপর তাঁহার অন্তরের টান ভাষায় অবর্ণনীয়। প্রত্যহ প্রভাতেই মন্দিরে গমন তাঁহার দিবসের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। স্নানযাত্রার পর যখন মন্দির বন্ধ থাকিত তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অদর্শনে পুরীবাস তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইত। তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া কখনও কখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে 'মণিমা'[১] 'মণিমা' বলিয়া উড়িষ্যাবাসীর ন্যায় সম্বোধন করিতেন, আবার কখনও উড়িয়া পদ,—

---

১ মনিমা—সর্বেশ্বর। উড়িষ্যাবাসীরা মহারাজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করেন।

"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই।
মন মাতিলারে চকা চন্দ্রকু চাঁএ॥"

গাহিতে স্বরূপকে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিতেন, প্রভুর এইরূপ আনন্দোল্লাস দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। সময়ে সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতি প্রেমের প্রকাশে দেহ অনন্য ভাব ধারণ করিত, তখন 'জজ' 'গগ' বলিয়া কোন প্রকারে অন্তরের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতেন সম্পূর্ণ নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করা সম্ভব হইত না। শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তিভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক তদ্বিরচিত 'জগন্নাথাষ্টক' স্তোত্র হইতে পাইবেন।

"কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিন সঙ্গীতকবরো-
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিলসয়ন্।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৫

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং

ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।

সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।

অহো দীনানাথং [১] নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮

জগন্নাথাষ্টকংপুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯

তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত প্রসিদ্ধ 'শিক্ষাষ্টকম্' হইতে তৎপ্রবর্তিত ভক্তিমার্গ, ধর্মপথ, ভজনপ্রণালী ও সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতে ভাবানুবাদ সহ মূল শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হইলঃ

ভগবানের নাম-কীর্তন মাহাত্ম্য

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥ ১

"সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥" ১

ভগবান এক, নাম অনেক

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ॥
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলে অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়॥

১ পাঠান্তর— দীনেহনাথে।

সর্বশক্তি নামে দিলে করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥" ২

ভজন প্রণালী

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩
"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয় তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে করে আনের রক্ষণ॥
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥" ৩

শ্রদ্ধাভক্তি

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪
"ধনজন নাহি মাগি কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥ ৪

দাস্যভাব

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫
"তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥" ৫

প্রেমভক্তি

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬
"অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব-অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥" ৬

ভগবৎবিরহে ব্যাকুলতা

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৭

"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥" ৭

গোপীপ্রেম

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ॥ ৮

"আমি কৃষ্ণপদদাসী তেঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গন করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনুমন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বশ তনুমন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া আমা সনে করি ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তেঁহো লম্পট শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য॥
মন মোর বাঞ্ছে কৃষ্ণ তাঁর রূপে সতৃষ্ণ
তাঁরে না পাইয়া কাঁহে হয় দুঃখী।
মুঞি তাঁর পায়ে পড়ি লঞা যাঙ হাতে ধরি
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী॥" ৮

শিক্ষাষ্টকে যে সুমহান আদর্শের রেখাপাত, চৈতন্যদেবের জীবন তাহারই সুচিত্রিত আলেখ্য-জীবন্ত মূর্তি। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া আরও চব্বিশ বৎসর দেহ ধারণ করিয়া লোক-কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসি-জীবনের পরিচয় সংক্ষেপে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার নিম্নে উদ্ধৃত কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য-গীত প্রেম-ভক্তি দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড়ব্যাপী বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলা মুখ্য ধাম।
শেষে অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীত রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন ছলে॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেই মত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি দিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম বেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈলে আপন বাঞ্ছিত॥

তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম ছয় বৎসর প্রধানতঃ পরিব্রাজকরূপে তীর্থ-দর্শন-দেশভ্রমণ, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিনাম বিতরণ ও প্রেমভক্তিদানে ব্যয়িত হয়। পরবর্তী অষ্টাদশ বৎসর নীলাচল ত্যাগ করিয়া কোথাও যান নাই। তন্মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণের শিক্ষা, সংঘ-গঠন ও ভাবী প্রচারের সুব্যবস্থায় ব্যয়িত হয়। জীবনের বাকী দ্বাদশ বৎসর ভক্তিমার্গের চরমসাধ্য গোপীপ্রেম নিজ জীবনে প্রকটিত করিয়া স্বয়ং আস্বাদন করেন এবং জগতে প্রচার করেন। যোগ্য অধিকারী, বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের উপর ধর্মপ্রচার ও লোকশিক্ষার ভার দিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিলেন।

তাহার ফলে, অত্যল্প কালের মধ্যেই সমস্ত দেশে ভগবদ্‌ভক্তির বিমল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাপী-তাপী, দীন-দুঃখীর অন্তর শীতল হইল। ধর্মের গ্লানি ও জীবের দুঃখে যে মর্মভেদী যন্ত্রণা অনুভব করিয়া তিনি স্নেহশীলা বৃদ্ধা মাতা ও পতিব্রতা যুবতী স্ত্রীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতদিন পরে সেই যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইল। তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রভুপাদ নিত্যানন্দ ও আচার্য অদ্বৈত গৌড়ে অবস্থান করিয়া প্রেম-ভক্তির প্রবল বন্যায় দেশকে ভাসাইলেন, এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার কার্যে বিশেষ সহায়তা করিলেন। দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিম ভারতে তিনি স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া ভগবদ্‌ভক্তিমার্গ প্রচার করেন, এবং স্থানে স্থানে বিশিষ্ট অধিকারী ভক্তগণকে বিশেষরূপে কৃপা করিয়া ভক্তিধর্মের প্রচারকরূপে তাঁহাদিগকে গঠন করিয়া আসেন। সেই সকল স্থানে তিনি স্বহস্তে যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন দিনে দিনে উহা অংকুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। সেই সময়ে বিধর্ম ও বিজাতীয়ের প্রভাবে পর্যুদস্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেরই সর্বাপেক্ষা দুরবস্থা হইয়াছিল। তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি ঐ অঞ্চলের ভার মহাপণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী, ত্যাগি-ভক্ত শ্রীরূপ-সনাতনের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তার জন্য পরে রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতিকেও পাঠাইয়াছিলেন,—পাঠক ইহা অবগত আছেন। এই ভাবে ভক্তি-প্রেম প্রচারের স্থায়ী কেন্দ্রসকল চারিদিকে গড়িয়া উঠিলে চৈতন্যদেব অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা ভ্রমণ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥"

এইভাবে সন্ন্যাসের পর দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইলে, তাঁহার মন দিনে দিনে স্থূল বাহ্য জগতের সম্পর্ক পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম ভাবজগতেই অধিকাংশ সময় বিচরণ করিতে লাগিল। ভক্তিমার্গের চরম অবস্থাতে সিদ্ধ-সাধক যে-সকল দিব্য অনুভব লাভ করিয়া কৃতার্থ হন,—চৈতন্যদেব জীবনের শেষ কয়েক বৎসর, প্রেমভক্তির সেই সব দেব-দুর্লভ অনুভবের মূর্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ হইয়া বর্তমান ছিলেন। চৈতন্য-জীবনের শেষ অধ্যায়—অন্ত্য-

লীলায় অভিব্যক্ত ভক্তিমার্গের সেই সর্বোচ্চ আদর্শের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ভক্তিমার্গের চরম অনুভব গোপীপ্রেম আস্বাদন।

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥"
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭।১৬-১৮

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"
- শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তত্ত্বজ্ঞ, নিত্যযুক্ত, একনিষ্ঠ ভক্তই সর্বোত্তম বলিয়া বর্ণিত। এই সকল মহাত্মা আত্মারাম হইয়াও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তিসম্পন্ন হন—শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হইয়াছে। দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে—অন্তরে বিন্দুমাত্র ভোগবাসনা থাকিতে ঐরূপ ভক্তিলাভ অসম্ভব। উহাই পরা ভক্তি—গোপী-প্রেম। সাধন-ভজন সহায়ে সমাধিশুদ্ধ অন্তরে ঐরূপ ভক্তির স্ফুরণ হয়। ব্রজগোপীগণ ঐরূপ উচ্চ অধিকারিণী ছিলেন।[১]

কৃপাজলধর শ্রীভগবানের কৃপাবারি-বর্ষণে সাংসারিকতায় বিশুষ্ক ভক্তের হৃদয়সরসী পূর্ণ হইলে, যখন তাহাতে ভক্তিশতদল বিকশিত হয়, তখন লোলুপ মধুপের ন্যায় ভক্তবৎসলও সেই প্রস্ফুটিত হৃদয়কমলের প্রেমমধু পান করেন। তাহাই প্রেমিক ভক্তের আস্বাদনীয় আনন্দ-চিন্ময়-রস। বিভিন্ন শ্রেণীর কমলের মধুর তারতম্যের ন্যায়, বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী ভক্তের রসেরও তারতম্য দেখা যায়। আলঙ্কারিকগণের ভাষায় উহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারি প্রকার। বাৎসল্য ও মধুর রস অতিশয় গাঢ় ও সুস্বাদু; তন্মধ্যে উজ্জ্বল মধুর রসই সর্বোৎকৃষ্ট। পরমহংসাগ্রণী চিরকুমার শুকদেব, রাজর্ষি পরীক্ষিতের নিকট ভাগবতকথা-প্রসঙ্গে ব্রজগোপীগণের সহিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন অবলম্বনে সেই অপূর্ব উজ্জ্বল রসের যে পরিচয় দিয়াছেন, যাহা চিরকাল লোকের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত, চৈতন্য-দেবের জীবনের শেষ অংশ তাহারই ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ। শাস্ত্র ও

১ "নির্বিকল্প সমাধি পরাভক্তি লাভের প্রথম সোপান।"
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (সাধকভাব)

ঋষিবাক্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিবার জন্য সেই অত্যদ্ভুত প্রেমের মাধুরিমা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য, জীবকে অহৈতুকী ভক্তি, নিষ্কাম প্রেম ও রস-স্বরূপ শ্রীভগবানের অপূর্ব মাধুর্যরাশি আস্বাদন করাইবার জন্যই তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অংশের অভিনয়। এই অতি গুহ্য গোপী-প্রেমাস্বাদন লীলা অল্প লোকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পুরীতে শ্রীমৎ দামোদর স্বরূপ, রামানন্দ রায়, শিখি মাহিতী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী পরমা বিদুষী শ্রীমতী মাধবী দাসী—মাত্র এই কয়েকজনই এই সকল উচ্চ অবস্থার কথা বুঝিতে পারিতেন।

"
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী তিন আর ভগিনী অর্ধজন॥"

তাঁহার দেহে বিভিন্ন প্রকার ভাবের আবেশে নানারূপ পরিবর্তনের কথা সকলেরই জানা ছিল; কিন্তু এখন হইতে অত্যদ্ভুত প্রেমের প্রকাশে যেসকল অদৃষ্টপূর্ব বিকার দেখা দিতে লাগিল তাহা দেখিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি তখনও পূর্বের ন্যায়ই নিত্য মন্দিরে গমন, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন, সমুদ্রস্নান, ভিক্ষা, ভক্ত-সঙ্গ, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, কীর্তনাদি করিতেন বটে, কিন্তু উহা যেন অভ্যাসবশে পূর্বের বেগেই চলিতেছিল। বস্তুতঃ তাঁহার মনঃ-প্রাণ তখন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেই লীন হইয়া থাকিত। সেই সময়ের চিত্র 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় :

"উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লইয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া[১]॥"

চৈতন্যদেব সেই সময়ে অধিকাংশ কাল অতিপ্রিয় ভাবগ্রাহী ভক্তদ্বয় স্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে অবস্থান করিতেন। কুঠিয়ার ভিতরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাঁহারা যাহা আলোচনা করিতেন, তাহা সাধারণ লোক ত দূরের কথা, ভক্তগণের পক্ষেও দুরধিগম্য ছিল। তবে বাহিরে লোকের সঙ্গে তিনি যথাসাধ্য পূর্বের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। সেইজন্য অনেকেই তাঁহার সেই গোপীভাব ও শ্রীকৃষ্ণ-অনুভবের কথা জানিতে পারিত না। লোক লোচনের অন্তরালে নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত কুঠিয়ায় এই সময়ে তাঁহার যেসকল লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া-

১ উঘারিয়া—প্রকাশিয়া।

ছিল তাহা 'গম্ভীরা-লীলা' নামে আখ্যাত হইয়াছে। কারণ তাঁহার [illegible] 'গম্ভীরা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব স্বরূপ ও রামানন্দ রায়ের নিকট নিজের অন্তরের কথা, 'মনের ভাব' 'উঘাড়িয়া' বলিয়াছিলেন,

'শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদধর্ম
যোগী হইয়া হইল ভিখারী॥
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক-কারিগর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি
আশা ঝুলি স্কন্ধের উপর॥
চিন্তা-কন্থা উড়ি গায় ধূলি বিভূতি মলিন কায়
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলি নিজ মাথে
ভিক্ষা মাগে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাসশুকাদি যোগিগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে
সেই তর্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন বিষয় ভোগ মহাধন
তবে ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥
যত যত প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাশন
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে॥
কৃষ্ণগুণ রূপ রস গন্ধ শবদ পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥
শূন্যকুঞ্জ মণ্ডপ-কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

মনকৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥"

চৈতন্যদেবের নিদ্রা বড়ই কম; ভজন-কীর্তনে ও ধ্যানধারণাতে রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। এখন আরও কমিয়া গেল। স্বরূপ তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া স্বাস্থ্যহানির ভয়ে শঙ্কিত হইয়া অনুযোগ দিতেন এবং নিয়মিতভাবে আহারনিদ্রা করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেন। প্রেমিক সন্ন্যাসী তখন স্বরূপের গলা জড়াইয়া প্রেমভাবে মধুরস্বরে বলিতেন, "প্রিয় বান্ধব! আমি কি করিব, আমি নিরুপায়। আমার মন আর আমাতে নাই। শূন্য মোর শরীর আলয়।" নিরঞ্জন (নির্গুণ, নির্বিশেষ) আত্মা (পরমাত্মা) শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন (অপরোক্ষ অনুভব) করিবার জন্য তাঁহার ধ্যানেই রাত্রি কাটিয়া যায়, মন তাঁহাতেই সম্পূর্ণ বিলীন (অন্তর্দশা—নির্বিকল্প সমাধিস্থ) হওয়াতে বাহ্যিক ব্যবহার নিয়মিত আহার-নিদ্রা সম্ভব হইতেছে না। তাঁহার এই সকল উক্তি শুনিয়া স্বরূপ-রামানন্দের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। প্রেমাশ্রুতে তাঁহাদের গণ্ডদেশ প্লাবিত হইত। বাস্তবিক তাঁহার সেই সময়কার অবস্থা—ধ্যান-তন্ময়তা ও ধ্যেয় বস্তুতে মনের বিলয়-সমাধির কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কত উচ্চভূমিতে, স্থূল জগতের অন্তরালে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে তিনি তখন বিচরণ করিতেছিলেন তাহা কে বুঝিবে? স্বরূপ ও রামানন্দ তখন সর্বদা কাছে কাছে থাকিয়া গোবিন্দ কাশীশ্বর প্রভৃতি সেবকগণের সহায়তায়, অতি সন্তর্পণে, সেই পবিত্র দেহ রক্ষা করিতেছিলেন।

এই অতি গুহ্য লীলার কথা স্বরূপ তাঁহার অতি অনুগত প্রিয়শিষ্য রঘুনাথ দাসকে বলিয়াছিলেন; রঘুনাথ স্বীয় গ্রন্থে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার রঘুনাথের কৃপাতেই সেই সকল লীলার কথা অবগত হইয়াছিলেন ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের শেষভাগে উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা আমাদের সাধ্যাতীত, সামান্য আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। যাঁহাদের বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের শেষভাগ, কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাহায্য লইয়া, উত্তম মুদ্রিত ও সুসম্পাদিত টীকা ও টিপ্পনীযুক্ত পুস্তকের সহায়তায় আলোচনা করিবেন। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, মলিনত্ব, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ, মৃত্যু (নিস্পন্দন) এই দশটি দশা প্রেমের গভীরতায় ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়। উক্ত দশাসমূহের দুই চারিটিরই বিকাশ দুর্লভ। কিন্তু চৈতন্যদেবের দেহে এই সময়ে উক্ত দশ দশা অনুক্ষণ প্রকট হইত।

"এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নাহি মনে॥"

কখনও ভগবানের বিরহে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এমন কাতর হইতেন যে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতে থাকিত, দৈন্য বিষাদে তনু ক্ষীণ হইয়া পড়িত; করুণ আর্তনাদ ও হাহুতাশ-বাক্যে খেদোক্তি শুনিয়া অন্তরঙ্গগণেরও প্রাণ ফাটিয়া যাইত।

"হা! হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ্ কাঁহা পাঙ্ মুরলীবদন॥"

বলিয়া স্বরূপের গলা জড়াইয়া যখন রোদন করিতেন, তখন সেই ব্যাকুলতা অবর্ণনীয়। আবার ভগবদ্‌ভাবে বিভোর চৈতন্যদেবের অন্তরে যখন মিলনের স্ফূর্তি হইত তখন হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া দেহে এরূপ পুলকোদ্‌গম হইত যে সমস্ত শরীরের লোমকূপসমূহ শিমুল কাঁটার মত ফুলিয়া উঠিত এবং তাহাতে বিন্দু বিন্দু রক্তোদ্‌গম দেখা যাইত। তাঁহার সেই সময়ের আনন্দোচ্ছ্বাস ভক্তগণও পরমানন্দে সম্ভোগ করিতেন। এইরূপ কখনও বিরহ, কখনও মিলন, কখনও অন্যপ্রকার আবেশে সর্বদা ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট থাকায় দেহাত্ম-বুদ্ধির লোপ পাইত। কাজেই নিয়মিত আহারনিদ্রা সম্ভব হইত না। আবার কখনও মন দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া ভগবানে এমনই ভাবে বিলীন হইত যে তখন দেহকে জড়বস্তুর মত অসার বোধ হইত, কখনও কোন বিশেষ ভাবের আবেশে হস্তপদ গুটাইয়া গিয়া দেহ কূর্মাকৃতি মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করিত। আবার কখনও অন্যপ্রকার আবেশে ভূলুণ্ঠিত দেহের অস্থিগ্রন্থি শিথিল হইয়া স্বাভাবিক অপেক্ষা দীর্ঘাকার ধারণ করিত। এই সকল অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। সময়ে সময়ে দেহে প্রাণের ক্রিয়া বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণ অমঙ্গল আশঙ্কায় আকুল হইতেন। স্বরূপ দামোদর এই সকল অবস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার নির্দেশমতে তখন ভাবের অনুকূল 'নাম' শুনাইতে শুনাইতে দেহে পূর্ববৎ চেতনা সঞ্চার হইত। ভগবৎপ্রেমের অদ্ভুত প্রকাশে কখনও রোদন-বিলাপ, কখনও হাস্য-উল্লাস, কখনও বিরহ, কখনও মিলন, আবার কখনও বা অভিমানাদি বিবিধপ্রকার প্রণয়ভঙ্গী দেখিয়া, অন্তরঙ্গগণের অন্তরও প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। রামানন্দ রায় ভাব বুঝিয়া অনুকূল শ্লোক ও কবিতাসমূহ পাঠ করিতেন, দামোদর সুমধুর পদাবলীসমূহ গান করিতেন,—তাহাতে রসের সমধিক পরিপুষ্টি ও বিকাশ হওয়ায় তাঁহার অনুভবও গাঢ়তর ভাব ধারণ করিত, আর সকলেই পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন।

যাহারা ভগবদ্‌ভাবের স্বরূপ (গূঢ় রহস্য)—অপূর্ব বিমলানন্দের কথা অনুধাবন করিতে অক্ষম, তাহাদের কাছে, বিশেষতঃ দেহসর্বস্ব জড়বাদীর

নিকট, এই সকল ভাবাবেশ ও দৈহিক বিকার, বড়ই দুঃখকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কার্যতঃ উহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগজনিত সর্বাধিক সুখ পরিণামে দুঃখেই পরিণত হয়; আর অতীন্দ্রিয় ভগবদনুভব বাহিরে দেহসর্বস্ব বিষয়ীর চক্ষে দুঃখের মত দেখা গেলেও উহা অন্তরে অনাবিল অক্ষয় অনন্ত আনন্দপ্রস্রবণস্বরূপ। ভগবৎ-প্রেমিকের অন্তরে বিরহ অথবা মিলন যেকোন প্রকারেই হউক মাধুর্যময় ভগবানের "আনন্দ চিন্ময়" রসের আস্বাদনে যে অপারিসীম সুখের সঞ্চার হয়, তাহার মর্ম আমরা কি বুঝিব? তবে সংসারের যাবতীয় সুখরাশি তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয় এবং সেজন্য বিষয়ভোগে আর তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় বাহিরে বিষয়ী লোকের নিকট দুঃখের আকারে দেখা গেলেও, বিরহের অবস্থাতে ও ভগবদনুভবে অন্তর পরমানন্দেই পূর্ণ থাকে।

"অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥"

চৈতন্যদেব অন্তরে যে আনন্দরাশি অনুভব করিয়া বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইতেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া স্বরূপ দামোদরকে বলিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এতাদৃশ যে একবার সন্ধান পাইলে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন এক সঙ্গেই তাহাতে বিলীন হয়।"

"কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ অধররস
যার মাধুর্য কহনে না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যুগণ
সবে কহে 'হর পরধন'॥
এক অশ্ব এক ক্ষণে পাঁচ পাঁচদিকে টানে
এক মন কোন দিকে যায়।
এক কালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এ দুঃখ সহন না যায়॥"

একদিন চৈতন্যদেব এইরূপ ভাবের আবেশে, রাত্রিকালে কুঠিয়া হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সারা রাত্রিই তিনি প্রায় জাগিয়া থাকিতেন, আর তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সুমধুর কৃষ্ণনাম শোনা যাইত। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ স্বরূপের তন্দ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ঘরের ভিতর চৈতন্যদেবের কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। মনে সন্দেহ হওয়াতে কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন

এবং তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতীব চিন্তিত হইয়া সকলে মিলিয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন।

"চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া॥
সিংহদ্বারে উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছে চৈতন্য গোসাঞি॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা॥
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসাশ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্তপাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন চর্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্তপদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্মমাত্রে উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণে লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিলা॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল।
পূর্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল॥"

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে চৈতন্যদেব বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—

"সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাঁহা কর কি এই স্বরূপে পুছিল॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজ ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিব গোচরে॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল॥

শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি কৃষ্ণ মোর হয় বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান॥"

আর একদিন পূর্বাহ্নে সমুদ্রস্নানে যাইবার সময় চটক পর্বত[১] দেখিয়া গিরিগোবর্ধন জ্ঞানে ভাবাবেশ হইল। আর অমনি সেই দিকে তীরবেগে ছুটিয়া চলিলেন। সঙ্গী সেবক গোবিন্দ প্রাণপণে ছুটিয়াও ধরিতে পারিলেন না। তখন তিনি জোরে চিৎকার করিলেন। গোবিন্দের চিৎকারে অন্যান্য ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

"প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শকতি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইল॥
করঙ্গের জলে করে সর্বাঙ্গাসিঞ্চন।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন॥"

ততক্ষণে স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে অতি উচ্চ আশ্চর্য সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন।

"উচ্চ সংকীর্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জনে॥

---

১ চটক পর্বত—পুরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সমুদ্রকিনারে ক্ষুদ্র পর্বতাকার বালির স্তূপ।

এই মত বহুবার কীর্তন করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দিকে ভরি॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল॥
গোবর্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্ধনে।
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে॥
গোবর্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি আইল রাধাঠাকুরাণী।
তার রূপভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিল কন্দরাতে।
সখীগণে চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥"

এই বলিয়া প্রেমিক সন্ন্যাসী ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিরহ-বেদনা-কাতর প্রেমময়মূর্তি দেখিয়া উপস্থিত ভক্তগণেরও হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারাও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহারাজগণ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে চৈতন্যদেব অতিশয় সম্মান করিতেন। তখন ধীরে ধীরে তাঁহার মন বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিতেছিল, কাজেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে বন্দনা করিলেন। লৌকিক ব্যবহারে তাঁহার কখনও উপেক্ষা ছিল না,- অবশ্য সহজ অবস্থায় থাকিলে।

একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন করিতে গিয়াছেন; সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া গোপীভাবে ভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইন্দ্রিয়মন তাহাতে লীন হইল,—বাহ্যিক 'অগেয়ান' (অজ্ঞান) হইলেন। সকালবেলার

ভোগারতি শেষ হইলে সঙ্গী ভক্তগণ কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান করাইয়া কুঠিয়ায় লইয়া আসিলেন। কুঠিয়াতে ফিরিয়াও সেদিন তাঁহার ভাবের সম্পূর্ণ উপশম হইল না। স্বরূপ-রামানন্দের গলা ধরিয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে শ্রীমতী রাধারাণীর উৎকণ্ঠা স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করতঃ সেই ভাবের শ্লোকসমূহ পাঠ ও সরস ব্যাখ্যা করিয়া হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

"এত কহি গৌর হরি দুই জনার কণ্ঠে ধরি কহে
শুন স্বরূপ রাম রায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ্ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ্
দোঁহে মোর কহ সে উপায়॥"

তাঁহার মুখে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের বর্ণনা ও গোপীগণের অহৈতুকী নিষ্কাম শুদ্ধ প্রেমের পরিচয় পাইয়া স্বরূপ-রামানন্দের অন্তরেও পরমানন্দের সঞ্চার হইল।

"এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোকের পঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোকে গীতে প্রভুর করান আনন্দ॥"

সমুদ্রতীরবর্তী কোন পুষ্পোদ্যান দেখিয়া, একদিন তাঁহার অন্তরে বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগিল। রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে লইয়া অন্তর্ধান করিলে, গোপীগণ ব্যাকুল হইয়া বনে বনে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে-ছিলেন, চৈতন্যদেবের অন্তরে এই ভাবের স্ফুরণ হইল এবং ব্যাকুলভাবে দ্রুত উদ্যানের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ—ব্যাকুলা বিরহিণী গোপীগণের উক্তিসকল পাঠ করিতে করিতে তরুলতাদিগকে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়াতে চিত্ত অতীব কাতর হইল। তখন অন্তরে যমুনাতটের স্ফুরণ হওয়ায় তদুদ্দেশ্যে আবার দ্রুত ধাবিত হইলেন।

"এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে॥

সৌন্দর্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥
পূর্ববৎ সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥
পূর্ববৎ সবে মিলি করাইলা চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দর্শন।
যাহার সৌন্দর্য হেরিল নেত্র-মন॥
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রমে নয়ন॥"

চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীর বর্ণনাত্মক শ্লোকসমূহ পাঠ ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় উপলব্ধি বাহিরে প্রকাশ করিলেন। নিজমুখে বর্ণনা করিয়া তৃপ্তি হইল না, তাই রামানন্দের প্রতি আদেশ হইল। রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্যপূর্ণ শ্লোক পাঠ করিলেন আর চৈতন্যদেব স্বয়ং সেই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া রসের বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিজে অনুরূপ আরও শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ভাব ও রসের পুষ্টিসাধনের জন্য স্বরূপকে অনুরূপ পদ গান করিতে বলিলেন। রসজ্ঞ ভাবুক স্বরূপ তখন সময় বুঝিয়া জয়দেবের একটি প্রসিদ্ধ গীত গাহিলেন,—

"রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।"

সুললিত স্বরে বিশুদ্ধ তানলয়ে গীত পদ শুনিবামাত্র চৈতন্যদেবের অন্তরের প্রেমসমুদ্র আরও উথলিয়া উঠিল,—গানের সঙ্গে তিনি নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে দেহে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। সেই অদ্ভুত ভাব ও নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণেরও আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। তাঁহার আদেশানুযায়ী স্বরূপ বারংবার সেই পদ গাহিলেন আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ নৃত্য করিয়াও তাঁহার সাধ মিটিল না। তখন স্বরূপ গান বন্ধ করিলেন কিন্তু চৈতন্যদেবের নৃত্য চলিতে লাগিল। তিনি 'বোল' 'বোল' বলিয়া স্বরূপকে গাহিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাবের আতিশয্য বুঝিয়া স্বরূপ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

"রামানন্দ রায় তখন প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা যাইলা ঘরে॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইলা শয়ন।
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজ স্থান॥"

এইরূপে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অনুক্ষণ চিত্ত বিহ্বল থাকিলেও রথযাত্রাব কালে গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী আগমন করিলে চৈতন্যদেব অন্তবেব ভাব চাপিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়া, পূর্ববৎ তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্যগীত, সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ ধারণ মহোৎসবাদি করিয়া আনন্দ করিলেন।

"ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল যবে গেল গৌড়দেশে॥
তাঁ সবার সঙ্গে ছিল প্রভুর বাহ্য জ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হইল উন্মাদ প্রধান॥
রাত্রি দিন স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ॥"

তখন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী পূর্ব অভ্যাসবশে আপনা আপনি যেন কুম্ভকার-চক্রের ন্যায় চলিতেছিল। কিন্তু ভাবের আতিশয্যে এখন হইতে তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। যথানিয়মে তিনি একদিন সকালবেলা মন্দিরে গেলে সিংহদ্বারে প্রধান দ্বারপাল তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া অভ্যর্থনা করিল। তাঁহার মনে তখন অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবাবেশে দ্বারপালের হাত ধরিয়া প্রেমস্বরে ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ? মোরে কৃষ্ণ দেখাও।" ভগবদ্ভক্ত দ্বারী তাঁহাব ভাবাবেশ বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ব্রজেন্দ্রনন্দন এখানেই আছেন, আমার সঙ্গে আসিলেই দর্শন পাইবেন।" দ্বারীর কথায় প্রাণে উল্লাসের সঞ্চার হইল, তখন,—

"তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেল ধরি তার হাত॥
যেই বলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহে দর্শন॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥"

চৈতন্যদেব প্রাণ ভরিয়া প্রিয়তমকে দর্শন করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালীন 'গোপবল্লভ'-ভোগ লাগিল, ভোগান্তে আরতি হইল এবং আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা শব্দে চৈতন্যদেবের মনে কিঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্তি দেখা দিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ, প্রসাদীমালা আনিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং সেই ভোগের প্রসাদ তাঁহার হাতে দিলেন। চৈতন্যদেব প্রসাদের কিঞ্চিৎ জিহ্বাতে দিয়া, অবশিষ্ট গোবিন্দের নিকট দিলেন। প্রসাদের আস্বাদ গ্রহণ করিবামাত্র আবার চিত্তে প্রেমাবেশ হইল। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের সংস্পর্শেই প্রসাদের এইরূপ অপূর্ব স্বাদ ভাবিয়া তিনি প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তখন কোনপ্রকারে ভাব চাপিলেন বটে, কিন্তু বার বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সুকৃতিলভ্য ফেলা লব।" শ্রীশ্রীজগন্নাথসেবক অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথার অর্থ কি?"

"প্রভু কহে এই যে দিল কৃষ্ণ-অধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।
তার একলব পায় সেই ভাগ্যবান॥
সামান্য ভাগ্য হইতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
সুকৃতি শব্দ কহে কৃষ্ণকৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥"

শ্রীশ্রীজগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া চৈতন্যদেব কুঠিয়াতে ফিরিলেন, এবং সমুদ্রস্নানান্তে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু অন্তরে সেই প্রসাদের অমৃতোপম স্বাদ, কৃষ্ণ-অধরামৃতের স্মৃতি জাগরূক থাকায় তাঁহার মন সারাদিনই প্রেমে মাতোয়ারা রহিল।

"সন্ধ্যাকৃত্য পুনঃ নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কথা রঙ্গে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরী ভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥
রামানন্দ সার্বভৌম স্বরূপাদিগণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥
প্রসাদের সৌরভ মাধুর্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন॥"

সকলেই প্রসাদের আস্বাদ পাইয়া বিস্মিত হইলে চৈতন্যদেব বলিলেন "ঘৃত, চিনি, কর্পূর, এলাচি, লবঙ্গ, মরিচ, কাবাবচিনি, দারুচিনি প্রভৃতি যে সকল মশলাদ্বারা এই দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সাধারণ বস্তু; সকলেই তাহাদের স্বাদ জানি। কিন্তু এই প্রসাদে যে অলৌকিক স্বাদ-গন্ধ পাইতেছি তাহা ত এই সকল দ্রব্যে নাই। শ্রীকৃষ্ণের অধরস্পর্শেই প্রসাদ এইরূপ অলৌকিক সুস্বাদু হইয়াছে।" তাঁহার বাক্যে ভক্তগণের হৃদয়ে পরমানন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা উল্লসিত হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে চৈতন্যদেব ইঙ্গিত করিলে রামানন্দ রায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের মাধুর্য-বর্ণনাত্মক শ্লোক আবৃত্তি করিলেন,—

"সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥"

—ভাগবত, ১০।৩১।১৪

(গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে বীর! আনন্দপ্রদ, কৌতুকক্রীড়া বিবর্ধক, শোকবিনাশক, শব্দায়মান বেণু-সংলগ্ন তোমার অধরামৃত যাহা মনুষ্যের অন্তর হইতে অন্য (বিষয়) তৃষ্ণা নিবারণ করে—আমাদিগকে দান কর।

শ্লোক শুনিয়া চৈতন্যদেব বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং স্বয়ং অনুরূপ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণকে কৃষ্ণপ্রেমরসের পরিচয় দিলেন। অধরামৃতের মাধুর্য বর্ণনা করিতে করিতে অন্তরে সেই রস অনুভবের জন্য উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল, আর অমনি তিনি ব্যাকুল হইয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। সেই তীব্র বিলাপ শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ও বিগলিত হইল:

'এতেক বিলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লইয়া স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায় ভাবাবেশে মূর্ছা যায়
এইরূপে রাত্রি দিন যায়॥"

এইভাবে স্বরূপ ও রামানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় রাত্রির অর্ধেক কাটিয়া যাইত, পরে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া উভয়ে বিদায় লইতেন। রামানন্দ রায় আপনার ঘরে গমন করিতেন। স্বরূপের আসন ছিল কুঠিয়ার সংলগ্ন। গোবিন্দ কুঠিয়ার দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকিতেন। একদিন গভীর রাত্রে গোবিন্দ তাঁহার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া স্বরূপকে খবর দিলেন। স্বরূপ

কুঠিয়ার ভিতরে গিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সকলের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল। দেউটি[১] জ্বালিয়া চারিদিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কাশী মিশ্রের বাড়ীর উদ্যানের যে অংশে কুঠিয়া, তাহার চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা, প্রাচীরের মধ্যে তিন দিকে দরজা আছে। তাঁহারা দেখিলেন, দরজার কপাট ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধই রহিয়াছে, প্রাচীরের বাহিরে গেলে অবশ্যই দরজা খোলা থাকিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভিতরে খোঁজ করিয়া তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। অগত্যা সকলেই অধিকতর চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গিয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

"ইতিউতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেল।
গাভীগণ মধ্যে যাইয়া প্রভুকে পাইল॥
পেটের মধ্যে হস্তপদ কূর্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল॥
গাভীসব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইযা ঘরে আনিল ভক্তগণ॥"

ঘরে লইয়া আসিয়া ভক্তগণ সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে নাম শুনাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে নাম শ্রবণ করাইবার পর বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ প্রসারিত হইয়া দেহের পূর্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থা হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং উঠিয়া বসিয়া চমকিতের ন্যায় ইতিউতি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। পরে ভাববিহ্বল গদগদস্বরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় আনিলে? আমি বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের লীলা-হাস্যপরিহাস, রঙ্গরস দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছিলাম। তোমরা জোর করিয়া আমাকে সেখান হইতে লইয়া আসিয়া বঞ্চিত করিলে।" অতিশয় দুঃখিত চৈতন্যদেব স্বরূপকে সান্ত্বনার জন্য ইঙ্গিত করিলে রসজ্ঞ স্বরূপ ভাগবত হইতে কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা গোপীগণের আক্ষেপধ্বনিসূচক শ্লোক শুনাইলেন। সুমধুর শ্লোক শুনিয়া তাঁহার অন্তরের ভাব গাঢ়তর হইল। এই প্রকারে অহরহঃ প্রিয়তম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার প্রেমমাধুর্য-

১ দেউটি—মশাল।

রস পান করিয়া প্রেমিক সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়গম্য মায়িক জগতের বাহিরে, বিরজার পরপারে, অপ্রাকৃত বিস্ময়লোক গোলোকধামের কেন্দ্রস্থানে প্রকট নিত্যবৃন্দাবনের মাধুর্যরস, মর্ত্যবাসী ভক্তগণের গোচরীভূত করাইতে লাগিলেন।

শরৎকালে বিমল চন্দ্রকিরণে পুলকিতা ধরণী যখন স্বপ্নালোকের ন্যায় প্রতীয়মানা হন,- জাতি যূথী মল্লিকা মালতী শেফালির গন্ধে চারিদিক ভরপুর হইয়া থাকে, তখন সকল মনুষ্যের মনেই নিখিল সৌন্দর্যের আকর-ভূমি সেই চিরসুন্দরের দর্শন-লালসা জাগে। ভাবুকের প্রাণ মিলনতৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়। এই শারদীয়া পূর্ণিমা নিশীথেই ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপার পরাকাষ্ঠা--প্রেমময়ের প্রেমলীলার রাসক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। চৈতন্যদেব এই সকল রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া ত দূরের কথা, শুইতে বসিতে এমনকি ঘরের ভিতর স্থির হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। বৃন্দাবনভাবে ভাবিত হইয়া অন্তরঙ্গ-সঙ্গে 'কৃষ্ণকথায়', ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত প্রেমলীলারস আস্বাদনে নিশিযাপন করিতেন। কোন কোন রাত্রে আবার কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপাঙ্গনার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে পুরীর উপবনসমূহে ভ্রমণ করিতেন। ভাব যখন গাঢ় আকার ধারণ করিত এবং তিনি নিজেকে ও পারিদৃশ্যমান জগৎকে বিস্মৃত হইতেন, তখন তাঁহার সমাধি-পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অন্তর্দশায় জগৎকারণ পরমাত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-রসময় লীলা স্ফুরিত হইত। আবার সেই অলৌকিক ভাবের উপশম হইলে, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ সবের বর্ণনা শুনিতে পাইয়া ভক্তগণের প্রাণেও উল্লাসের সঞ্চার হইত।

একদিন এইরূপে শারদীয়া নিশিতে নিশানাথের আগমনে ধরণী অপূর্ব শ্রী ধারণ করিলে, ভাবুক সন্ন্যাসী ভক্তগণসহ পুরীর উপবনসমূহে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। সকলেরই মন অন্তর্মুখী এবং চিত্তে বৃন্দাবনলীলার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। এক স্থানে বসিয়া তাঁহারা ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইলেন। হঠাৎ স্বরূপের চমক ভাঙ্গিল। তিনি চৈতন্যদেবের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন,—কোথাও তাঁহাকে দেখা গেল না। উঠিয়া অনুসন্ধান করিলেন, বাগানের ভিতর খুঁজিলেন, -পাইলেন না। স্বরূপ অতীব বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া ভক্তগণসহ খুঁজিতে বাহির হইলেন এবং চারিদিকে অন্য লোক পাঠাইয়া স্বয়ং জনকয়েক ভক্তসহ সমুদ্রের কিনারে কিনারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এদিকে চৈতন্যদেব ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সকলের অলক্ষিতে বিদ্যুদ্বেগে বাগিচা হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল যমুনাতীরে গোপীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিতেছেন ইহা দর্শন করিয়া যমুনা জ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। তখন সমুদ্রে ভাটার টান পড়িয়াছিল, তাঁহার দেহ ভাটার টানে

কোনারকের[1] দিকে ভাসিয়া চলিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলানুভবে তখন তাঁহার অন্তর্দশা, দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলীন। কাজেই তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য।

রাত্রিকালে মাছ ধরিবার জন্য এক ধীবর সমুদ্রের কিনারে জাল পাতিয়া বসিয়াছিল। ভাটার টানে ভাসিয়া গিয়া অসাড় দেহ জালে আটকাইলে সে খুব বড় মাছ মনে করিয়া টানিয়া তীরে তুলিয়া আনিল। কিন্তু কাছে গিয়া যখন দেখিল মাছ নহে মানুষ, তখন তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। জালিয়া ভয়ে ভয়ে অসাড় দেহকে জাল হইতে খুলিল এবং এক পাশে বালির উপর রাখিয়া দিল। দেহ স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীরে এক প্রবল শিহরণ উপস্থিত হইল। ভীত ধীবর নিশ্চয় করিল, তাহাকে ভূতে ধরিয়াছে। বেচারী জোরে জোরে ভগবানের নাম লইতে আরম্ভ করিল এবং তাড়াতাড়ি জাল গুটাইয়া কাঁধে ফেলিয়া ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু ভাল রূপে ইচ্ছামত চলিতে পারিল না। ক্রমশঃই যেন আবেশের ঘোর বাড়িয়া চলিল। শেষে সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, হাসিয়া-কাঁদিয়া নাচিয়া-গাহিয়া পাগলের মত চলিতে লাগিল, মুখে কিন্তু অবিরাম হরিনাম।

স্বরূপ সঙ্গিগণসহ চৈতন্যদেবের সন্ধানে সেই দিকেই চলিয়াছেন, কিয়দ্দূরে গিয়াই জালিয়ার সঙ্গে দেখা হইল। জালিয়ার ভাব দেখিয়া স্বরূপ অতীব বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ করিতেছ কেন? আর এই রাস্তায় অন্য কাহারও সহিত দেখা হইয়াছে কি?" জালিয়া অতিশয় কাতরস্বরে ভীত ভাবে বলিল, "ঠাকুর আজ আমি বড়ই বিপদে ঠেকিয়াছি। সমুদ্রের কিনারে জাল পাতিয়া রোজ রাত্রে মাছ ধরি, নৃসিংহ নামের গুণে কখনও কোন বিপদে পড়ি নাই। কিন্তু আজ বড়ই মুস্কিল হইয়াছে, আমার জালে এক মড়া আটকাইয়াছিল। তাহাকে টানিয়া তুলিতেই তাহার ভিতরের ভূত আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই ছাড়িতেছে না, যত ভগবানের নাম লইতেছি, কিন্তু কিছুই ফল হইতেছে না, বরং আরও যেন জোর করিতেছে। নিজেকে কোন প্রকারে সামলাইতে পারিতেছি না। তাই রোজার কাছে চলিয়াছি সে যদি ভূতকে ছাড়াইতে পারে।" স্বরূপ জালিয়াকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই, আমিও খুব বড় 'ওঝা', এখনই তোমার ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া স্বরূপ ধীবরের মাথায় অভয়হস্ত রাখিলেন এবং মন্ত্র পড়িয়া তিন চাপড় দিয়া বলিলেন, "ভূত পলাইয়া গিয়াছে।"

"আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিলা তার মাথে॥

---

১ কোনারক—কোনার্ক।

তিন চাপড় মারি কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইও বলি সুস্থির করিল॥
একে প্রেম তাতে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেলে সেই হইল সুস্থির॥"

অভয় পাইয়া জালিয়া সুস্থির হইলে, স্বরূপ বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে জালে পাইয়াছ, তিনি শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যজী মহারাজ—ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার স্পর্শে তোমার অন্তরে হরি-প্রেমের উদয় হইয়াছে। ইহা ভূতের আবেশ নহে। আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। চল তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ আমাদের দেখাইয়া দাও।" স্বরূপের বাক্যে জালিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল "মহাশয়! এই দেহ অতি দীর্ঘ বিকৃতাকার,—তাঁহার দেহ কখনও এইরূপ হইতে পারে না।" স্বরূপের আগ্রহে জালিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়া সমুদ্রের কিনারে বালুকার উপর স্থাপিত দেহ দেখাইয়া দিল। প্রাণের আরাধ্য দেবতাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মসংবরণ করিয়া স্বরূপ অতি সন্তর্পণে দেহ ধারণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে গাত্রস্থ বালি ঝাড়িয়া মুছিয়া ও পরিধানের আর্দ্র কৌপীন পরিবর্তন করাইয়া নিজের শুষ্ক বহির্বাস মেলিয়া তাহার উপরে শয়ন করাইলেন। সংগী ভক্তগণকে ইঙ্গিত করিলে, তাঁহারা জোরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। সুমধুর সংকীর্তন আরম্ভ হইল। স্বরূপ ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, চৈতন্যদেবের ঘোর অন্তর্দশা। তিনি তাঁহার কর্ণমূলে জোরে জোরে কৃষ্ণনাম শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, এইভাবে কিছুক্ষণ নাম শুনাইবার পর দেহে বাহ্যচেতনা দেখা দিল এবং সকলের প্রাণ আশ্বস্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যদেব নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তখনও বাহ্যজগতে মন নামে নাই 'অর্ধ বাহ্যদশা'।

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্বকাল।
অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর।"

অন্তর্দশাতে (জড়সমাধি) ভগবানের সহিত পূর্ণ মিলনে, মন বুদ্ধি তাহাতে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ায়, দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না। দেহ স্পন্দনহীন জড়বস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়। তখন বাহ্যিক কোন প্রকার চেষ্টা বা কথাবার্তা বলা চলে না। সেই অবস্থা হইতে কিছু নীচে নামিলে দেহে চেতনা দেখা যায়। অর্ধবাহ্য দশায়,—ভব সমাধিতে তখনও মন বাহ্য জগতে আসে নাই। হাবভাব, চেষ্টা, কথাবার্তা, অন্তর্জগতের অদ্ভুত উপলব্ধির বার্তাই প্রকাশিত হয়। এই অবস্থা হইতে আরও নীচে নামিলে বাহ্যদশা—জাগ্রত অবস্থা—তখন বাহ্যজগতের

জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করে দেহের অনুভব হয়। অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত চৈতন্যদেবের 'আধ আধ' বাক্যসকল শুনিয়া রসজ্ঞ স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন— তিনি ব্রজে যমুনা-পুলিনে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা—গোপীগণ-সঙ্গে জলকেলি দর্শন করতঃ উল্লসিত হইয়াছেন। সেই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা শুনিয়া এবং তদ্দর্শনে পুলকিত তাহার ভাবোজ্জ্বল মনোহর মুখমণ্ডলের দীপ্তি দেখিয়া ভক্তগণের অপার আনন্দ হইল। তৎপরে তিনি ক্রমে ক্রমে বাহ্যদশায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বরূপ ও ভক্তগণের সেবা-শুশ্রূষায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ভক্তগণ-সঙ্গে কুঠিয়াতে ফিরিলেন।

শেষ সময়ে এই ভাবে দেহাত্মবুদ্ধি বিরহিত থাকিলেও মাতৃভক্ত সন্ন্যাসী বৃদ্ধা জননীর খবর লইবার এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রিয় অনুগত পণ্ডিত জগদানন্দকে বঙ্গদেশে পাঠাইতেন। চৈতন্যদেব জগদানন্দকে প্রেমস্বরে বলিতেন -

"নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার॥
কহিও তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
নীলাচলে রহি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥"

নন্দোৎসবের দিনে গোপলীলার শেষে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী যে মূল্যবান বস্ত্র পাইতেন, তাহা পূর্বের ন্যায় স্বামী পরমানন্দ পুরীর আদেশানুযায়ী প্রতি বৎসর জননীকে পাঠাইতেন, তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথের উত্তম উত্তম প্রসাদ পাঠাইতেও ভুলিতেন না। এমনকি, ভক্তগণের জন্যও মহাপ্রসাদ মাল্যচন্দনাদি প্রেম সহকারে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে পাঠাইতেন।

একবার জগদানন্দ নবদ্বীপে শচীদেবীকে দর্শনান্তে, শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈত আচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময়ে বৃদ্ধ আচার্য তাঁহার নিকট একটি সংবাদ বলিয়া দিলেন, চৈতন্যদেবকে নিবেদন করিবার জন্য। সংবাদটি এমনই হেঁয়ালির ভাষায় বলিলেন যে একমাত্র চৈতন্যদেব ভিন্ন অন্য কেহ উহার মর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না।

"প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে আউল॥"

আচার্যের হেঁয়ালি শুনিয়া জগদানন্দের হাসি পাইল। তিনি পুরীতে ফিরিবার পর চৈতন্যদেবকে যখন উহা শুনাইলেন,—

"তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর এই আজ্ঞা বলি মৌন রহিলা॥"

কিন্তু তরজা শুনিয়া স্বরূপের মনে অতীব বিস্ময় জন্মিল; তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া চৈতন্যদেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আরাধন।
পূজা লাগি কতকাল করে আরাধন॥
পূজা-নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার কিবা অর্থ না জানে তাঁর মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণ বাড়িল॥"

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে শ্রীমতীর মনে যেরূপ ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল, এখন হইতে তাঁহার অন্তরে সর্বদাই সেই ভাবের স্ফুরণ হইতে লাগিল। মণিহারা ফণির মত হইয়া অবলা গোপবালা যে সকরুণ আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহমনে যে অত্যদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকাশ পাইয়াছিল, ভক্তিশাস্ত্রে যে অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মাদ অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়, চৈতন্যদেবের মধ্যে এখন তাহা মূর্তিমান হইল। স্বরূপ রামানন্দকে প্রিয় সখীজ্ঞানে অন্তরেব ভাব ও মর্মব্যথা সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়া বলিতেন। তাঁহারাও সর্বদা কাছে কাছে থাকিয়া, প্রাণপণ সেবা, সপ্রেম বচন, রসপূর্ণ শ্লোক ও সঙ্গীতাদির দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।

"এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ মনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয় অন্তরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"

তাঁহার দেহে-বাক্যে-মনে প্রকাশিত এই অপূর্ব প্রেমের পরিচয় ও পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্যমাধুর্যের আস্বাদ পাইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। আবার চৈতন্যদেবের ভগবদ্‌বিরহে ব্যাকুল আর্তিপ্রকাশ এবং অনিদ্রা ও অনাহারে ক্ষীণ-কৃশ দেহ দেখিয়া দুঃখে ভক্তগণের প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তাঁহার এই সময়ের ভাব লক্ষ্য করিয়াই 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন—

"কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনু।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদজনিত আর্তিতে তনুমন ক্ষীণ হইলেও যাঁহার প্রেমভাব ভক্তগণকে প্রফুল্লতা দান করে, সেই গৌরাঙ্গ প্রভুর চরণে শরণ লইলাম।

যাহারা দেহসুখে আসক্ত, তাহাদের নিকটই শারীরিক দুঃখকষ্ট ভয়াবহ, কিন্তু যাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই, দেহ আছে কিনা সর্বদা এই স্মৃতিও থাকে না, তাঁহার আবার দেহের কষ্ট কি? উহাও তাঁহার নিকট পোশাক-পরিচ্ছদের তুল্য কখনও ব্যবহৃত হয়, কখনও হয় না। তাঁহার জীবনে ভগবদ্‌বিরহে যে আর্তি দেখা যায়, উহাই গভীর আনন্দের সেতু। অপরের চক্ষে দুঃখরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রেমিকের নিকট উহা অতুলনীয় আনন্দেরই অভিব্যক্তি। বিরহের মধ্যেই প্রেমের মাধুর্যরস সমধিক আস্বাদ করিয়া ভক্ত পুলকিত হন। বাহিরে উহা দুঃখরূপে দেখা গেলেও প্রেমিক ভক্তের অন্তরে তখন ভগবৎস্ফুরণে অপার আনন্দেরই স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বিরহ-ব্যাকুলতাই প্রেমিক ভক্তের সাধ্য বস্তু। ভগবান আনন্দময়; তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার স্ফুরণের অনুভব আনন্দের আকর। বিরহ-ব্যাকুলতা যতই তীব্র হয় উপলব্ধিও ততই গভীরতর হইয়া থাকে, এমনকি পরিণামে সেই আনন্দ-সমুদ্রে ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। সংসারী জীব বিষয়-ভোগ-জনিত আনন্দে ক্ষণিক আত্মহারা হইলেও পরমুহূর্তে তাহার চঞ্চল মন শত কামনার টানে দেহেন্দ্রিয়ের

প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু বাসনা-বিহীন, দেহাত্মবুদ্ধি-বিরহিত প্রেমিক ভক্তের শুদ্ধ মনভ্রমর, শ্রীভগবানের চরণকমলে আত্মমগ্ন হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া মধুরস পান করে। তাহাতে বিরহ মিলন প্রভৃতি নানা ভাবের সঞ্চার হইয়া বসেরই মাধুর্য বাড়ায়। প্রেমিকের অন্তরে প্রেমময়ের দিব্য স্ফূর্তি নিরন্তর প্রকট থাকায় কখনও আনন্দের অভাব হইতে পারে না। সংসারের যে কোন প্রিয় বস্তুতে যতই টান থাকুক না কেন, মানুষ নিজের দেহকে বিস্মৃত হয না - হইতে পারে না। ধন নষ্ট হইবার পরেও কৃপণের জীবনধারণের ইচ্ছা থাকে; পতিহারা সতীকেও নিদ্রার কোলে আরামে শয়ন করিতে দেখা যায়; পুত্রহাবা মাতাও অন্নগ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কবেন। দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকায় দৈহিক সুখদুঃখ অতিক্রম করা সাধারণ জীবেব সম্ভব হয় না। দেহাত্মবুদ্ধি-বিসর্জিত প্রেমিক ভক্তের অন্তরে স্বীয় ভাবানুযায়ী সিদ্ধ দেহের স্ফুরণ হয় এবং প্রিয়তম প্রেমময় ভগবান ভিন্ন আর কোন বাহ্য বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও তাহার থাকে না। দেখিতে পাওয়া যায় এই সময়ে চৈতন্যদেবের আহার, নিদ্রা, জীবনধারণ ইত্যাদিতে কিছুমাত্র উদ্যম বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ঈশ্বরেচ্ছায় উহা স্বভাববশে চলিতেছিল আর ভক্তগণ তখন বিশেষ সাবধানতার সহিত তাঁহার দেহের প্রতি যত্নবান হইয়াছিলেন।

একদিবস গভীব বাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ তাঁহাব সহিত ভগবৎপ্রেম-প্রসংগ করিয়া নিজের বিছানায় গিয়া শয়ন কবিয়াছেন,- গোবিন্দ কুঠিয়ার দ্বারদেশে শুইয়া আছেন। শেষ রাত্রে কাতব স্বরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া স্বরূপের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চমকিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া উঠাইলেন। চৈতন্যদেবের কুঠিয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া যে করুণ দৃশ্য উভয়ের চোখে পড়িল, তাহা দেখিয়া স্বরূপ-গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহাব নাক, মুখ, গণ্ডদেশ ক্ষতবিক্ষত, তাহা হইতে রক্ত ঝরিতেছে।

"দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভু মুখ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দোঁহার হৈল বড় দুঃখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ান করাইল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে॥
দ্বার না পাইয়া মুখে লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে॥"

স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই। বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া

স্বরূপ তদবধি তাঁহার দেহ রক্ষার জন্য আরও সতর্ক হইলেন। দামোদরের অনুজ শঙ্কর চৈতন্যদেবের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং শঙ্করের নিদ্রাও খুব অল্প ছিল। সেই দিন হইতে স্থির হইল শঙ্কর চৈতন্যদেবের কুঠিয়ার ভিতরে তাঁহার কাছেই শয়ন করিবেন। সকল ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে চৈতন্যদেবও ইহাতে সম্মতি দিলেন। তদবধি রাত্রে শঙ্কর তাঁহার পদতলে শয়ন করিয়া থাকিতেন।

"শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘাড় অঙ্গে শঙ্কর পড়িয়া নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥
তাহার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাব্জ ঘসিতে॥"

এইভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনেই দিবানিশি কাটিতে লাগিল। ইহার কিছুকাল পরে বৈশাখী পূর্ণিমা উপস্থিত। পুরীতে চিরকাল বসন্ত ঋতু বিরাজমান থাকিলেও বৈশাখে মধুঋতুর বিশেষ প্রকাশ হয়। সেই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ফুলদোল চন্দনযাত্রা উৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ণিমা নিশিতে কৌমুদীরাশিতে ধরাতল প্লাবিত করিয়া নিশানাথ পূর্বগগনে সমুদিত হইবা মাত্র প্রেমিক সন্ন্যাসীর অন্তরের ভাব-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। ঘরে থাকা দায় হইল। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ-সঙ্গে পুরীর সর্বপ্রধান উদ্যান 'শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভে' গমন করিলেন। উদ্যানের ভিতরে অবস্থিত প্রফুল্লিত বৃক্ষলতাশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সকলের অন্তরেই বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগরিত হইল। নানাবিধ কুসুমের সুবাসবাহী মলয়পবনে কোকিলকূজনে ভক্তগণের প্রাণ শিহরিতে লাগিল। তখন ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবের আদেশে সুগায়ক ভক্তগণ জয়দেবের সুমধুর পদ গাহিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া চৈতন্যদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণসঙ্গে গোপীভাবে ভাবিত সন্ন্যাসী নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করিয়া উদ্যানে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে অশোকের তলায় সুমধুর হাসিমণ্ডিত প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। দর্শন পাইয়াই তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কিন্তু দেখা দিয়া মনোচোরা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি প্রাণনাথ-হারা হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন,—দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। অন্তরঙ্গগণের সেবায় কিছুক্ষণ পরে বাহ্য চেতনা পাইলেও চতুর্দিকে 'কৃষ্ণ-

অঙ্গগন্ধ' পাইয়া আবার অচেতন হইলেন। তৎপরে আবার অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আস্বাদন করতঃ তাহার মাধুর্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

"এই মত গৌর হরি গন্ধে কৈল মন চুরি
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি চায়।
যায় বৃক্ষলতা পাশে কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে সুখ পায়
এই মত প্রাতঃকাল হইল।
স্বরূপ রামানন্দ রায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর বাহ্যদশা কৈল॥"

ভক্ত-সঙ্গে এইভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়া পূর্ণিমানিশি অতিবাহিত হইল তখন স্বরূপ-রামানন্দ অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া বাহ্যজগতে মন ফিরাইয়া আনিলেন।

রথযাত্রা সমীপবর্তী হইলে প্রতিবৎসরের ন্যায় সদলবলে গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈতন্যদেবের নিয়োজিত জননীর তত্ত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিত এবার আসিয়া জানাইলেন, অতিবৃদ্ধা শচীদেবী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। মাতৃভক্ত তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে স্নেহময়ী জননীর তিরোভাবে শোকের কিরূপ উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল তাহা জানিতে পারা না গেলেও এই মায়িক পৃথিবীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণের প্রধান সংযোগসূত্র যে ছিন্ন হইয়া গেল, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দামোদরের নিকট আরও জানা গেল, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপণে শাশুড়ীর সেবা ও শেষকৃত্য সুচারুরূপে সম্পাদনান্তে স্বামিপ্রদত্ত দায় শোধ করিয়া এখন ভগবদ্ভজনে পূর্বাপেক্ষা অধিক নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহজগতের দিকে আর তাঁহার মোটেই মন নাই এমনকি দেহের প্রতিও উদাসীন।

"বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বার রুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরি নাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম মাত্র এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥

জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥"

—শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ

যথাসাধ্য মনকে নীচে নামাইয়া রাখিয়া বাহ্যদশাতে থাকিয়া, চৈতন্যদেব অতিপ্রিয় গৌড়ীয় ভক্তগণ-সঙ্গে পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারেও রথযাত্রার উৎসবে আনন্দ সম্ভোগ করিলেন। তাঁহার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া সকল ভক্তের আনন্দ হইল। কিন্তু বাহিরে সহজ সবল লোকব্যবহার করিলেও তাঁহার অন্তরের ভাব পূর্ববৎ প্রবলই রহিল এবং গৌড়ীয়ভক্তগণ দেশে ফিরিবার পরেই তাহা প্রবলতর আকারে প্রকাশ পাইল।

"শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধবদর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

... ...

এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হাহুতাশ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

এই অদ্ভুত প্রেমের উদ্দাম বেগে নরবপু ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। রামানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দাদি সেবকগণ প্রাণপণে যত্ন করিয়াও উহা আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে, আটচল্লিশ বৎসর বয়সে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) চৈতন্যদেব মানবলীলা সংবরণ করিয়া তাঁহার প্রাণনাথ ব্রজনাথের

সহিত চির-মিলিত হইলেন। কাহারও কাহারও মতে রথযাত্রায় কীর্তনের সময়ে ভাবাবেশে পড়িয়া গিয়া দেহে গুরুতর আঘাত লাগে—সেই জন্য তিনি অসুস্থাবস্থায় গুণ্ডিচাবাড়ীর পাশেই অবস্থান করেন। পরে সেখানেই ভাবাবস্থায় দেহত্যাগ হয় এবং গুণ্ডিচাবাড়ীতেই তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়। অপর মতে ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতেই তিনি সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া যান। অন্যেরা বলেন তাঁহার অতিপ্রিয় গদাধর পণ্ডিতের কুঠিয়াতে ভাবাবেশে দেহত্যাগ করেন এবং সেই স্থানেই গোপীনাথ বিগ্রহের পাশে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই সম্বন্ধে 'ভক্তিরত্নাকর' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব অপ্রকট হইবার অত্যল্প পূর্বে আচার্য নরোত্তম তাঁহাকে দর্শন করিবার আশায় পুরীতে আসেন। কিন্তু নরোত্তম পৌঁছিবার পূর্বেই চৈতন্যদেব মহাপ্রস্থান করেন। ভগ্নমনোরথ নরোত্তম শোকাকুল হইয়া গদাধরের কুটীরে উপস্থিত হইলে পণ্ডিতের সেবক অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে চৈতন্যদেবের সমাধিস্থান দেখাইয়া বলেন,—

"অহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিলা ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
ন্যাসি-শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে॥"

—ভক্তিরত্নাকর

উপসংহার

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর তাঁহার প্রিয় অন্তরঙ্গগণের কেহ কেহ অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দায় জীবশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহাদিগকে আরও কিছুকাল মানবদেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইল, তাঁহারই স্মরণ মনন ও লীলাকীর্তন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধনভজনের মাত্রা এবং জীবনযাপনের কঠোরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার সেই বিস্ময়জনক তপস্যা দেখিয়া অতিবড় পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হইত। বাড়ীর চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা, ভিতরে কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই--সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। মিশ্র-পরিবারের অনুগত সেবক ঈশান তখন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। দেবীর পদাশ্রিত সেবক বংশীবদন এবং চৈতন্যদেবের নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিত তখনও বর্তমান। তাঁহারাই সমস্ত দেখাশুনা করিতেন। প্রয়োজনমত শুধু তাঁহাদের ও পরিচারিকা বা সেবিকাগণেরই বাড়ীর ভিতরে যাতায়াতের অধিকার ছিল। প্রাতঃস্নানান্তে দেবী স্বয়ং ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত রুদ্ধদ্বার গৃহে ভজনে নিরত থাকিতেন। সেই সময়ে কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। আহারের পর অপরাহ্নে নির্দিষ্ট সময়ে দেবীর আদেশে দ্বার অর্গলমুক্ত হইত। সেই সময়ে বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর প্রসাদকণিকা গ্রহণ করিতেন।

দাস গদাধর নামক জনৈক বিশিষ্ট ভক্তকে, চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম প্রচারে সহায়তার জন্য নিত্যানন্দের সঙ্গে দিয়াছিলেন, মাতৃগতপ্রাণ বালক-স্বভাব গদাধর দাস অপার্থিব মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়া পরে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া মিশ্রভবনের নিকটেই কুঠিয়াতে বাস করিতে থাকেন। জগজ্জননীর কৃপাপ্রার্থী হইয়া ক্রমে ক্রমে আরও ভক্ত গদাধর দাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে নবদ্বীপে মিশ্রভবনের সন্নিকটে কুঠিয়া বৃদ্ধি পাইয়া উহা পরে তপস্বী সাধুমণ্ডলীর এক ছাউনীর আকার ধারণ করে। ঐ সকল ত্যাগী ভক্ত, নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ এবং দূরদূরান্তর হইতে মাতৃদর্শনে সমাগত ভক্তবৃন্দ সকলেই দিনান্তে একবার পরমারাধ্যা জননীর চরণযুগল দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতেন।

"অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসীমঞ্জরী॥

পিড়াতে বসিয়া করে হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপতণ্ডুল কিছু রাখে নিজস্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হৈলে একটী তণ্ডুল।
রাখে সরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখে পাত্র শেষ।
ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ॥
বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণে মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আসপাশ।
একত্র হইয়া অভ্যন্তরে যান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্যশরণ যাতে অতি কৃপা পাত্র॥"

—অনুরাগবল্লী

গৃহের বারান্দাতে কাপড়ের পর্দা দেওয়া থাকিত, দেবী তাহার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইতেন। নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তগণ সমাগত হইলে পরিচারিকা পর্দা উত্তোলন করিত, ভক্তগণ চরণযুগল দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ হইতেন।

প্রিয় ভক্তগণের জন্য দেবী প্রত্যহ ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ পাত্রাবশেষ প্রসাদান্ন রক্ষা করিতেন। সেই মহাপ্রসাদ তখন ভক্তগণকে বিতরণ করা হইত। উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না।

জগজ্জননী তাঁহার দুর্বল সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যৌবনের প্রারম্ভে পতিকে গৃহত্যাগে অনুমতি দিয়াছিলেন। এখন তিনি স্বয়ং তাহাদের শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। মা ভিন্ন অবোধ সন্তানকে আর শিখাইবে কে! মাতাই পুত্রের প্রথম ও প্রধান শিক্ষাদাত্রী। অজ্ঞ সন্তানকে সুপথে চালাইবার জন্য জগজ্জননী স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এতদিন হৃদয়ের অন্তস্তলে অতি গোপনে মহাদেবী যে আরাধ্য দেবতার পূজা করিতেছিলেন, এখন বাহিরে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্ত-শরণাগত সন্তানগণের জন্য নিত্যকালের আশ্রয় নির্দেশ করিলেন। আশ্রিত সেবক বংশীবদনের সহায়তায় মিশ্রগৃহের অতি প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ (যাহার তলাতে নিমাই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ) কাটাইয়া দেবী

বিষ্ণুপ্রিয়া ভুবনমোহন শ্রীবিশ্বম্ভর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং স্বীয় সহোদরকে সেবাইত নিযুক্ত করিলেন।[১] শাস্ত্রবিধি অনুসারে মহাসমারোহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পাদিত হয়। সমস্ত ভক্তগণ একত্র হইয়া আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইলেন; শ্রীমূর্তির সৌন্দর্য-মাধুর্যে সকলের হৃদয় মোহিত হইল।

চৈতন্যদেব প্রচারিত ভগবদ্ভক্তিমার্গের পুষ্টি ও উহাতে বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করিয়া মহাশক্তিস্বরূপিনী দেবী আরও কিছুকাল মর্ত্যলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপালাভ করিয়াও ধন্য হইয়াছিলেন। ধরাধামে অবস্থান করিলেও ধরার সঙ্গে বাহ্যতঃ তাঁহার সম্পর্ক কিছুই ছিল না বলা যায়,—তাঁহার জীবনযাত্রাপ্রণালী ছিল এমনই বিচিত্র! দেবীর দৈনিক কার্য—ভজন-প্রণালীর কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে, উহা দিনে দিনে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়াছিল। পাঠক উদ্ধৃত বাক্যাবলী মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাইবেন। কথিত আছে অদ্বৈতাচার্য সেইকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। (নিত্যানন্দ প্রভু তাহার পূর্বেই অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।) দেবীর কঠোরতার কথা শুনিয়া আচার্যের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা লাগে। অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্ত অদ্বৈতাচার্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া স্বীয় বিশ্বস্ত সেবককে পাঠাইয়া দেবীকে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কঠোরতা হ্রাস করিবার জন্য এবং দেহের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিবার জন্য। সেই প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, তবে যাঁহার প্রাণমন ইষ্টে লীন, দেহের প্রতি মমতা তাঁহার সম্ভব নহে।

শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই বংশীবদন স্বীয় বাঞ্ছিত লোকে গমন করিলেন। আশিষ্ঠ দ্রাঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ বালব্রহ্মচারী দামোদর পণ্ডিত তখন বৃদ্ধ হইলেও যুবার ন্যায় উৎসাহী ও কর্মঠ। তিনিই স্বহস্তে দেবীর সেবা পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিলেন। কারণ, অপর কোন পুরুষের দেবী-ভবনে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। দিনে দিনে দেবীর বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও কমিতে লাগিল। তিনি ধ্যানে-ভজনেই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। চৈতন্যদেব বাস করিতেন 'গম্ভীরা'তে, দেবীর বাসগৃহ গম্ভীরতর, গম্ভীরতম হইল:

"প্রভু অপ্রকটে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী।
বিরহসমুদ্রে ভাসে দিবসরজনী॥
বাড়ীর বাহির দ্বারে মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিলা দাসী জনা কতো লইয়া॥

১ তাঁহারই বংশধরগণ এখনও সেবক-পূজারী। ইঁহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক।

দুই দিকে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী যায় আগে পাছে॥
ভিতরে পুরুষমাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায়॥
পণ্ডিতের অদ্ভুত শক্তি অদ্ভুত প্রকৃতি।
মহাপ্রভুর গুণে নিরপেক্ষ যার খ্যাতি॥
কদাচ কেহ করে অল্প মর্যাদা লঙ্ঘন।
সেইক্ষণে দণ্ড করে মর্যাদা স্থাপন॥
নিরবধি প্রেমাবেশ যাহার শরীরে।
হেন জন নাহি যে সঙ্কোচ নাহি করে॥
গঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হস্তে লইয়া।
সেই পথে লঞা যায় নির্লক্ষে চলিয়া॥
প্রত্যহ সেবার লাগি লাগে যত জল।
প্রায় দামোদর তত আনয়ে একল॥
বহিরাচরণ লাগি দাসীগণ আনে।
কলস লইয়া যবে যায় গঙ্গা স্নানে॥"

—অনুরাগবল্লী

দামোদরকে যে উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব পুরী হইতে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন তাহা এইভাবে সার্থক হইয়াছিল। কাঞ্চনা নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণকন্যা দেবীর সমবয়সী। তিনিই আজীবন তাঁহার প্রিয় সখী ও প্রধানা সেবিকা ছিলেন। শোনা যায় দেবীর প্রীতির জন্য কাঞ্চনা বহু কষ্ট স্বীকারপূর্বক পদব্রজে পুরী গিয়া সন্ন্যাসীকে স্বয়ং দর্শন করিয়া আসিয়া সংবাদ দিতেন। ভাগ্যবতী কাঞ্চনা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অতি সন্তর্পণে সেবা করিয়া দেবীর দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। কাঞ্চনার উপর দেবীর অতিশয় স্নেহপ্রীতি ছিল। সেজন্য তাঁহার অনুরোধ-উপরোধ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

এইভাবে কিছুকাল গত হইল। দেবী ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া সেবিকার সঙ্গে কখনও কখনও মন্দিরে শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া আসিতেন। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের জন্মতিথি দোলপূর্ণিমা দিনে প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অপর সকলের প্রতি মন্দির হইতে বাহিরে যাইবার আদেশ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখা গেল শ্রীমতী মহাসমাধিযোগে প্রিয়তমের সহিত চিরমিলিত হইয়াছেন। নবদ্বীপের নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ একাধারে বিষ্ণুপ্রিয়া-বিশ্বম্ভর হইলেন!!

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

পরিশিষ্ট

(১) শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক) ঈশান নাগর বিরচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' (শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩০৩ সালের মাঘমাসের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন।) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে ১৪৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ চৈতন্য ভক্তি বিষয়ক স্তোত্রকাব্য 'চৈতন্য চন্দ্রামৃতম্' রচয়িতা কাশীবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী অভিন্ন ব্যক্তি।

(খ) ৪০৪ চৈতন্যাব্দে রামদয়াল ঘোষ প্রবোধানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত' মুদ্রিত করিয়া তাহাতে সংস্কৃত শ্লোকগুলিকে বাংলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিও প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ একই ব্যক্তি। বলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভক্তমালে (কৃষ্ণদাস বিরচিত) প্রবোধানন্দকে প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে ; যথা

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥ পৃঃ ৩০৭

(দ্রষ্টব্য--শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান ঃ বিমানবিহারী মজুমদার ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ৫৩১)

(গ) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হইল 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত · ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩২৭ নং ১৭)

(ঘ) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আর্থার ভেনিস সাহেব বারাণসী হইতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে প্রকাশানন্দ জ্ঞানানন্দের শিষ্য।

(ঙ) প্রকাশানন্দের জীবনকাল ১৪৮৬--১৫৩৩ খৃীষ্টাব্দ। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক।

(অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা : রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃঃ ৩৮)

(২) শ্রীজীব

অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। শ্রীবল্লভের অপর নাম অনুপম। শ্রীচৈতন্য চরিতাখ্যায়ক নরহরি চক্রবর্তীর মতে শ্রীরূপ ও সনাতনকে শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে কৃপা করেন, তখন বল্লভ বা অনুপম এবং তাঁহার পুত্র শ্রীজীব উপস্থিত ছিলেন--

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভব তিন ভাই।
যে সুখে ভাসিল তা কহিতে সাধ্য নাই॥
কেশব ছত্রীন আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন॥
শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল॥

(ভঃ রঃ পৃ ৪৫)

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃতেও রূপ-সনাতনের প্রসঙ্গে শ্রীজীব সম্বন্ধে পাওয়া যায়

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞি।
যত ভক্তি-গ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই॥
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি সিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার॥
গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥

(চৈঃ চঃ ২।১।৩৭-৩৯)

অপরস্থানে নিত্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া শ্রীজীবের বৃন্দাবনে আগমন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। (চৈঃ চঃ ৩।৪।২১৮-২২৬)

(দ্রষ্টব্য শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান ঃ বিমানবিহারী মজুমদার—
২য় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ১১৫)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থলে	পাঠ্য
১	২২	পরিবাপ্ত	পরিব্যাপ্ত
১	২৫	স্বাধীনভাব	স্বাধীনভাবে
৬	৬	কোল	কোলে
৭	১১	নিমাইয়র	নিমাইযের
১৯	৭	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যাধিকারী
৩১	৩	নামে	নাম
৩১	৪	তাগের	ত্যাগের
৩১	১০	গাহর্স্থধর্ম	গাহর্স্থ্যধর্ম
৫০	১৫	ইতো	ইতি
৫৮	২৬	প্রত্যাভিবাদন	প্রত্যাভিবাদন
৫৮	৩০	যতির্ব্রুযাত	যতির্ব্রুয়াৎ
৬২	২৫	আচার্য	আচার্য
৬৪	১৫	দুজনের	দুইজনের
৯৩	১০	তাৎপর্য	তাৎপর্য্য
	১১	তাৎপর্য	তাৎপর্য্য
	১১	বর্ষ	বর্ষ্য
	১২	নহে	নাহি
৯৫	৭	করিলও	করিলেও
৯৬	১৪	নিজ	নিজ জীবনে
১০০	১৪	কৃষির্ভূর্বাচকঃ	কৃষির্ভূর্বাচকঃ
১১১	২০	আছে।	আছে—
১১৩	১৮	আসিল ?	আসিল!
১২১	১	দক্ষিণদেশে	দক্ষিণদেশ
১৪৫	৪	ঐশ্বর্যেলেশহীন	ঐশ্বর্যলেশহীন
১৪৬	১৪	নন্দ-গোপ-গোপী	নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী
১৪৭	২৮	বিমলার	বিমলাদেবীর
১৪৯	২২	চ॥	চ॥"
	২৪	বিমলার	বিমলাদেবীর
১৫৬	১৩	আনন্দে দম্পতীর	আনন্দে ভক্ত দম্পতীর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্থলে	পাঠ্য
১৫৭	১১	দিয়া শুশ্রূষা	দিয়া স্বহস্তে শুশ্রূষা
১৫৮	৩০	উচ্চতর উচ্চতম	উচ্চতর ও উচ্চতম
১৮৮	১৯ও ৩০	মকর-সংক্রান্তিতে	মকর শেষ সংক্রান্তি
১৮৯	২২	পরিচিত আছে	পরিচিত লোক আছে
১৯৯	১৭	অঙ্গীকার॥	অঙ্গীকার।
২০০	১৭	"ভাবিয়া	ভাবিয়া
	২৪	কহ	কহে
২০৩	২০	গদ্‌গদ	গদগদ
২০৭	৩১	ঈশ্বর	ঈশ্বরের
২০৮	১৮	সূত্রার্থে	সূত্রার্থ
২১১	১৯	কির	কিরণ
২১২	২১	করে	করেন
২১৩	২১	অজ্ঞান॥	অজ্ঞান॥"
২১৫	পাদটিকার		
	পং ৪	সাধনাসিদ্দ	সাধনাসিদ্ধি
২১৭	শেষ পং	সলভ	সুলভ
২২২	১১	জন্যে	জন্য
২২৩	৯	পড়ায় ধর্ম	পড়ায় রায়েব ধর্ম
	৩১	মথু	মথুরা
২২৬	২২	চূড়ায়	চূড়ার
২২৭	৩	হইলেও	হইলেও তাঁহার
		দেহত্যাগকালীন	দেহত্যাগকালীন
	৬ ও ১৬	রূপের	শ্রীরূপের
	১০, ২৪ ও ২৬	রূপ	শ্রীরূপ
২২৮	৫	রূপকৃত	শ্রীরূপকৃত
	৭	রূপ	শ্রীরূপ
	২১	সার্বভৌম	সার্বভৌমাদি
২৩২	২৫	তাঁহার	তাঁহারা
২৩৮	৩২	রূপ	শ্রীরূপ
২৩৯	৩	শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দির	শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দির
		চূড়াষ	চূড়ার
	৭	রূপ	শ্রীরূপ